তৃতীয় অধ্যায়

মনোজ বসুর উপন্যাস বিশ্লেষণ

ভুলি নাই

সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম ও স্বদেশী আন্দোলন হল 'ভুলি নাই' (১৯৪৩) উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার মধ্যদিয়েই মনোজ বসুর ঔপন্যাসিক জীবন শুরু হয়। জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে সংশয় এবং হতাশা দেখা দেয়। ১৯০৫ থেকে ১৯৩৬ সময়কার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং যুবসমাজের আন্দোলন 'ভুলি নাই' উপন্যাসের পটভূমি।

'ভুলি নাই' সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে লেখা কয়েকজন বিপ্লবীর স্মৃতিচারণা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের এক সদস্য শঙ্কর এই কাহিনীর বক্তা। কাহিনীটি মোট ছয়টি শিরোণামে বিভক্ত। প্রতিটি শিরোণামের বক্তা বা দ্রষ্টাই শঙ্কর। শিরোনামগুলি চরিত্রের নামে চিহ্নিত। নিজের নামেও একটি শিরোনাম রচনা করেছে শঙ্কর।

'ভুলি নাই' এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখক মনোজ বসুর নিজের বক্তব্য –

> "কুন্তল সরকার, চারু ঘোষ (এঁরা দৌলতপুর কলেজের ছাত্র) প্রমুখ সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের কথা কজনই বা জানে, ইংরেজের কড়া শাসন চলেছে তখন। আমার চেষ্টা হল, কুন্তল নামটা অন্তত লোকে জানুক। 'ভুলি নাই' লিখলাম, বইটা বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। একবার ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দৌলতপুর স্টেশনে শুনতে পেলাম, এক প্যাসেঞ্জার বলে উঠল, কুন্তলদা, ভুলিনি তোমাদের - ভুলিনি। 'ভুলি নাই' - এর প্রথম কথা। আমার উদ্দেশ্য পুরেছে। অতএব, ভারি আত্মতৃপ্তি পেলাম।"[১]

'ভুলি নাই' উপন্যাসের চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও কিছু কিছু বাস্তব ঘটনা এখানে স্থান পেয়েছে। বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ এই উপন্যাসের ডাকসাইটে প্রিন্সিপাল নীলকান্ত রায়ের প্রতিরূপ, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০) সাড়া

দিয়ে মনোজ বসু যখন কলেজ পরিত্যাগ করেন তখন অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ বাবু তাদের সকলকে সাবধান করে দিয়েছিলেন - তারই স্মৃতি নীলকান্ত রায় এবং প্রিয় ছাত্র কুন্তলের কথোপকথন। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার পর নিজের ইচ্ছায় ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; বিপ্লবী সরোজ পাকড়াশিও তাই করেছে। সুহাসিনী গাঙ্গুলী এবং শশধর আচার্য পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চন্দননগরের একটি বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী রূপে অভিনয় করেছিলেন; নিরুপমা ও শঙ্করের অজ্ঞাতবাস যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

'ভুলি নাই' উপন্যাসে রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, সংগ্রামীদের ব্যক্তিজীবন - এর বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। কিন্তু এই স্মরণীয় ব্যক্তিদের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করল, মৃত্যুবরণ করল, বঞ্চিত হল, তাদের কথা কেউ জানল না। ইতিহাসের পাতায় থাকবে না তাদের কোনো পরিচয়। যদি থাকেও তা চোখমুখ ঢাকা। এমনকি তাদের আত্মত্যাগের পেছনে ছিল না নিজস্ব লাভ - লোকসানের হিসেব। সুরমা এক জায়গায় তার কুন্তলদাকে বলেছে -

> "'নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন কুন্তল দা। সেখানে সবাই সুখী-সবাই ভোগী। কিন্তু আপনি নিজে কি ভোগ করে গেলেন, বলুন তো...।"[২]

উত্তরে গভীর কণ্ঠে কুন্তলদাকে বলতে শুনি –

> "এর জন্য আমারও কষ্ট হয় বোন। অনেকের অনেক দিনের জমানো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হল আমাদের উপর দিয়ে। সংসার আমার জন্য নয় - শান্তি বল, সুখ বল, কিছুই আমি নিলাম না - পথে পথে ভেসে গেলাম। এই ভেসে যাওয়ার বদলে তোমাদের লক্ষ লক্ষ সংসার যেন আনন্দে ভরে ওঠে। নইলে বৃথাই আমাদের আত্মবঞ্চনা।"[৩]

লেখকের আশা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হতে পারে না। মানুষের মধ্যে আসবে পরিবর্তন। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ ঘুচে যাবে। শোষক ও শোষিতের মধ্যে দূর হবে ব্যবধান। মানুষের মধ্যে আসবে উন্মাদনা। সেই প্রত্যাশা নিয়েই 'ভুলি নাই' উপন্যাস। যার শেষ কথাগুলি হল –

> "যেন বাতাসে শোনা যাচ্ছে, দিন আসছে ঐ। সব সমান ... আলো হাওয়া, পৃথিবীর বুকের রসে সিঞ্চিত শস্য-সম্পদ, গোপন মণিকোঠায় রেখে-দেওয়া কয়লা-ইস্পাত, একলা কারো নয়! মেরে মেরে একের হাত চোস্ত হয়ে গেছে, আর

> একজনেরও মার না খেলে পিঠ উসখুস করে – এ অবিচারের শেষ হয়ে এল। বিরোধ অপ্রীতি দূর হয়ে যাবে। শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে বিবাদের মধ্যে কত অন্যায় করছি। রক্তপাত হয়েছে, আপন-পর কত লোকের চোখের জল ঝরেছে। নতুন দিনে কারও এমন মনে থাকেনা। প্রভাতের আলোয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলে যাব ভাই —।"[৪]

'ভুলি নাই' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুন্তলদা অর্থাৎ কুন্তল সরকার। তিনিই বিপ্লবী দলের নেতা। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারই নির্দেশে সমস্ত ঘটনার অগ্রগতি ঘটেছে। ছাত্রজীবনে কলেজের প্রিন্সিপালের আর্শীবাদ নিয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমেছিলেন। আকাঙ্খা পূর্ণ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ অনুগামীরা তার অপূর্ণ স্বপ্নকে স্বার্থক করে তুলতে চেয়েছে। মনে হয় কুন্তল চরিত্রটি যেন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্রের প্রতিরূপ। কোনো দুর্বল মানবিক অনুভূতির দ্বারা তিনি পরিচালিত হননি। অনুরাগ-বিরাগেরও মর্ম বোঝেন না। যার পরিচয় পাই সুরমার কথাতে —

> ''আপনার পথে আপনার সঙ্গে ছুটতে গিয়ে যারা পেরে উঠল না, ধুলোর মধ্যে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে আপনার এতটুকুও বাধে না। আপনি তো মানুষ নন।"[৫]

তার সরল হাস্য-পরিহাস, সংযত কথাবার্তার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নেতৃত্ব সুলভ মানসিকতা। কুন্তল সরকার যেন রণক্লান্ত সৈনিক। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করার কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত হলেও বাস্তব কর্মনীতি চোখে পড়ে না। সেইসঙ্গে চরিত্রটির মধ্যে দেখা যায়, তার কাজের চেয়ে কথার ফুলঝুরি বেশি।

'ভুলি নাই' উপন্যাসে কাহিনীর যোগসূত্র কুন্তল সরকার। কথক শঙ্কর উপন্যাসে যে কাহিনীগুলি উপস্থাপন করেছে, তার প্রতিটি কাহিনীতে স্থান পেয়েছে কুন্তল সরকারের প্রসঙ্গ। খণ্ড কাহিনীগুলিতে যে চারিত্রিক সমাবেশ ঘটেছে, তাতে চরিত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ ছবি ধরা পড়ে না। চরিত্রগুলি যেন ক্ষণিকের আলোর ঝলকানি। রাণী, আনন্দকিশোর, সোমনাথ, মায়া কিংবা মল্লিকা কারোর চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ উপন্যাসে ধরা পড়েনি।

রাণী চরিত্রটি স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্ষণিকের জন্য এসেছিল। পরে সাধারণ জীবনে ফিরে গেলেও দাগ রেখে গেছে। দ্বারিক চাটুজ্জের মেয়ে উমারাণী দলের লোকেদের বাঁচাতে গোপন কাগজপত্র নিয়ে জলে ঝাঁপ দেয়। রাণীর কাগজপত্র দারোগা অনন্তের হাতে পড়ে। বৃদ্ধ দারোগাকে বিয়ে না করলে সেগুলি থানার জমা পড়ত। সেই ভয়েই বয়স্ক অনন্তকে বিয়ে

করতে বাধ্য হয় রাণী। দলের নিরাপত্তার জন্যই রাণীর এই আত্মসুখ বিসর্জন। এছাড়া চরিত্রটির তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই।

আনন্দকিশোর স্বদেশী আন্দোলনে কাজ না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শঙ্করকে বলেছে –

"চললাম শঙ্কর দা - আর কোনোদিন আপনাদের কাছে আসব না।"[৬]

অভিমানে দলত্যাগ করে আনন্দকিশোর। পরে কথক শঙ্কর খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারে–

> "কাগজে কুন্তল সরকারের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম। শ্যামবাজারের এক বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে স্বদেশিওয়ালাদের গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হয় – ফলে কয়েকজন মারা পড়ে, তার মধ্যে কুন্তল সরকারও আছে।"[৭]

পুলিশের গুলিতে মারা গেল সাধু মহারাজ (নিরুপমার দেওয়া নাম), নাম হল কুন্তল সরকারের। আনন্দকিশোরের পকেটে যে কাগজের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল কুন্তল সরকারের পরিচয়। পাষাণ কুন্তল সরকার এই ঘটনায় কেঁপে উঠেছিল। বাইরে আনন্দকিশোর সহজ-সরল হলেও বুঝিয়ে দিয়েছিল সে কাজের ছেলে।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সরোজ পাকড়াশির বোন নিরুপমা। সে বিধবা মা ও নাবালক ভাইকে নিয়ে বাস করে। নিরুপমাকে নিরাপত্তা দিতে কুন্তল সরকার শঙ্কর ও নিরুপমাকে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে বসবাসের আদেশ দেন। তেভাগা আন্দোলনের (১৯৪৬) প্রেক্ষাপটে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'হারানের নাতজামাই' (১৯৪৯) গল্পেও একই প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। তৎকালীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে সামাজিকতার চেয়েও গুরুত্ব পেয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। শঙ্কর ও নিরুপমা স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অতিষ্ট হয়ে ওঠে শঙ্কর। কেননা, শঙ্কর তো নাগা সন্ন্যাসী নন। উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ জন্মায়। শঙ্কর বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শঙ্করের প্রতি সমূহ টান ছিন্ন করে কুন্তল সরকারের দেওয়া দায়িত্ব নিয়ে ফিরে যাওয়ার আগে –

> "নিরু প্রণাম করতে এল। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম, সে পায়ের গোড়ায় মাথা রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি জলের দাগ। নিরুপমা কেঁদেছে। ও মেয়েও কাঁদতে জানে তাহলে।"[৮]

সংক্ষিপ্ত এই নিরাবেগ বর্ণনাটি কী গভীর আবেগকে সংহত করে রেখে দিয়েছে তা পাঠক মাত্রই অনুভব করেন।

বিপ্লবী জগৎলাল-এর স্ত্রী মায়া এবং পিতা সোমনাথ। বিপ্লবী জগৎলাল-এর মৃত্যুর সংবাদ তারা লুকিয়ে রেখেছে পরস্পরের কাছে। সন্তানহারা সোমনাথ এবং স্বামীহারা মায়া মিথ্যা অভিনয়ের মাধ্যমে জীবনযাপন করে চলেছে। মায়া নিভৃতে শঙ্করকে বলেছে —

> "একটা খবরের কাগজ বাড়িতে আনতে দিই নে শঙ্কর-দা, এই গয়না আর শাড়ির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। হু হু করে বুকের মধ্যে, তবু হাসিমুখে মিথ্যে কথা বলে যাই। বাবা চিরটা কাল কত নির্যাতন সয়েছেন জান তো! যে গিয়েছে সে আর ফিরবে না কিন্তু খবর শুনলে বাবা কাটা কবুতরের মতো চোখের সামনে ছটফট করে মারা যাবেন।"[৯]

অন্যদিকে শঙ্করের বাড়ি ফেরার সময় হলে সোমনাথ তাঁকে সাবধান করে বলেন –

> "বড্ড চালাক মেয়ে আমার বৌমা, খবরদার! সে বেটি বুঝতে পারে নি তো কিছু ?"[১০]

শঙ্কর উভয়ের কাছ থেকে ঘটনা শুনে অন্তরে গভীর ব্যথা পেয়েছে। কাহিনীতে চরিত্র দুটির বিস্তার নেই। কাহিনীকে ত্বরান্বিতও করেনি তারা। তবু স্বাধীনতার লড়াইতে তাদের এই নিভৃত আত্মত্যাগ আমাদের আলোড়িত করে।

উপন্যাসের শেষের দিকে গল্পকথক শঙ্করের স্ত্রী মল্লিকার উপস্থিতি চোখে পড়লেও তার জীবনবৃত্তটি পূর্ণাঙ্গ নয়। জাতিভেদ নিয়ে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রদের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়। মল্লিকা রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়কে এক করতে চাইলে, শঙ্কর বলেছে—

> "সত্যিকার স্বাধীনতা আনব আমরা গ্রামে-শহরে সকলের মধ্যে। মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, রাজ্যেশ্বর কোম্পানিকে এসেম্বলিতে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে কড়া কড়া বক্তৃতা করানো, আর তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের জন্য ভালো ভালো কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়।"[১১]

সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে মানুষ আবার এক হবে। এই প্রত্যয় ও সাম্যবাদে বর্ণিত হয়েছে লেখকের শেষ উক্তি —

> "বিরোধ অপ্রীতি দূর হয়ে যাবে, শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে, বিবাদের মধ্যে অন্যায় করছি! রক্তপাত হয়েছে, আপন-পর কত লোকের চোখের জল ঝরেছে! নতুন দিনে কারও এমন মনে থাকে না। প্রভাতের আলোয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলে যাব ভাই।"[১২]

সামগ্রিক বিচারে 'ভুলি নাই' উপন্যাসের খণ্ড কাহিনীগুলি এক একটি গল্পের প্রতিরূপ। সার্থক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এখানে অনেকটাই কম। স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার হাজার ভারতবাসীর মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষের আত্মবিসর্জনের মধ্যে দিয়েই এসেছে কাঙ্খিত স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের আজ কতজন মানুষ সেইসব ভারতবাসীর কথা মনে রেখেছে? তাদের কতজনকেই বা আমরা স্মরণ করি? স্বাধীন ভারতবর্ষ সেইসব আত্মত্যাগীকে মনে না রাখতে পারে আজ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী লেখক মনোজ বসু সুগভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁদের স্মরণ করেছেন। এ উপন্যাস সেই কৃতজ্ঞতার স্মারক।

সৈনিক

রাজনৈতিক চেতনাশ্রয়ী ও স্বদেশ প্রেমমূলক উপন্যাস 'সৈনিক' (১৯৪৫)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে উপন্যাসটি রচিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছু পূর্বের ঘটনা এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পান্নালাল সত্যাগ্রহ করে জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে যখন ছাড়া পেল তখন জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতার লোকজন ত্রস্ত। কলকাতা থেকে পলায়নের হিড়িক পড়ে গেছে। এক সময়ের প্রেমিক উমাকে সঙ্গে নিয়ে পান্নালাল জীবিকার সন্ধান করতে থাকে। কালোবাজারীর সঙ্গে যুক্ত হরিহরের বাড়িতে সে খাতা লেখার কাজ পায়। কিন্তু যে মুহূর্তে হরিহর জানতে পারল পান্নালালের প্রকৃত পরিচয় তখন চাকরি দিতে ভরসা

পেল না। পান্নালাল আশ্রয় পেল উকিল অনুপম ঘোষের বাড়িতে। যিনি এসেম্বলীর মেম্বার, পয়সাওয়ালা লোক।

হরিহর বোমার ভয়ে মেয়ে সুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাঁকাবড়শিতে ফিরে এসেছে। সুপ্রিয়া গ্রামে আসার পর গ্রামের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। গ্রামের চাষীদের সচেতন করতে আয়োজন করেছে কৃষক সম্মেলনের। এই উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে অুনপম ঘোষ এবং রাজনৈতিক নেতারা গ্রামে এসেছে। অনুপম নিজেই বাঁকাবড়শিতে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন।

> "আমি আর আমার মত ভাই ব্রাদার করে খাচ্ছি তো এই গণ্ডমূর্খগুলোর জোরে। এদের নামে পয়সা খরচ করে একটু স্ফূর্তি করলামই বা! এও একরকম স্পেক্যুলেশন বলতে পার। ...লেগে যায় তো কেল্লা ফতে। না লাগে, মনে করব ঘরের থেকে তো যাচ্ছে না, যা আসে ষোলআনা তার কখনো ঘরে তোলা যায় না।"[১]

যুদ্ধভীত নাগরিক হরিহর চৌধুরী, অনুপম ঘোষ, সুপ্রিয়ার আগমনে গ্রাম-বাংলার মানুষগুলির জীবনে দোলালাগে। তারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করে। অসৎ ছদ্মবেশী ভদ্রমানুষেরা কপট দেশপ্রেমের অভিনয় কোরে নিরক্ষর, অজ্ঞ, সরল মানুষদের বোকা বানায়।

অন্যদিকে পান্নালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে প্রাক্তন বিপ্লবী মহেশের সঙ্গে। দুজন একত্রিত হয়ে বিপ্লবাত্মক কাজে নেমে পড়েন। মানুষদের বুঝিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একত্রিত করে। এঁরা কোন একটি স্টেশন উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে বের হয়। কিন্তু পুলিশ খবর পেয়ে স্টেশনে এসে হাজির হন। স্টেশনমাষ্টারের মেয়ে অণিমার অদ্ভুত কৌশলে তারা ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। পান্নালাল তার পুরানো কর্মী রঞ্জন দাস-এর সঙ্গে দেখা করেন। রঞ্জনের স্ত্রী লীলাও বিপ্লবী ছিলেন।

পান্নালাল এরপর হরিহরের গ্রামে তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে এসেছেন গ্রামের মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য। কার্তিক এবং রূপদাসীর কন্যা যামিনীর দাম্পত্য জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে চোরাকারবারী, মুনাফালোভীদের প্রসঙ্গ। লেখকের গভীর মানবপ্রীতি থেকে উৎসারিত হয়েছে মন্বন্তরের ছবি। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের বর্ণনা।

অনুপমের ভণ্ডামি সুপ্রিয়ার কাছে গোপন থাকে না। অনুপমের বিবেকহীন মনুষ্যত্বকে আঘাত করে সে বলে –

> "লাখ লাখ মানুষ মরল, আর শাসনের নামে দুর্নীতির অব্যবস্থার চূড়ান্ত চলেছে ওদিকে। খুনী নয় তো কি বলব তোমাদের।"[২]

সুপ্রিয়ার গঠনমূলক কার্যকলাপ এবং পান্নালালের পুনশ্চ কারাবরণের মধ্যদিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

'সৈনিক' উপন্যাসে কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। নেই কোনো কেন্দ্রীয় কাহিনী। এটি একটি চলমান জীবনদর্শন। সমাজের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কয়েকটি ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের শুরু এবং শেষে যদিও লেখক পান্নালালকেই প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন তবুও নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রকে নায়ক বলা চলে না। পান্নালাল চরিত্রটি মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ। জেল থেকে বেরিয়ে আশ্রয়ের সন্ধান করতে গিয়ে সে দেশ ও জাতি সম্পর্কে লাভ করেছে নতুন অভিজ্ঞতা:

> "সত্যিই ভূত আমি। বাতাসে ভেসে আছি। এখানকার যেন কেউ নেই। দেড় বছরে যেন দেড়শ বছর কেটে গেছে জেলের বাইরে। কি শহর দেখে গেছলাম, আর ফিরে এলাম কোথায় ? কর্তাদের বলতে ইচ্ছে করে, যেখানে গ্রেপ্তার করেছিল, সেইখানে পৌঁছে দাও আমায়।"[৩]

শুরুতে মহান আদর্শ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হলেও ঘটনার পরম্পরায় তার মধ্যে সক্রিয়তার অভাব লক্ষ্য করি।

উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সুপ্রিয়ার। সে শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছে। গ্রামের মানুষদের করে তুলেছে সচেতন। গ্রামের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা সে ভাবেনি। অনুপমের মতো স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী চরিত্রকেও সে নিজের অনুকূলে আনতে পেরেছে। হরিহর অর্থাৎ সুপ্রিয়ার বাবা ইচ্ছাতেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক মেয়ের মতে সায় দিতে বাধ্য হয়েছে।

কাহিনীতে দ্বারিক সর্দার বা কেদারের যে জীবনবৃত্তান্ত লেখক অঙ্কন করেছেন তা অতুলনীয়। রাজনীতির চালে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন কীভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে লেখক তার

বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেশ, রঞ্জন, লীলা, কার্তিক ও যামিনী ক্ষুদ্র পরিসরে স্বমহিমায় উপন্যাসে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে লেখা হলেও উপন্যাসটিতে লেখকের আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন নতুন ভারতবর্ষের। বাংলার বহু বীর সন্তান নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে দেশ সেবার কাজে মেতে উঠেছেন। ইংরেজ সরকারের নির্যাতন এঁরা হাসি মুখে সহ্য করেছেন। দেশ এবং জাতির জন্য এই আত্মত্যাগ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। নূতন জীবন, নূতন জগৎ, নবীনতম ব্যবস্থা মানুষকে একদিন উন্নতির দিকে নিয়ে যাবেই। সে কথা ধ্বনিত হয়েছে পান্নালালের কথায় –

> "স্বাধীনতার আলোয় সোনার মানুষ, হাসিতে যাদের মুক্তা-মানিক ঝরে - আমি লিখে যাব অদূরকালে তাদেরই কথা।"[৪]

তাইতো উপন্যাসের শেষে জেলে যাওয়ার পর পান্নালালের লেখনী দিয়ে লেখক সেই কথাটি প্রচারে প্রত্যয়ী হয়েছেন –

> "জেলের মধ্যে বিশ্রাম-আনন্দে পান্নালাল এখন হয়ত কাব্য লিখে চলেছে। রূপদাসীর উদ্দেশ্যে প্রেমাচ্ছ্বাস নয়, আরও রোমাঞ্চক আগামী দিনের নূতন সূর্য আর নূতন মানুষের গান। আর আজকের ও অতীত দিনের বিস্মৃত নাম অপরাজিত সৈনিকদের অভিযান-কথা। ...দু'শ বছরের পরাধীনতা শুধু স্মৃতি হয়ে রইবে ইতিহাসের কয়েকটি পাতায় এক প্রাণহীন অধ্যায়ে। সে দিনের তরুণ - তরুণী বিস্ময় আর অপরূপ উল্লাসে বাঁকাবড়শি-মাদারডাঙা ও আরো লক্ষ লক্ষ গ্রাম খচিত বিশাল ভারতবর্ষের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের বিচিত্র সংগ্রামের গল্প। ক্লেদ-পঙ্কিলতার তলে বেঁচে আছে যে অমর-জীবন, নবীন আলোয় সেদিন শতদল ফুটে উঠবে।"[৫]

সেদিন হাজার হাজার সৈনিকদের আত্মত্যাগ সফল হবে। সেদিক থেকে উপন্যাসের নামকরণ 'সৈনিক' যথার্থ ও সার্থক।

ওগো বধূ সুন্দরী

মনোজ বসু তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসে যেমন দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যার মত গুরুগম্ভীর বিষয়কে তুলে ধরেছেন তেমনি হাস্যরসাত্মক লঘু রচনাও তাঁর লেখনিতে ফুটে উঠেছে বেশ কিছু উপন্যাসে। এমনি লঘু হাস্যরসাশ্রিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস 'ওগো বধূ সুন্দরী' (১৯৪৬)।

নামকরা গায়ক বসন্ত। বন্ধুদের সঙ্গে এদিক ওদিক গান গেয়ে বেড়ায়। সে সাংসারিক জীবনে উদাসীন। দাদা উপেন এবং বৌদি কিরণশশীকে নিয়ে এদের ছোট সংসার। কিরণশশী দেওর তথা বসন্তকে সন্তান স্নেহে বড় করে তুলেছে। বসন্তর বিবাহ স্থির করেছে উপেন। কিন্তু সে কোনোমতেই বিয়ে করতে রাজি নয়। এরই মধ্যে পাত্রীপক্ষ এসেছে বসন্তকে আশীর্বাদ করতে। এ বিষয়ে বসন্ত কিছুই জানত না। সে রেগে বৌদি কিরণশশীকে বলেছে—

> "মেয়ে আশীর্বাদ হয়ে গেছে, আমারও হবে শুনছি। তা কেউ একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলে না, আমাকে তোমরা কি ভাব বল তো।"[১]

বসন্ত বৌদির কাছে এত কথা বললেও দাদার কাছে একটা কথাও বলার সাহস নেই। পাত্রীপক্ষ বাড়িতে উপস্থিত থাকলেও রাতের অন্ধকারে এক জলসায় গান গাওয়ার জন্য কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে বসন্ত। কিরণশশী বুঝতে পেরে জামা-কাপড় লুকিয়ে দিয়েছে।

পুরানো গোমস্তা কালীচরণ ও ঘটক তারক চক্রান্ত করে এক বদরাগী পাত্রীর সঙ্গে বসন্তর বিয়ে ঠিক করেছে। উপেন পাত্রীর ব্যাপারে সবটা জানেন না। তাই গোমস্তা ও ঘটক বিবাহ তাড়াতাড়ি সারতে চায়। সকালে আশীর্বাদ-এর জন্য বসন্তকে ডাকতে গিয়ে জানা যায় নিজের জামা-কাপড় না পেয়ে সে অতিথিদের অর্থাৎ নায়েব ও গোমস্তার কাপড় চোপড় পরে পালিয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত পাত্র ছাড়াই লগ্নপত্রে দুপক্ষের সই হয়ে গেল। বিয়ের দিন ধার্য হল - দোসরা অগ্রহায়ণ।

বসন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে কোনক্রমে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁচেছে। কাউন্টারে ভীষণ ভীড়। টিকিট কিনতে পারা যাচ্ছে না। তাছাড়া ট্রেনের টিকিট কেনার পয়সাও তাঁর কাছে নেই। এই সময় একটি মেয়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোককে বলেন টিকিট কেটে দিতে।

> "আমার টিকিট করে দেবেন একখানা? ভদ্রলোক তার দিকে চাইলেন। বয়স কুড়ি-বাইশ, সুশ্রী বলিষ্ঠ গঠন, কথাবার্তা চালচলনে লেশমাত্র জড়িমা নেই। বললেন, আমি নিজেই শেষরাত্তির থেকে ঘন্টা আড়াই ঠায় দাঁড়িয়ে।"[২]

একথা বসন্ত শোনামাত্র সে নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে টিকিট কেটে দিতে রাজী হয়েছে। ভীড়ের মধ্যে সকলকে টেক্কা দিয়ে মেয়েটির টাকাতেই বসন্ত নিজের টিকিটও কেটেছে। মেয়েটির নাম শোভা। বাড়ি নীলমণিনগর। এরই সঙ্গে বসন্তর বিয়ে ঠিক হয়েছে কিন্তু বসন্ত জানত না আর শোভাও চিনত না। ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা নেই। শোভা বাকি পয়সা ফেরত চাইলে বসন্ত চালাকি করে বলেছে, গাড়িতে উঠে মিটিয়ে দেবে। গাড়িতে ভীষণ ভীড় তিল ধারণের জায়গা নেই, তবুও গাড়িতে তুলেছে এবং বসন্ত কৌশল করে ট্রেনে শোভার শোওয়ার জায়গাও করে দিয়েছে। আপাদমস্তক চাদরে মোড়া। লোকজনেরা বসতে চাইলে বসন্ত তাদের বলেছে —

> "মা শীতলার অনুগ্রহ। জানেন তো কী যন্ত্রণা। ইনি নিতান্ত ঠাণ্ডা মানুষ বলেই না –"[৩]

শোভার ব্যাগ থেকে ইতিমধ্যে টাকা, কলা ও লেবু চুরি করেছে বসন্ত। শোভা জানতে পেরে তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে। কিন্তু বসন্ত সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। শোভার ছোঁড়া ডাব পায়ে লেগেছে বসন্তের। খোঁড়া পা নিয়ে বসন্ত পালাচ্ছে অহরহ ক্ষেত, বাঁশবাগানের মধ্যদিয়ে। মাঠে চাষীরা হৈ হৈ করে তাড়া করলে ভয় পেয়ে বসন্ত গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে যায়। পরে এক গোরুর গাড়িতে করে সে পৌঁছায় মাধবপুরে। সেখানে নটবর নামে একজনের সাহায্যে কবিরাজ নীলকান্তর কাছে উপস্থিত হয় বসন্ত। কবিরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এখানেই বসন্তের সঙ্গে পরিচয় হয় নীলকান্ত কবিরাজের ভগিনী লক্ষ্মীর সঙ্গে। লক্ষ্মীর উদ্যোগে কবিরাজের বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বসন্তের জন্য –

> ''আসন পেতে জল ছিটিয়ে লক্ষ্মী সযত্নে ঠাঁই করে দিয়েছে। বসন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। কৌতুক স্নিগ্ধ সুখে লক্ষ্মী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।''[৪]

ভোর হতেই বসন্ত মাগুরখালি অর্থাৎ যেখানে গান গাইতে যাওয়ার কথা ছিল সেই উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। শোভার ব্যাগ থেকে চুরি করা দশ টাকার ভাঙানি না থাকায় গঙ্গা পার হতে পারে না। যাওয়া হল না মাগুরখালি। এক রামায়ণ আসরে বসন্ত আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। কিনে ফেলেছে একটা বেহালা। বসন্ত মনে মনে ভাবে —

> ''মাগুরখানি গিয়ে লাভই বা কি হত। ভাঙা আসরে গিয়ে হাস্যাস্পদ হওয়া। হাত ধরে বেহালাদারকে যেন সে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে।''[৫]

পাঁচ টাকা বেশি দিয়ে শিখেছে দুটি গৎ।

একদিন বসন্তরা দাবা খেলছে। হঠাৎ নারী কন্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে বসন্ত ছুটে এল। জানতে পারল কবিরাজের ভাগ্নি লক্ষ্মী রান্নাঘরে বসেছিল। হঠাৎ তিনকড়ি এসে তার হাত ধরে। তাতে লক্ষ্মী রেগে গিয়ে এক চড় কসিয়ে দিয়েছে। সেজন্য তিনকড়ি কাটারি নিয়ে তাড়া করে লক্ষ্মীকে। সমস্ত জানার পর উত্তেজিত বসন্ত রেগে গিয়ে ঘুমন্ত কবিরাজকে পিটিয়ে এসে ঘরে শুয়ে পড়েছে। পরেরদিন কবিরাজ দলবল নিয়ে মারতে গিয়ে সামলে নেয়। আর অনেক ভনিতা করে লক্ষ্মীর বিয়ের কথা পাড়ে। কথা শেষ করতে না দিয়ে বসন্ত বলে –

> "মাপ কর, কথা বললেই কি পাত কাটতে হবে ? ও সব তালে নেই। ঠাকরুণটির ঠেলায় কাল তো সকাল সন্ধ্যে দুবেলা উপোশ গেছে। ভাবলাম, খাওয়ার দুঃখ ঘুমে পুষিয়ে নেব — তা তুমি মাতুলমশায় রাতে একবার হুঙ্কার দিয়ে গেছ, আবার ভোরবেলা এসে দুয়োর ভাঙছ। কেন, ধেরে খেয়েছি নাকি তোমাদের।"[৬]

বসন্ত মনে মনে পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করেছে। ভোর বেলা বাইরে যেতে গিয়ে দেখে সে নিজেই ঘরের মধ্যে তালাবন্দী হয়ে আছে। লক্ষ্মীকে বিয়ে করলেই তবে ছাড় পাবে। নটবর একথা বলেছে বসন্তকে। সেই সঙ্গে তিনকড়ির ঘটনাটা বসন্তর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে নটবর। সে চারিদিক বসন্তর নামে বদনাম করে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মী একথার প্রতিবাদ করেছে। বসন্তর দাদার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে নটবর। যথাসময়ে উপেন চৌধুরী তথা বসন্তর দাদা কবিরাজের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। লক্ষ্মীর বিয়ের জন্য উপেন কবিরাজকে চারশো টাকা দিয়েছে।

গভীর রাতে লক্ষ্মী চুপি চুপি বসন্তর দরজা খুলে দিয়েছে। ফেরৎ দিয়েছে চারশো টাকা। বসন্ত টাকা নিতে না চাইলে লক্ষ্মী জানায় যে, টাকা না নিলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। অগত্যা বসন্ত টাকা নিতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে নীলকান্ত কবিরাজ উঠে দেখে বাক্সের ডালা খোলা রয়েছে; চাবির গোছা নেই। চারিদিকের দরজা বন্ধ রয়েছে। নীলকান্ত চুপচাপ শুয়ে থাকে। লক্ষ্মী চাবি রাখতে এসে ধরা পড়ে। নীলকান্ত লক্ষ্মীকে মারধোর করেছে। আর্তনাদ শুনে উপেন, নটবর, বসন্তরা ছুটে এসেছে। উপেনের মধ্যস্থতায় অবস্থা আয়ত্তে এসেছে। লক্ষ্মী বিয়ের জন্য টাকা নিতে অপমান বোধ করায় উপেন নিজেই জিনিস কিনে দেবে বলে কথা দিয়েছে। আর উপেন

মনে মনে ভাবছে, বসন্তর বিয়ের পাকা কথা না হলে এই সোনার প্রতিমা সে নিজের ঘরেই নিয়ে তুলত। —

> ''ঘুম আসে না উপেনের – মেয়েটার কান্নাভরা মুখ বার বার মনে আসছে। তিনি যে পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন। পাহাড় নড়বে তো উপেন চৌধুরির কথা নড়বে না। নইলে যেখানে সেখানে যার তার ঘরে দিয়ে দিতে মন চায় কি এই সোনার প্রতিমা।''[৭]

সবাই মিলে বিয়ের বাজার করতে গেছে। কেনাকাটার পর গাড়িতে উঠতে গিয়ে শোভার সঙ্গে বসন্তর দেখা হয়েছে। শুরু হয়েছে কলহ। গণ্ডগোল শুনে উপেনরা ছুটে এসেছে। উল্টো দিকের দোকানে পান খাচ্ছিল কালীচরণ ও তারক। তারাও এসে হাজির। সব জানাজানির পর বসন্ত উপেনের পা জড়িয়ে ধরে বলেছে —

> "রক্ষে করুণ, দাদা। বিয়ে না দিয়ে গলায় দড়ির একটা ফাঁস লাগিয়ে দিন। তাই তো করতে হবে দু'দিন পরে।"[৮]

কথা শুনে শোভা রেগে আগুন। বলে —

> "করছে কে বিয়ে ? চোর-ছ্যাঁচোড়কে আমি বিয়ে করব না — কক্ষণো না। নিয়ে নিন আপনাদের আশীর্বাদের আঁটি —"[৯]

সে আশীবাদী আংটি রাস্তায় ফেলে পালিয়েছে। উপেন এতে অপমান বোধ করেছেন। নটবর তিনকড়িকে দেখিয়ে কালীচরণকে বলেছে শোভার সঙ্গে বিয়ে দিতে। ইতিমধ্যে বিড়ি কেনার নাম করে তিনকড়ি পালিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত দাদা উপেনের কথা মেনে নিয়ে বসন্ত লক্ষ্মীকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। বসন্ত বলেছে —

> "কালো হলেও লক্ষ্মী অনেক সুন্দরী তার চেয়ে। এ জল ঢালে, ডাব ছুঁড়ে মারে না।"[১০]

উপন্যাসটির মধ্যে চরিত্র নয় ঘটনাই প্রাধান্য পেয়েছে। ঘটনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বস্ততার সীমা লঙ্ঘন করেছে। ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির বিশ্লেষণের পরিবর্তে হাস্যরস সৃষ্টিতে বেশি নজর দিয়েছেন। উপন্যাসের শুরুতেই বসন্তর বাড়ি থেকে পালানোর পূর্বে বৌদি কিরণশশী সক্রিয় হলেও পরবর্তীতে চরিত্রটির কথা আর নেই। ট্রেনে শোভার সঙ্গে বসন্তর আচার-আচরণের মধ্যেও চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীদের বাড়িতেও বসন্তর আচরণ, তিনকড়ির আচরণ সমস্তই অতিরঞ্জিত। কাহিনী যথার্থ হলেও

চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কোথাও ফুটে ওঠেনি বা লেখক বর্ণনা দেননি। একমাত্র কাহিনী জুড়ে বসন্ত চরিত্রটিই কিছুটা সক্রিয়। তাও ঘটনাপ্রবাহে বা কাহিনীর বিস্তারে তার কোনো ব্যক্তিগত নৈপুণ্য চোখে পড়েনা।

অপরিচিত শোভার সঙ্গে বসন্তর বিয়ের কথা হয়েছে। যদিও কেউ কাউকে চিনত না। ট্রেনে উভয়ের মধ্যে পরিচয় এবং গণ্ডগোলের কারণে বসন্তের স্থান হয়েছে কবিরাজ নীলকান্তের বাড়িতে। সেখানে নীলকান্তের ভাগ্নি লক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে বসন্তর। লক্ষ্মীর ব্যবহার, আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে ঘটনার প্রেক্ষিতে বসন্ত তাকেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। যদিও শোভার মত ফর্সা বা দেখতে সুন্দরী নয় লক্ষ্মী। তবুও তাকেই পছন্দ করেছে বসন্তর দাদা উপেনও। ছোট-ভাই গায়ক বসন্তর বিবাহ পূর্ব ঘটনা এবং পাত্রী নির্বাচনই যেহেতু উপন্যাসের কাহিনীর বিষয়বস্তু তাই উপন্যাসের নামকরণ 'ওগো বধূ সুন্দরী' সার্থক।

শত্রুপক্ষের মেয়ে

'শত্রুপক্ষর মেয়ে' (১৯৪৬) কোম্পানী আমলের প্রথম যুগে বাংলাদেশে জমিদারী পত্তনের সময়কার কাহিনী। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে বনজঙ্গল পরিবেষ্টিত নদীবহুল বসতি বিরল অঞ্চলে জমিদারী প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতা ও শঠতার বহু সহস্র কাহিনী। এ উপন্যাস সেইসব কাহিনীর একটি সাহিত্য রূপ।

শ্যামশরণ নামে এক ব্যক্তি বাড়িতে ঝগড়া করে পিতৃভূমি ছাড়েন। নদীর চরে শ্যামগঞ্জ গড়ে তোলেন। জলদস্যুতার মাধ্যমে অফুরন্ত টাকা পয়সার মালিক হন। শ্যামচরণের মৃত্যুর পর তারই এক বংশধর নরহরি চৌধুরী অর্থের লোভে শ্যামগঞ্জে উপস্থিত হন। অর্থের অভাবে নরহরি পূর্বপুরুষের দেখানো পথ অনুসরণ করতে গিয়ে শিবনারায়ণ ঘোষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রকৃতির রোষে নাজির ঘেরি তালুকের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে শিবনারায়ণ ঘোষ সপরিবারে প্রেমভোগে যাচ্ছিলেন নৌকা করে। অন্ধকার রাতে ডাকাতি করার জন্য নরহরি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার্থে শ্যামের বাঁশি লাঠিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এতে বৈষ্ণব অনুভবের মধুরিয়া ক্ষুন্ন হয় না বলেই প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হলেন নরহরি ও শিবনারায়ণ দুজনে। নরহরির ছেলে শ্যামাকান্ত এবং মেয়ে সুবর্ণলতা। মেয়ের জন্মের পরই মৃত্যু হয়েছে

নরহরির স্ত্রীয়ের। আর শিবনারায়ণের স্ত্রী সৌদামিনী, মেয়ে মালতী এবং ছেলে কীর্তিনারায়ণকে নিয়ে শিবনারায়ণের সংসার। একইসঙ্গে সুখ দুঃখের সঙ্গী হিসেবে এদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল।

জমিদার শিবনারায়ণ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কিন্তু নরহরি কালীভক্ত হলেও উগ্র এবং প্রভুত্বলোভী। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে শ্যাম আর শ্যামা রূপের বিরোধ নিয়েই শুরু হল শিবনারায়ণ ও নরহরির দ্বন্দ্ব। নরহরি ভেবেছিলেন শিবনারায়ণ তাঁর অনুগত হয়ে থাকবেন। কেননা, নরহরির রক্তে রয়েছে জমিদার শ্রেণির প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্খা। ক্রোধের বীভৎসতা, লোভের নির্লজ্জতা তাঁকে সর্বদা তৃষ্ণার্ত করে রাখে। গোড়াতেই শিবনারায়ণ বলেছেন –

> "মানুষই বেঁচে থাকতে চায় - সবারই বাঁচবার অধিকার রয়েছে। একের লোভ বিশ্বগ্রাসী হলে আর দশজনেরই সর্বনাশ হয় তাতে। আমার তো মনে হয় পৃথিবীতে জায়গা-জমি যা আছে তাতে কারও অনটন হবার কথা নয়। কিন্তু মানুষের লোভ বেড়ে চলেছে – লোভের জায়গা হচ্ছে না বলেই চারিদিকে এত অশান্তি।"[১]

শিবনারায়ণের বিনয় এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সহজ সরল ব্যবহার নরহরিকে মুগ্ধ করে। শিবনারায়ণের কন্যা মালতীকে ভাবী পুত্রবধূ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে নরহরি। কিন্তু মহাকালীর মন্দিরে শিবনারায়ণের অনুপস্থিতি নরহরির আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। মাধব বাবাজির আখড়ায় গিয়ে শিবনারায়ণকে নামসংকীর্তন করতে দেখে নরহরির চোখ জ্বলে উঠল-

> "অঙ্গনে সংকীর্তন হইতেছে - শ্যাম রাধিকার নৌকা-বিলাস। শিবনারায়ণের চোখে দরদর ধারা, সম্বিৎ নাই, আকুল হইয়া গায়ককেই এক একবার আলিঙ্গন করিতেছেন।"[২]

বন্ধুকে নিয়ে ফিরে আসেন নরহরি। প্রতিহিংসাপরায়ণ নরহরি চৌধুরী প্রতিশোধ স্পৃহায় অধির হয়ে ওঠেন। শিবনারায়ণকে জোর করে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে মাধব বাবাজীর আখড়ায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন নেভাতে গিয়ে শিবনারায়ণ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বাঁচলেও মারা যান মাধব বাবাজী। এই ঘটনার পর শিবনারায়ণের কন্যা মালতীকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে রাজি হলেন না নরহরি। নরহরি বলেন –

> "ন্যাড়ানেড়ির মেয়ে চৌধুরী বাড়ির বউ হবে - ক্ষেপেছ তুমি ?"[৩]

বৈষ্ণবীয় সহিষ্ণুতায় শিবনারায়ণ নরহরির বাড়ি ত্যাগ করল। নতুন বসতি স্থাপন করল বরণডাঙায়। লেখকের বর্ণনায় –

> "দুই অঞ্চলের দুই মানুষ এক রাত্রে মালঞ্চের উপর কোলাকুলি করিয়াছিলেন। তারপর শ্যামগঞ্জের প্রাচীন পাষাণ-অলিন্দে পাশাপাশি তাঁদের কত দিন রাত্রি কাটিয়াছে। চক বন্দোবস্তের সময়, চকহাসিলের মুখে, মাঠে -ঘাটে জলে-জঙ্গলে নরহরি কত সাধ বাসনার গল্প করিয়াছেন শিবনারায়ণের সঙ্গে, দুটি আত্মার নিত্যসম্বন্ধের গর্ব করিয়াছেন। মাধব দাসের আখড়া পুড়িবার মাস ছয় সাতের মধ্যে সব কিছুরই মিমাংসা হইয়া গেল। পাঁচখানা চকের মধ্যে দুখানা আর নগদ কিছু অর্থ শিবনারায়ণের ভাগে পড়িল। তাই লইয়া একদিন খুব সকালে চিতলমারির খাল ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।"[৪]

অগ্নিদগ্ধ শিবনারায়ণ মারা গেলেন কিছু দিনের মধ্যে। মাধব দাসের আখড়ার পাশে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে মঠ। শিবনারায়ণের মেয়ে মালতির বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম সহকারে। রাগ মিটানোর জন্য নরহরি ছেলে শ্যামকান্তেরও বিয়ে দিয়ে দিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে যে আত্মিক সম্পর্কের যোগাযোগ হওয়ার সম্ভবটুকু ছিল তাও নিঃশেষিত হল। শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর নরহরির আদিম বন্যরূপটি প্রকাশ পেতে শুরু করল। সে শিবনারায়ণের মঠ বাড়ি দখল করতে বদ্ধ পরিকর। শুরু হল শিবনারায়ণের স্ত্রী সৌদামিনীর সঙ্গে চরম শত্রুতা। শক্তি আর দর্পের অহংকারে অন্ধ নরহরি মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে শিবনারায়ণের তালুক দখল করে নিলেন। কীর্তিনারায়ণ এবং শিবনারায়ণের সঙ্গী চিন্তামণি প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যান চিন্তামণি। চিন্তামণি হত্যার দায়ে নরহরির জেল হয়। এরপরেই পরিবর্তন আসে নরহরির মধ্যে। তৃষ্ণার আগুনে অন্যকে পোড়াতে গিয়ে নিজেই পুড়ে খাক হয়ে গেলেন। নরহরির দম্ভ হাহাকারে পরিণত হল। সৌদামিনীকে নরহরি বলেন –

> "রাগ-অভিমানের ওপারে আজকে আমি বউঠান। সন্দেহ হচ্ছে, আমার মৃত্যু হয়ে গেছে।...জেলে গিয়েছিলাম – সে অপমান দু-দিনে জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখছি, শ্যামগঞ্জ আলাদা রকমের হয়ে গেছে। সারা জীবন কাটিয়ে সাত বছরের ফাঁকে সমস্ত আনকোরা নতুন লাগছে। বিকালবেলা খাল-পার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। কি হাত খুলেছে, মরি মরি! স্থির থাকতে পারলাম না বউঠান সাঁকো পেরিয়ে পায়ে পায়ে আপনার বাড়ি চলে এসেছি।"[৫]

নিজের বিরুদ্ধে আজ তাঁর বিদ্রোহ। প্রতিপক্ষ সৌদামিনীর দীন কুটিরে অতিথি হতে দ্বিধা থাকে না মনে। স্বেচ্ছায় সে অনুগত লাঠিয়ালদের মধ্যে বৌ-ভাসির বিল বাঁটোয়ারা করে

দিলেন। এতদিনের সমস্ত বিজয় তাঁর পরাজয় বলে মনে হল। নিঃসঙ্কোচে সুবর্ণলতার সঙ্গে কীর্তিনারায়ণের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন সৌদামিনীর কাছে —

> "নিতান্ত বেহায়া বলেই মুখ ফুটে বলতে পারছি, অনুমতি দিন - কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে আপনার পাদপদ্মে এনে রেখে যাই।"[৬]

কিন্তু শিবরায়ণের পুত্র কীর্তিনারায়ণকে জামাই রূপে বরণ করে নেওয়ার সময়ও পুরাতন প্রতিপক্ষ মনোভাব সংগ্রামের সৃষ্টি করে। মাথা ফাটে কীর্তিনারায়ণের। নরহরির এই মনোভাব সঞ্চারিত হয় কীর্তিনারায়ণের মধ্যে। স্ত্রী সুবর্ণলতাকে সে প্রতিপক্ষ মনে করে। কীর্তিনারায়ণের কাছে সুবর্ণলতার পরিচয় হল সে 'শত্রুপক্ষের মেয়ে'। কীর্তিনারায়ণের অন্তরে লুকিয়ে থাকা বিক্ষোভ বিদ্রোহ দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যে অভিষিক্ত হয়। কীর্তিনারায়ণের কথায় –

> "এতদিন ধরিয়া এত শিখিয়া এত লোককে হারাইয়া আসিয়া শত্রুপক্ষের মেয়ের কাছে অবশেষে হার হইয়া যায় নাকি ?"[৭]

হার মানিতেই হয়। বিরোধের অবসান ঘটেছে দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে দিয়েই।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার নরহরি চৌধুরী এবং শিবনারায়ণের আধিপত্য স্থাপনের কাহিনী আলোচ্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। নরহরি চৌধুরীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে পূর্বপুরুষের ন্যায় লোভ,লালসার তৃষ্ণা। সে শ্যামা মায়ের ভক্ত। বন্ধু শিবনারায়ণ ঘোষের সঙ্গে এই নিয়ে বিরোধ বাঁধলে শ্যাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বলেন –

> ''মহাকালীর অভিসম্পাত বন্ধু। রক্তজবা পেলে মা খুশি হন, তোমার ঐ বোষ্টমেরা ঠাট্টা করে জবার নাম দিয়েছে ওড়ফুল।''[৮]

শিবনারায়ণের সঙ্গে বিরোধের জেরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক শত্রুতায় রূপান্তরিত হয়। ঘৃণ্য জমিদারী মানসিকতা শেষ পর্যন্ত হাহাকারে পরিণত হয়। অন্যদিকে শিবনারায়ণ বৈষ্ণব ভক্ত। বৈষ্ণবীয় মানসিকতায় সে কখনো নরহরিকে শত্রু বলে ভাবতে পারেনি। শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর পরিবারের শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ে দুই পরিবারের দুই ছেলে শ্যামাকান্ত ও কীর্তিনারায়ণ। এই দুটি চরিত্রের মধ্যে পারিবারিক গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। শিবনারায়ণের পত্নী সৌদামিনীর মধ্যে যেমন মাতৃস্নেহ প্রকাশ পেয়েছে ছোট সুবর্ণলতাকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর নরহরির সঙ্গে বিরোধেও সতর্ক থেকেছেন। শেষের দিকে সুবর্ণলতা

চরিত্রটির মধ্যে বিশেষ সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। প্রভুভক্ত চরিত্র হিসেবে চিন্তামণি, রঘুনাথ, মালাধর প্রমুখরা কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জমিদার শ্রেণীর বিরোধ 'শত্রুপক্ষর মেয়ে' উপন্যাসের মূল আলোচ্য বিষয়। বন্ধুত্ব থেকে শত্রুতায় আসার একমাত্র কারণ শ্যাম ও শ্যামার বিরোধ। অর্থাৎ শ্যাম বড় না শ্যামা। নরহরি ও শিবনারায়ণের পরিবারের বিরোধ - এর চরম পরিণতির প্রাক্কালে নরহরি সৌদামিনীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে সুবর্ণলতার বিয়ের। সুবর্ণলতা শত্রুপক্ষের মেয়ে তাই বিয়ের পরেও কীর্তিনারায়ণ তাকে শত্রুপক্ষের মেয়ে বলেই ভাবে। এই মেয়ের আগমনেই দুই পরিবারের বিরোধের অবসান হয়েছে রূপকথার মতো। লেখকের কথায় –

> "এ কাহিনীর আমি এইখানে আপাতত ছেদ টানিয়া দিলাম। ইহারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকুক – রূপকথার - শেষে যে রকমটা হইয়া থাকে। আমার তো মনে হইতেছে, রূপকথা শুনাইয়া আসিলাম এতক্ষণ ধরিয়া।"[৯]

শত্রুপক্ষের সঙ্গে বিরোধের অবসান যেহেতু মেয়ে সুবর্ণলতার হাত ধরেই হয়েছে, সে কারণেই নামকরণ হয়েছে 'শত্রুপক্ষের মেয়ে'।

আগষ্ট ১৯৪২

'আগষ্ট ১৯৪২' (১৯৪৭) উপন্যাসটি বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস। স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী যে আশা-হতাশার দোলায় দুলছে, যে আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম করছে, সেই কাহিনীকেই লেখক উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের চরম পরিণতি ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের সামগ্রিক চেহারা যাতে স্পষ্ট হয় সেজন্য লেখক এই উপন্যাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্ব: আদি কথা, দ্বিতীয় পর্ব: সংগ্রাম, তৃতীয় পর্ব: উত্তর কথা।

প্রথম পর্ব: আদি কথা – ৪২ এর আন্দোলনের পূর্বের ঘটনা। এর একদিকে আছে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ (১৯২০), আইন অমান্য (১৯৩০) আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং

বিরাট স্বপ্ন। আর অন্য দিকে আছে শাসক শক্তির পীড়নমূলক দমননীতি। সেই সঙ্গে রয়েছে অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্পর্কে জনসাধারণের জিজ্ঞাসা, হতাশা ও নৈরাশ্য।

কাহিনীতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি যুথিকা। স্বদেশী আন্দোলনের বিমুখী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের উদ্দেশ্যে সে বলে –

> "তোমরা নাচিয়ে দাও, আর বোমা রিভলবার ছুঁড়ে মারা পড়ছে সেন্টিমেন্টাল ছেলেগুলো। এই নির্মল ঘোষের কথাই ধর, জীবন দিয়ে লাভটা কি হল। দুশমনটা মরতও যদি তবু চরবৃত্তি করবার লোকের অভাব হত কি দেশের মধ্যে ? দু'দশটা অমন কীটপতঙ্গ মেরে এ গর্ভনমেন্ট ঘায়েল করা যাবে না, নিজেরাই মারা পড়ছে শুধু।"[১]

স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের অবাস্তব কর্মপন্থা এবং অহিংস আন্দোলন যুথীর মনে কোনো প্রত্যয় জাগাতে পারে না। দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টায় গান্ধীজির যন্ত্রের বিরুদ্ধে চরকায় চ্যালেঞ্জ এক অবাস্তব হাস্যকর পরিকল্পনা। মহিমকে সে বিদ্রুপ করে বলে –

> "দেশসুদ্ধ লোক বন বন করে ঘোরাতে থাকলে স্বরাজ আপনি বেরিয়ে আসবে। ...কিন্তু সুতো হয় বলে স্বরাজও হবে। সৈন্য কামান জাহাজ এরোপ্লেনে ঘেরা ইংরেজের রাজত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।"[২]

প্রথম পর্বে রাজনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি গার্হস্থ জীবনের প্রতি ব্যাকুলতা থেকে এসেছে চন্দ্রা ও শিশিরের রোমান্টিক প্রেমকাহিনী। যা রাজনৈতিক ঘটনার একঘেঁয়েমি দূর করেছে।

দ্বিতীয় পর্ব: সংগ্রাম – ৪২ এর আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ এবং তার ব্যাপকতা লেখক এই অংশে স্পষ্ট করেছেন। এতদিন যাদের অন্ধকূপে –

> "আটকে রাখা হয়েছিল...পাথর ঠেলে বেরিয়েছে, আলোয় এসেছে, কে রুখবে আর এখন।"[৩]

লেখক এই অংশে বিচিত্র সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন। নিজেরাই নেতা হয়েছে। মাথার উপর নির্দেশ দেবার কেউ নেই। নেতাদের স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা আন্দোলনের তীব্রতাকে লঘু করেছে।

৪২-এর আন্দোলনের তরঙ্গে প্লাবিত হয়েছে মহকুমা শাসক শিশিরের সরকারী বাসভবন। চন্দ্রা ও শিশিরের মধুর দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে বিচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন সাধারণ

ভারতবাসীর প্রতিনিধি অন্যজন শোষক তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের গোলাম। শিশিরের বাংলোয় চন্দ্রা সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী বলে নিঃসঙ্গ এবং ঘৃণার পাত্র। সে বরানগরে বাপের বাড়ি চলে গিয়ে এই দ্বন্দ্বের মিমাংসা করল। এখন সে সাধারণের দলে। বিশাল জনতার একজন। আর শিশির সরকারী কর্মচারী বলেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। ভারতবাসী হয়েও সে ভারতীয় নয়। জাতির প্রথম পরীক্ষার দিনে চন্দ্রা আহ্বান জানায় শিশিরকে। তাকে না পেয়ে চন্দ্রা অভিমানে ৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়েছে।

তৃতীয় পর্ব: উত্তর কথা – এই অংশে স্থান পেয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টভঙ্গি এবং আন্দোলনের ফলশ্রুতি। আন্দোলনের কারণে যে সকল আত্মত্যাগ তা কি সার্থকতা পেয়েছে ? এসব অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা রয়েছে এই অংশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরে আন্দোলনের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়েছে। কাহিনীর পরিণতিকে মধুর করতে লেখক শেষ অংশে মহিম যুথীর বিয়ের রোমান্টিক ছবি এঁকেছেন সুনিপণতার সঙ্গে।

আলোচ্য উপন্যাসে সমগ্র দেশ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। চরিত্র যারা এসেছে, এক একটি মহৎ আদর্শের প্রতিভূ হিসেবেই তারা এসেছে। চন্দ্রা ও শিশির ছাড়া কারো জীবন পূর্ণাঙ্গ নয়। দুজনের মধ্যে আদর্শগত এবং শ্রেণীগত বিরোধে বিচ্ছেদ দেখা গেছে। তবুও এই উপন্যাসের মধ্যে যদিও কোন চরিত্রের মধ্যে মানবিক গুণ লক্ষ্য করা যায় তা এ দুটি চরিত্রের মধ্যে। মহিম চরিত্র লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে সেভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেননি। এছাড়াও চন্দ্রা, যুথীকা, সৌদামিনী এক একটি আদর্শের বাহক হয়ে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরা। সে কারণেই চরিত্রগুলি স্বমহিমায় ভাস্বর হতে পারেনি।

১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট বাংলার চিরবিদ্রোহী সত্তাগুলি গর্জে উঠেছিল। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে নীতি অবলম্বন করে শহর কলকাতা তথা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের আগুন। যে আগুনের লেলিহান শিখায় বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে। এমনই এক স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত 'আগষ্ট ১৯৪২'। আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পূর্বের ঘটনাক্রমও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে ৪২ এর

আন্দোলন ও তার ফলশ্রুতি তুলে ধরেছেন লেখক। কাহিনীতে চন্দ্রা - শিশির এবং মহিম-যুথীর প্রেমের কাহিনীকে স্থান দিয়ে উপন্যাসিক ত্রিবেণী সংগম রচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও কাহিনীর বন্ধন শিথিল হয়নি। যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট লেখক তুলে ধরতে চেয়েছিল তাও খর্ব হয়নি। সেদিক থেকে নামকরণ 'আগষ্ট ১৯৪২' সার্থক হয়েছে।

বাঁশের কেল্লা

'বাঁশের কেল্লা' (১৯৪৮) উপন্যাসটি 'ভুলি নাই' উপন্যাসের মতো রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট জয়রামপুর নামে একটি গ্রামে সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সভায় যোগ দিতে আসা জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী অপর পথচারীকে অতীতের ঘটনাগুলি বলেছেন। স্মৃতিকথনের ভঙ্গিতে রচিত এই উপন্যাস।

কথকের স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯), সশস্ত্র অভিযান (১৯৩০), লবণ-সত্যাগ্রহ (১৯৩০), আগস্ট বিপ্লব (১৯৪৫)। লেখক মনোজ বসু জীবনের রূপকার। নীলবিদ্রোহ তাই এখানে 'নীলদর্পণে'র মত অত্যাচারী হৃদয়হীন নীলকরদের কাহিনী নয়। জয়রামপুর গ্রামের মানুষদের সঙ্গে সাহেবদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলেই গ্রামের একটি পাড়ার নাম হয়েছে সাহেবপাড়া। যেখানে সাহেবরা তৈরী করেছিল বাংলোবাড়ি। কোম্পানীর প্রথম আমলে রামজয় ঠাকুর এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিল সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরী মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে জনবসতি বাড়তে থাকে। রামজয় ঠাকুর সরকার বাহাদুরকে কর দিতে অস্বীকার করলে কোম্পানীর সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য বাঁশ পুঁতে পুঁতে তৈরী হয়েছিল বাঁশের প্রাচীর। বাঁশের কেল্লা। কোম্পানীর ফৌজের গুলিতে মারা যান রামজয় ঠাকুর। বাঁশের কেল্লা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পোঁতা বাঁশ থেকেই জন্ম হয় বাঁশের ঝাড়। যা এখন গ্রামটাকে ঘিরে রয়েছে।

পরে এ গ্রামেই তৈরী হয় ইংরেজদের নীলকুঠি। শুরু হয় নীলের দাদনের নামে প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ডানা বাঁধতে থাকে। প্রজারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রাণ নিয়েছে নীলকুঠির কর্মচারীদের। প্রজাদের আন্দোলনের প্রসঙ্গক্রমেই এসেছে পীতাম্বর চাটুজ্যে, তার মেয়ে দুর্গা, ইংরেজ কর্মচারী পশুপতি, কুঠির মালিক হেলী এবং

জনগণের নেতা কেশবের কাহিনী। পণ্ডিত পীতাম্বরের ছাত্র জননেতা কেশব ভালোবাসে দুর্গাকে। কিন্তু পীতাম্বর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেন নীল কর্মচারী পশুপতির সঙ্গে। দুর্গার কুরূপের জন্য পশুপতির মা পীতাম্বরকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। পরে কেশবের দলবল পশুপতিকে ধরে নিয়ে যায় গণ বিচারের জন্য। পথে পশুপতি কোনোক্রমে পালিয়ে আশ্রয় নেয় পীতাম্বরের বাড়িতে। দুর্গার পরিচর্যায় পশুপতি সুস্থ হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতাবশতঃ দুর্গাকে বিয়ে করতে সম্মত হয় পশুপতি। হেলীকে সঙ্গে নিয়ে পশুপতি পাকা কথা বলতে এলে দুর্গা জনতার হাতে এদের পুরো দলকে ধরিয়ে দেয়। কারণ, দুর্গা বুঝতে পেরেছিল পশুপতি এবং হেলীরা জনগণের মিত্র নন। নীলকরদের হাতেই মারা গিয়েছে কৃষক নেতা কেশব। দুর্গা এজন্য নিজের জীবনের সর্বনাশ ডেকে এনে কেশবের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে হেলী ও পশুপতিদের ধরিয়ে দিয়ে। কেশবের জনগণ তাঁদের হত্যা করেছে।

রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে জয়রামপুর গ্রাম। লর্ড কার্জন বাংলাকে দু-টুকরো করতে চাইলে, সারা বাংলা জুড়ে পালিত হয়েছিল রাখিবন্ধন এবং অরন্ধন। এর প্রভাব পড়েছিল জয়রামপুর গ্রামে। নীলকমল দাস তাঁর কোনো কোনো ছাত্রকে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর শুরু হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে অনেকে বহুবার কারাবরণ করেছেন। আবার অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। যে সমস্ত শহীদ সেদিন মৃত্যুর মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়েছিল, তাদের অনেকের কথাই আজ ইতিহাসে লেখা নেই। পুলিশের গুলিতে নিহত হরিচরণ ন্যায়তীর্থ মশায়ের ছেলে কানু গাঙ্গুলির মৃতদেহ সৎকার হয়নি। তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রাম-বাংলায় এরকম কত কানু গাঙ্গুলি প্রাণ দিয়েছে। তাদের কোনো হিসেব নেই। কানু যেন সেইসব নাম না জানা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে এই উপন্যাসে।

'বাঁশের কেল্লা' উপন্যাসে যেমন কোনো কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই, তেমনি নেই কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র। কতকগুলি খণ্ডিত বা টুকরো ঘটনার সমাবেশ দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। ফলে নির্দিষ্ট চরিত্রের বিবর্তনও ধরা পড়েনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নীলবিদ্রোহের কাহিনীতে নীলকর সাহেবরা যেমন আছেন, তেমনি গ্রামবাসীদের কার্যকলাপ স্থান পেয়েছে।

গ্রামের একসময়ের পণ্ডিত পীতাম্বর বুড়ো বয়সে নীলকুঠিতে চাকরী পেয়েছিল। পীতাম্বর এর সঙ্গে নীলকর সাহেবদের একটা হৃদ্যতা ছিল। আসলে তখনকার নীলকর সাহেব টুইডি চাষীদের উপর জোর জুলুম করতেন না। চাষীদের দরদ বুঝতেন। গ্রামের চাষীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে যাত্রা শুনতেন। পীতাম্বর সহজ-সরল প্রকৃতির লোক হলেও মেয়ে দুর্গার বিয়ে দিতে শেষ বয়সে অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। তবে চরিত্রটির সক্রিয়তা কোথাও চোখে পড়েনি। এমনকি মেয়ের বিয়ে ভাঙার কারণ জানলেও প্রতিবাদ করেননি। নীরব দর্শকের মতো মুখ বুজে সহ্য সব সহ্য করেছে।

উত্তরপাড়ার কেশব, পড়াশুনায় ভালো না হলেও আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠেছে। দুর্গার প্রতিক্রিয়া–

> "লেখাপড়ার ব্যাপারে কেশব চিরদিনই নিচে। কতলোকে তাকে ঠাট্টা-তামাসা করেছে দুর্গার সঙ্গে তুলনা দিয়ে। আজকে কেশব তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। অনেক উপরে নাগালের বাইরে যাচ্ছে ক্রমশ। কথা বলে আজকাল উঁচু ঢঙে, যেন কত দূরের মানুষ!"[১]

কেশব ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও দুর্গাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এমনকি দুর্গাও হয়তো তাকে চাইত। কিন্তু জাতপাতের কারণে এবং পড়াশোনাতে ভালো নয় বলেই তাদের বিয়ে হয়নি। সেই কেশবই উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু ঔপন্যাসিক চরিত্র বিবর্তনের চেয়ে নীলবিদ্রোহকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই তা সম্ভব হয়নি। কেশব সেই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নীলকরদের হাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। তবে কেশবের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার চেয়ে দুর্গার বিয়ে ভাঙার কৃতিত্ব অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

নীলকর সাহেব টুইডির উত্তরসুরি হেলী সাহেব চাষীদের কষ্ট বোঝেনি। নীলকান্ত বাঙালী হলেও চাষীদের প্রতি অত্যাচার করেছে। চাষীদের প্রতি নীলকান্ত নির্মম হলেও দুর্গাকে বিয়ে করার ব্যাপারে চরিত্রটির মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভাব স্পষ্ট। পরে অবশ্য দুর্গার সেবায় মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু দুর্গা তাকে বাঁচতে দেয়নি। প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ থাকলেও তা সম্ভব হয়নি।

উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যে কিছুটা উজ্জ্বল দুর্গা চরিত্রটি। উপন্যাসের শুরু থেকে চরিত্রটির কোনো বিশেষত্ব লক্ষ্য করা না গেলেও শেষের দিকে তার কার্যকলাপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হেলী ও নীলকান্তকে সে তুলে দিয়েছে চাষীদের হাতে —

> "ঘরে এল দুর্গা। কুলুঙ্গির প্রদীপটা উঁচু করে ধরল সিঁড়ির দিকে। আলো পড়ে অপরূপ উজ্জ্বল্য ফুটেছে তার কালো মুখে। সিঁড়িতে অনেক লোক। এদের দেখিয়ে দেয়, এই সে সেবারের পালানো আসামী।"[২]

নীলকান্তকে বিয়ে করে সুখের জীবন খুঁজে নেয়নি দুর্গা। বরং কেশবদাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও কম করতে পেরেছে।

'বাঁশের কেল্লা' উপন্যাসে লেখক যে গ্রামের কথা বলেছেন, সে গ্রামে রামজয় ঠাকুর বাঁশের কেল্লা তৈরী করেছিলেন সত্য কিন্তু তা দিয়ে তিনি সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। তবে বাঁশের কেল্লাই যেন গণ প্রতিরোধের প্রতীক। উপন্যাসের শেষ অংশে লেখকের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নামকরণের ক্ষেত্রে –

> "ঘন গিরাওয়ালা বাঁশের লাঠি কেটেছে ওরা, বেতের ঢাল বানিয়েছে। যখন স্বাধীন দেশের সৈন্য নেওয়া হবে - ওদের পাড়ায় তখন লোক পাঠিও, সৈন্যদল আধাআধি তৈরী হয়ে আছে ওখানে ও পাড়ার শিশুরা সকালে নারিকেল - গামড়ার গরু বানিয়ে খেলা করত, এখন খেজুর ডালের গোড়া চেঁচে ছুলে নিয়ে বন্দুক বন্দুক খেলে। কি করে বলতে পারি না - জানাজানি হয়ে গেছে পৃথিবীর নানা দেশের অনেক গুহ্য খবর, প্রফুল্লরা কিছুতে যা ফাঁস করতে চায় না। নিজেদের আর অসহায় দুর্বল মনে করে না ওরা কেউ। ঐ যে শত শত বাঁশের ঘর, কঞ্চির বেড়া - বাঁশের কেল্লা ওগুলো, রামজয় ঠাকুরের একটার জায়গায় দেশব্যাপী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ।"[৩]

'বাঁশের কেল্লা' উপন্যাসে লেখকের ক্ষোভ এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। একদিন যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল, আত্মত্যাগ করেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের কথা সকলেই ভুলে গেছে। নিজের স্বার্থ চিন্তাতেই থেকেছে তাঁরা আত্মমগ্ন। স্বপ্নের স্বাধীনতা এলেও প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব মর্যাদা পায়নি। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষে যারা ইংরেজদের ভৃত্য বলে পরিচিত ছিল, তারাই পেয়েছে স্বদেশ প্রেমীর সম্মান। এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। বঞ্চিত মানুষেরা একদিন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে -

> "ওদের কাছে খবর পৌঁছবার উপায় কর নিশিকান্ত। প্রফুল্লদের সাধ্য নেই। কালোরা সাদার আসনে বসেছে, সেই আনন্দে মশগুল; হুকুম হাকাম চালাচ্ছে, যতদূর পারছে পকেট ভরে নিচ্ছে। এই অবধি পারে প্রফুল্লরা, ...ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির দুর্গে বসবাস করে নির্বিঘ্ন মনে করছে নিজেদের। স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না, চাষীপাড়ার ছেলেরা ইতিমধ্যে আর এক রকম হয়ে উঠেছে।"[৪]

এই নিম্ন সমাজের সন্তানদেরই লেখক বাঁশের কেল্লা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সারা উপন্যাসে এরা স্থান না পেলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এদের প্রতি বঞ্চনা লেখককে ব্যথিত করেছে। এরা যে জেগে উঠেছে লেখক তারই আভাস দিয়েছেন 'বাঁশের কেল্লা' নামকরণের মধ্য দিয়ে।

নবীন যাত্রা

শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মনোজ বসুর 'নবীন যাত্রা' (১৯৫০) উপন্যাসে। পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী -দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য তৈরী করে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষাধারার কোন যোগ নেই। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সফল করে তোলার জন্য দরকার শ্রেণীহীণ - শোষণহীন, শ্রমভিত্তিক আদর্শ - শিক্ষার পরিবেশ।

একদা এক গণ্ডগ্রামে কোম্পানীর আধিপত্য ছিল। সে সময় সেখানে নীলচাষ হতো। গ্রামের নাম তাঁতিহাট। এখানকার জমিদার নবকিশোর বিয়ের পর এই গ্রামে বসবাস করলেও কন্যা অমলার জন্মের পর তাঁরা কলকাতায় চলে যায়। নবকিশোরের স্ত্রীর নাম ইন্দ্রানী। ইন্দ্রানীর ছেলে মুকুল মারা যাওয়ার পর ইন্দ্রানী মেয়ে অমলা ও ছোট ছেলে মলয়কে নিয়ে ফিরে এসেছে গ্রামে। সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা দলের আগমন। লক্ষ্মণ যাত্রা দলে অভিনয় করে অমূল্য নামের একটি ছেলে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কুল পাড়তে গিয়ে সে ধরা পড়ে। অধিকারীর কাছে মার খেয়েছে। ঘটনাক্রমে সে ইন্দ্রানীর নজরে পড়ে। ইন্দ্রানী তাঁর হারানো ছেলে মুকুল-এর প্রতিরূপ দেখতে পায় অমূল্যের মধ্যে। যাত্রাদলের পিতৃমাতৃহীন এই অনাথ মূর্খ ছেলেটিকে শিক্ষিত ও মার্জিত করে গড়ে তোলার জন্য পাঠানো হয় প্রসন্ন পণ্ডিতের

পাঠশালায়। কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও তার লেখাপড়া হয় না। অমূল্যের পড়াশুনা সম্পর্কে রেগে গিয়ে পণ্ডিতমশায় বলেন —

> "ধকলটা কম নয়। এগারোদিন একাদিক্রমে অ-আ'র কসরৎ চলছে! মা-লক্ষ্মীর খেয়াল হয়েছে, ছাগল দিয়ে ক্ষেত চষবেন। তাই সই হুকুমের নফর - হালে জুতে দিয়ে হৈ হৈ করছি।"[১]

পড়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পালাতে গিয়ে সে হাজির হয় নির্মল হালদারের পাঠশালায়। নির্মল একসময় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানেই বোমা তৈরী করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। তার বাবার প্রতিপত্তির জন্য খালাস পায়। দেশ স্বাধীন হবার পর গ্রামে ফিরে পাঠশালা খুলেছে। সেখানে আছে খান চারেক চালাঘর। আছে হাতে কমলে শিক্ষার বন্দোবস্ত। চাষের যন্ত্রপাতি, তাঁত - চরকা, সূতোর ঘর ইত্যাদি। ছেলেদের শেখানো হয় স্বাস্থ্যবিধি, মৌচাক ভাঙার পদ্ধতি, তাঁত বোনা, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, লোহার কাজ। কিছু কাজ বাকিও আছে। ভদ্র পাড়ায় যারা বাতিল, যাদের ঠাট্টা করে বলা হয় ভূত-প্রেত তারাই তাঁর শিষ্য। গ্রামের নিচু সমাজের এমনই কিছু ছেলেকে সেখানে জুটিয়ে কাজের ফাঁকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী নির্মল দেশের নানা সমস্যা নিয়ে ভাবে। পাঠশালায় আসা ছেলেদের উপার্জনের ব্যবস্থাও করেছে। গ্রামের সকলে তাকে জানে অল্পশিক্ষিত ইংরেজী না জানা পণ্ডিত বলে। পাঠশালার ছেলেদের পড়াশুনার ব্যাপারে তার জোর জুলুম নেই। গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখানো হয়। অমূল্যের দুষ্টুমি সম্পর্কে নির্মল বলেন —

> "বিদ্যাসাগর আকাশ থেকে পড়েননি। একদিন তিনিও এমনি গাঁয়ের পাঠশালার দুষ্টু ছেলে ছিলেন। সবাই তোমরা বিদ্যাসাগর হতে পারো — সেই ভরসায় তো আছি তোমাদের সঙ্গে।"[২]

নির্মলের পাঠশালার প্রতি আকৃষ্ট হয় অমূল্য।

নির্মলের সঙ্গে কথা বলার পর ইন্দ্রানী গ্রামে স্কুল খুলতে চায়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় পণ্ডিতের নিয়োগের জন্য। স্কুলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হন ইন্দ্রানীর এক সময়ের বান্ধবী হাসি গাঙ্গুলী। বিদেশী কায়দায় শিক্ষিত হাসি গ্রামে আসে। নির্মলকে স্কুলে পড়ানোর কথা বললেও সে প্রত্যাখ্যান করে। শুরু হয় নির্মলের সঙ্গে ইন্দ্রানীর বিরোধ। ইন্দ্রানী অনেক চেষ্টা করলেও বুঝেছে গ্রামের পরিবেশে শহুরে শিক্ষাব্যবস্থা অচল। ইস্কুলের ভাবনা তুলে দিতে

হয়। ইতিমধ্যে ইন্দ্রানী জানতে পারে নির্মল শহরে ড. দত্তের দেওয়া বড় চাকরি পেয়েছে। তাঁর প্রকৃত পরিচয়ও জানাতে পারেন। কিন্তু নির্মল সেই চাকরী প্রত্যাখ্যান করে। গ্রামে থেকে সকলের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করতে সে উৎসাহী। ঠিক সেই সময় হঠাৎ গোলা-বাড়ির পাঠশালায় আগুন লাগে। অসুস্থ প্রসন্ন পণ্ডিতকে ভেতর থেকে বের করতে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমূল্য। পণ্ডিত সুস্থ হলেও অমূল্যকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়নি। অমূল্যের আত্মত্যাগ ও নির্মলের ত্যাগ স্বীকারে অভিভূত হয়েছে ইন্দ্রানী। নির্মলের স্বপ্নকে সার্থক করতে বদ্ধ পরিকর ইন্দ্রানী কলকাতা ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে গ্রামে থাকার প্রতিজ্ঞা করলেন।

স্বাধীন ভারতে নির্মল হালদারের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থাই ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর স্বপ্নের শিক্ষাব্যবস্থা। তাঁর সহানুভূতি নির্মলের দিকে। সে এক সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী। জেলে খেটেছে। পিতার মৃত্যুর পর সহায়সম্বলহীন হয়ে তাঁতিহাট গ্রামে এসে গড়ে তুলেছে পাঠশালা। তার পড়াশুনা নিয়ে গ্রামের লোক সন্দিহান। নির্মলের নামে ইংরেজিতে লেখা টেলিগ্রাম এসেছে। গ্রামের বাসিন্দা ভীম তা অমলকে পড়ে দিতে বলে –

> "দেও ওনারে, দেবা না তো কি ? ইংরাজিতি তার আয়েছে - মাস্টের ইংরেজির কিছু বোঝবেনে ? আবার দৌড়তি হবেনে ইদিক পানে পড়ায়ে নিবার জন্য। তার চায়ে উনি পড়ে দেন, সেই কথাগুলো যায়ে মাস্টেররে কবানে। ... ভাল-মন্দ কি হল, কেডা কবে ? বুকির মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তিছে। পড়ে দেখদিনি দিদি –"।[৩]

কিন্তু ওই টেলিগ্রাম আসার পর জানা যায় নির্মল উচ্চশিক্ষিত। আমেরিকান জার্নাল অব বটানি, কারেন্ট সায়ান্স, ইন্ডিয়ান ফার্মিং -এসব কাগজে তাঁর লেখা বেরিয়েছে।

এহেন পণ্ডিত নির্মলের কর্মপন্থা এবং তাঁর বক্তব্যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়ে। নির্মল চাকরী ছেড়েছে। ইন্দ্রানীর মতে ঐ চাকরীতে সম্ভাবনা ছিল, দেশের মানুষ উপকৃত হত। কিন্তু নির্মল ভেবেছে তাঁতিহাটের দুঃখি মানুষজনের কথা। নির্মল বলে –

> "দেশ স্বাধীন হয়েছে – খবরের কাগজে লিখছে বটে! স্বাধীনতা তাঁতি হাটে অবধি পৌঁছয়নি। নতুন আশা - উদ্দীপনার পরিচয় দেখেছেন কোথাও ? ঐ দুর্লভ বস্তুর ভাগ আমার গ্রাম পাবে না - এটা কেমন করে সহ্য করি ? ইস্কুল চালানো মানে স্বাধীনতা পৌঁছে দেবার চেষ্টা গ্রামের মানুষের মধ্যে। আমার সেই চিরকালের কাজ।"[৪]

নির্মল হালদার প্রয়োজনে কৃচ্ছ্রসাধনা ও কঠিন আত্মত্যাগ করেছে। বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সে কঠিন অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং সাধনার দ্বারা বাস্তবায়িত করেছে কুঠির ইস্কুলে। গ্রামবাংলার মুক্ত পরিবেশে শিশুমনের মুক্তির মধ্যদিয়ে তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিস্ফূটন ঘটাতে চেয়েছে। পাঠশালার ছাত্রদের অবাধ্যতায় তিনি হতাশ নন। বরং তিনি মনে করেন এদের মধ্যেই প্রকাশিত হবে ভবিষ্যতের বিদ্যাসাগরের গুণাবলী। অমলাকে সে বলে –

> "তখন ইংরেজ-রাজত্ব ছিল। সংগ্রাম করতে হয়েছে পরাধীনতার মোচনের জন্য। শৃঙ্খলা ভাঙতে শেখানো হয়েছে সকলকে। শিখেছেও সকলে তাই। এখন উল্টো কথা বলছি, ভেঙো না – গড়ে তোলো এবার ভাই। অনভ্যাস - সে আর কারও মনে ধরে না।"[৫]

গড়ে তোলাই হলো তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মূল সুর। নির্মলের বিদ্যালয় একদিন দেশের লোককে পথ দেখাবে এই বিশ্বাস নির্মলের যেমন আছে ঔপন্যাসিকেরও তেমনি আছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অমূল্য। ছোট থেকেই সে অনাথ এবং অশিক্ষিত। সামান্য পেটভাতের বদলে সে লক্ষ্মণের যাত্রাদলের কাছ থেকে পায় নিষ্ঠুর শাসন তার অবহেলা। পরিবেশই তাকে খারাপ করে। শিক্ষাবিদ জ্যাঁ জাকুস রুশো বলেন –

> "Everything is good as it comes from the hands of the auther of nature, but everything degenerates in the Lands of man."[৬]

অমূল্যের ক্ষেত্রে অন্তত এই কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইন্দ্রানী তাকে সন্তানের মত স্নেহ করলেও নির্মল মাষ্টারের হাতেই ঘটল তার আমূল পরিবর্তন। অমূল্যের প্রতি ইন্দ্রানীর স্নেহ ছিল ধনীলোকের সৌখিন বিলাসিতা। হৃদয়ের ছোঁয়া ছিল না বলেই ইন্দ্রানীর আদেশ নির্দেশকে উপেক্ষা করে মজা পেত। লুকিয়ে লুকিয়ে সে তামাক খেত; সুযোগ পেলে সিঁদ কাটত। অথচ এই অমূল্যই নির্মলের সান্নিধ্যে বদলে গেল। ইন্দ্রানীর বাড়িতে আগত অশোক এবং ইন্দ্রানীর বিস্ময়ের জবাবে নির্মল তার শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা করে বলেন –

> "পড়াই না তো! নানা খেলার মধ্যে ওরা পড়া-পড়া খেলা করে কখনো কখনো।"[৭]

এও জানায়-শিক্ষক বেত হাতে করে থাকেন না, তাদের কর্মের সঙ্গী তিনি, আনন্দের অংশিদার। শিক্ষার এই অভিনব পরিবেশে অমূল্যের নবজন্ম হয়েছে। অমূল্য ইন্দ্রানীর কাছে অবিশ্বাসের পাত্র হলেও নির্মলের পরম আস্থাভাজন। নির্ভয়ে সে অমূল্যের হাতে তুলে দিয়েছে

বাক্সের চাবি। নির্মলের কুঠির ইস্কুলে অমূল্যের ঘটেছে মনুষ্যত্বের বিকাশ। মলয় পরীক্ষায় চুরি করে ধরা পড়ার উপক্রম হলে সে নিজের ইচ্ছায় মলয়ের কুকীর্তির দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। বসন্ত রোগে আক্রান্ত পণ্ডিত প্রসন্নের সেবা, ইন্দ্রানীর প্রতি মমত্ববোধ, আগুনের মধ্য থেকে পণ্ডিত প্রসন্নকে উদ্ধারের মতো ঘটনা অমূল্যের মহত্ত্বের পরিচায়ক। তাইতো আবেগ উচ্ছ্বসিত স্বরে নির্মল অমূল্যের প্রশংসা করে বলেছেন –

> "আমার পাঠশালা থেকে বিদ্যাসাগর উদয় হবেন, বলেছিলাম - তুই হলি সে-ই - আমার মিথ্যেবাদী বিদ্যাসাগর। তোর নির্মলদার বুক গৌরবে আজ ফুলে উঠেছে।"[৮]

ইন্দ্রানী চরিত্রের মধ্যে সুপ্ত মাতৃত্ববোধ উপন্যাসের শুরু থেকেই লক্ষ্য করি। তার হারানো ছেলের স্মৃতি তাঁকে চালিত করেছে। যদিও চরিত্রের পূর্ব পরিচিতি উপন্যাসে ধরা পড়েনি তবুও অমূল্যকে দেখার পর মাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়েছে। কখনো কখনো বড় লোকের খামখেয়ালি বলেও মনে হয়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে ইন্দ্রানী চরিত্রেরও পরিবর্তন অনেকটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়, অপর দুই পার্শ্বচরিত্র অমলা এবং ইন্দ্রানীর বাড়িতে আগত আত্মীয় পুত্র অশোকের সম্পর্ক কেমন তা উপন্যাসে সঠিকভাবে ধরা পড়েনি। অশোকের সঙ্গে অমলার রোমান্টিক সম্পর্কের আভাস উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখা গেলেও পরে বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। এমনকি শেষের দিকে অমলদার সঙ্গে নির্মলের কথোপকথন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। –

> "আপনার পথ আপনি দেখুন। নিজে গুণে মনোনীত হয়েছেন। অশোকদা কে আপনার যে তাঁর খাতিরে ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন ? এত শক্তির অপচয় করেছেন গেঁয়ো-পাঠশালায় – শালগ্রাম-শিলায় বাটনা বাটছেন! কে বোঝে এখানে আপনার মর্যাদা ? পাগল আপনি - কাণ্ডজ্ঞানহীন!
>
> বলতে বলতে হঠাৎ বুঝি খেয়াল হল, কিসের জোরে কাকে সে বলছে এত কথা! লজ্জিত হয়ে সে চুপ করল।
>
> নির্মল কেমন আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে আছে অমলার দিকে। গভীরকণ্ঠে সে বলল, ঠিক এমনি কথা আমার মা-বাবা বলতেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার জন সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এতকাল পরে আজকে আবার আপনার মুখে এই সব শুনলাম।
>
> অমলা বিচলিত হয়ে উঠল। বলে, শুনবেন তা হলে তো আমার কথা।
>
> নির্মল সহাস্যে ঘাড় নাড়ল।"[৯]

উপন্যাসের শেষে অগ্নিসংযোগের ঘটনা আবেগ দ্বারা পরিচালিত। ভবতারণ কেন নির্মলের স্কুলে আগুন লাগালো তা বোঝা যায় না। তবে করুণ রসাত্মক পরিণতির জন্য অগ্নিসংযোগ তাৎপর্যবাহী।

উপন্যাসের শুরু যাত্রা দলের মানুষজনদের নিয়ে। যাত্রাদলের অন্যতম সদস্য অমূল্য। লক্ষ্মণের যাত্রাদল থেকে বিতাড়িত হয়ে অমূল্য স্বপ্ন দেখেছিল যাত্রার দল গড়ার। ইন্দ্রানীর টাকা চুরি করে স্বপ্নকে সার্থক করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ইন্দ্রানীর বাড়ি থেকে পালাতে গিয়ে নির্মলের হাতে পড়ে। নির্মলের হাতে অমূল্য পরিবর্তিত হয়। অমূল্যের স্বপ্ন বৃহত্তর স্বপ্নে রূপায়িত হয়। অমূল্য তার নতুন যাত্রা দলের নাম রাখতে চায় নবীন যাত্রা। যাত্রাদলের বিতাড়িত হরিপদ বোঝে অধিকারীর নাম নবীন। উত্তরে অমূল্য হরিপদকে বলে –

> "মাটির মানুষ। কিছু বলেন না - কোন ঝামেলা নেই। নাম হল নির্মল। অধিকারীর নামে দল নয়। এতকাল পার্ট করছ নবীনের মানে জান না।"[১০]

এও এক যাত্রা। গরীব অসহায় মানুষদের উন্নত সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার যাত্রা। যে দলে অধিকারী নির্মল। সর্বস্ব ত্যাগ করে সমাজ পরিবর্তনই যার একমাত্র লক্ষ্য। যার মধ্যে নেই কোন মালিন্য বা কলুষতা। নির্মলের এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গী হয়েছেন জমিদার বাড়ির লোকেরাও। সেই দিক থেকে উপন্যাসে নামকরণ 'নবীন যাত্রা' সার্থক ও ইঙ্গিতগর্ভ হয়েছে।

জলজঙ্গল

বাদা অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে রচিত ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর বিখ্যাত রচনা 'জলজঙ্গল' (১৯৫১)। সুন্দরবনের বাদার অদিবাসীদের বিচিত্র জীবনরীতি, জীবিকা, গোষ্ঠীগত বিশ্বাস, প্রথাবদ্ধ জীবন, সংস্কার ও আচার-আচরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

বাদাবন প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি। যা শহর সভ্যতা থেকে বহু দূরে। এরা জল ও জঙ্গলের নিকটবর্তী। এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে যে প্রকৃতির মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা রূপায়িত হয়েছে, তা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ:

> "শিশুরা শুনতে চাইত বাঘের গল্প। ভাল করে যদি বলতে পারি, বয়স্ক-শিশুরাই বা কেন সে জিনিস পছন্দ করবেন না ? গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয় (এখন পাকিস্তানে চলে গেছে)। কাঠ কাটতে মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায় বাঘ-কুমির-সাপের কবলে পড়ে। তার মধ্যে কত জনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি ও বাঘের সওয়ার গাজি-কালুর রাজ্যে রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমায় আকর্ষণ করত। সুন্দরবনে বেশিরভাগ এখন পাকিস্থানে। দেশবিভাগের আগে সমগ্র সুন্দরবন আমি ঘুরেছি। পরে ভারতীয় অংশের সুন্দরবনেও গেছি কয়েকবার। ঠিক বাঘের গল্প নয় - কিন্তু রয়াল বেঙ্গল টাইগারের আস্থানা সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস (জলজঙ্গল, বন কেটে বসত) ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতরে খালের উপর নৌকায় বসে লেখা।"[১]

বাদাবনের অচেনা অজানা মানুষগুলো অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরা। তাদেরই জীবন ও জীবিকার সমস্যা উজ্জ্বল হয়েছে দু-একটি রেখার টানে।

সুন্দরবনের ঘেরাটোপে গড়ে উঠেছে 'জলজঙ্গল'। বন কেটে সেই জমিতে বাসভূমি গড়ে উঠেছে। জল আর জঙ্গলকে আশ্রয় করে এদের শুরু হয়েছে বেঁচে থাকার লড়াই। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ করা এদের জীবিকা। প্রতিনিয়ত প্রকৃতির ভয়াবহতার কাছে মার খাওয়া এই মানুষগুলি আশ্রয় খোঁজে বিভিন্ন লৌকিক দেবতা বা অপদেবতার কাছে। এখানেও রয়েছে শ্রেণীবৈষম্য। কেউ জমির মালিক, ভেড়ির মালিক আর অসংখ্য জন দিন আনি দিন খাই। দিন আনি দিন খাই এর প্রতিনিধি মতিরাম সাধুও তাঁর মেয়ে এলোকেশী। তবে এলোকেশী বাদাবনের অরণ্যের মতই রহস্যময়ী নারী। বনসংস্কার ও প্রজাস্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে কলকাতা থেকে বাদাবনে এসেছে মধুসূদন রায়। একের পর এক আবাদ গড়ে তুলেছেন বন ধ্বংস করে। বসাচ্ছেন নতুন নতুন হাট। এই কাজে অংশীদার মধুসূদনের ম্যানেজার দুর্লভ হালদার। জাঁকজমক করে বনবিবির পূজা হয়। চলে কুস্তি, মল্লযুদ্ধ। বাদাবনের শক্তিমান মল্লযোদ্ধা হল কেতুচরণ। কেতুচরণ ও এলোকেশী বাদাবনের তেজী যুবক-যুবতী। কুস্তির লড়াইয়ে জেতার পর কেতুকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় এলোকেশী। অরণ্যের সার্বিক সৌন্দর্যে তৈরী অরণ্যবালা এলোকেশীর কাঁটায় নাক-মুখ ছিঁড়ে গেলেও কেতুকে দেখে গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে। দুঃসাহসী এলোকেশী হঠাৎ —

> "কেতুর দু-চেয়াল সজোরে চেপে ধরে টেনে নিয়ে এলো একেবারে নিজের মুখের কাছে। দেখতে পাচ্ছ না — কানা নাকি তুমি ? দু-হাতের বজ্র আঁটুনি সাঁড়াশির

মতো চেপে ধরেছে। ... দেখবে কি কেতুচরণ — সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দুঃসাহসী মেয়েটার রকম-সকম দেখে। একবার মনে হল, বাঘিনী ধরেছে তাকে। হিংস্র বটে, কিন্তু অতি মনোরম বাঘিনী।"[২]

কেতুর মুখে এঁকে দিল ভালবাসার আল্পনা। এদিকে এলোকেশীর বাবা মতিরাম সাধু মেয়েকে চোখে-চোখে রাখে। মেয়ে কখন কি সর্বনাশ করে বসে, এই তার ভয়। সর্বনাশ আরও একদিক থেকে হতে পারে। বাঘ-কুমির-সাপ, ভয়ঙ্কর সব জন্তু যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। শুধু মানুষের সঙ্গে নয়, এইসব ভয়ঙ্কর জন্তুদের সঙ্গেও দিনরাত লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। এলোকেশীকে ভালবাসে কেতুচরণ। মতিরাম সাধুর ডেরা তুলে নিয়ে গিয়ে শান্তিনগরে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে মতিরাম শহুরে বাবু মধুসূদনের হাতেই মেয়েকে তুলে দিতে চায়। মধুসূদনের সাক্ষীর জোরেই পুলিশের হাতে পড়েও রক্ষা পেয়ে যায় মতিরাম। মতিরাম আগেই নিজের জীবিকা সম্পর্কে কেতুকে বলেছিল –

"নিদালি পড়ে আমি মানুষজন ঘুম পাড়াই। চুরি-চামারি আমার পেশা – তাই শুনেছিস ?"[৩]

কেতুচরণ আর এলোকেশীর প্রেমের মাঝে এসে দাঁড়াল দুর্লভ হালদার। এলোকেশী কেতুচরণকে প্রলুব্ধ করে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে কেতুচরণ এলোকেশীকে বাড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করে। দুজন নৌকায় পাড়ি জমানোর পর এলোকেশী কেতুচরণকে ফাঁকি দিয়ে সঙ্গ নেয় দুর্লভ হালদারের। নীড় হারানো পাখির মত হাহাকার জোটে কেতুচরণের ভাগ্যে।

কেতুচরণ আর বিয়ে করেনি। নৌকা বাওয়ার কাজ করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছে। ছন্নছাড়া, স্নেহ-প্রেমহীন জীবনে বাদাবনের মানুষ কেতুচরণ, উমেশ, গোলপাঁচু, গুলিপাঁচুরা কিছুই পায়নি। অরণ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের জীবন হয়েছে বনের বাঘের মত - শয়তানি, শঠতা ও হিংস্রতায় নির্মম। এরই মধ্যে একদিন কেতুচরণ এলোকেশীর সন্ধান পায়। এলোকেশীর স্বামী দুর্লভ এখন বড়ো অফিসের ঘেরিবাবু হলেও এলোকেশীকে মারধোর করে সে পায় যৌনানন্দ। তাই অনেকদিন পর কেতুকে দেখে এলোকেশী যেন হারানো যৌবন ফিরে পায়। সাজগোজ করে, রঙিন শাড়ি পরে। দুর্লভ লম্পট হলেও সে এলোকেশীর স্বামী। কিন্তু স্বামী হলে কি হবে, এলোকেশী যে কেতুর গলায় প্রেমের ফাঁস পরিয়েছে। টপ্পার সুরে গীত হয় —

"পরালি প্রেমের ফাঁসি, সর্বনাশী,
বারে বারে ঘুরে ফিরে তাই তো তোরে
দেখতে আসি —"[৪]

কেতুচরণের কাছে ধরা না দিয়ে খাঁচা ভেঙে উড়ে গিয়ে তীর বেঁধা পাখির মতো এলোকেশী আর্তস্বরে মধুসূদন রায়কে বলেছে –

"দেখবেন ? এই-এই দেখুন না, গলায় পিঠে বুকে রাঙা - রাঙা কত সব গয়না –"[৫]

মধুসূদন রায়ের কামুক স্বভাবের আসল পরিচয় না জেনেই সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। মধুসূদন রায় তার দেওয়া গয়নার শোভার অলংকৃতা নারীতে দেখতে চায়। জল-জঙ্গলের মতই আদিম যৌবন উচ্ছলা নারী এলোকেশী লোভী নিষ্ঠুর বাবাকেও সম্মান জানাতে পারে না। পরে কেতুর নৌকায় করে এলোকেশী ফিরেছে দুর্লভ হালদারের বাসায়।

দুর্লভ হালদারের পূর্ব শ্বশুর বাড়ি ঝাঁপায়। স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাওয়ার পর সন্তান জ্যোৎস্না-ভূষণকে দেখাভাল করার দায়িত্ব দিয়েছে এলোকেশীকে। এই সময় বাদাবনে দেখা দেয় জলকষ্ট। দুর্লভ ও হরিপদ বাসায় কেউ নেই। এলোকেশীর পা মচকে গেছে। কেতুচরণ অন্ধকারে রান্না ঘর থেকে তেল এনে মন্ত্র পড়ে এলোকেশীর পা ঠিক করে দিল। এলোকেশীর মনে হল –

"এক দৈত্য পায়ের ঐখানটা মুচড়ে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে দেহ থেকে।"[৬]

চোখে জল আসে। তারই মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্নের ঘোরে এলোকেশী দেখল —

> "কঠিন ক্রুর হাসি কেতুচরণের মুখে। বিড়-বিড় করে সে মন্ত্র পড়ছে, আর জানুদেশ অবধি টেনে নিচ্ছে। আর তাকাচ্ছে এলোকেশির দিকে খরদৃষ্টিতে। দৃষ্টি যেন চুম্বক। সবল বাহুর চাপে গায়ের কোমল মাংস কাদার মতো কেতুচরণ ছানছে। শুধু মাংসই বা কেন, যেন তার বুদ্ধি-বিবেচনা অপছন্দ নিয়ে ডেলা পাকাচ্ছে।"[৭]

অবশেষে এলোকেশীর চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সবল হাতের পীড়ন আরও কামনা করে মনে মনে। এরই মধ্যে দুর্লভরা ফিরে আসে। কেতুচরণ গা ঢাকা দেয়। এই ঘটনার পরেই এলোকেশী ঘর ছাড়ে। মধু রায়ের আশ্রয়ে থাকে। দুর্লভ এলোকেশীর খোঁজ পায় না। এরই মধ্যে নৌকাডুবির কবলে পড়ে দুর্লভ তার সন্তানকে তুলে দেয় কেতুচরণ-এর হাতে। পরে

দুর্লভ বেঁচে গেলেও হরিপদের খোঁজ পাওয়া যায় না। দুর্লভ সুস্থ হয়ে কেতুর কাছে এসেছে সন্তানকে নিয়ে যেতে। টাকার দর কষাকষি শুরু হয়। এরই মধ্যে কেতুচরণের সঙ্গে এলোকেশীর দেখা হয়। সে কেতুচরণের সঙ্গে পালাতে চায়। অন্যদিকে কেতুচরণ ও তার সঙ্গীরা প্রাপ্তির (সন্তান) আনন্দে বিভোর। হারানোর ভয়ে তারা বিচলিত। তাই, দুর্লভ ছেলে নিতে এলে কেতুচরণ নানা অছিলা করে ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে এলোকেশীর প্রেম ছিন্ন করে, সন্তানের স্বত্বাধিকারী দুর্লভকে চিরতরে সরিয়ে দিয়ে কেতুচরণেরা এক শান্তিপূর্ণ অজানা গৃহ জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

'জলজঙ্গল' উপন্যাসে বাদাবনের অধিবাসীদের চরিত্রধর্মে রয়েছে প্রকৃতির স্পর্শ। লোকালয় গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে মধুসূদন বাদাবনের প্রেমে পড়েছে। বিষয়ী মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে সর্বত্যাগীতে। যে অরণ্যের দিকে তাঁর ধ্বংসের হাত প্রসারিত ছিল, তাই হয়েছে তাঁর শেষ আশ্রয়। এলোকেশী, মধুসূদন, কেতুচরণ এই উপন্যাসের অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র। এই তিনটি চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেতুচরণ একেবারেই বাদাবনের মানুষ। জল ও জঙ্গলে সে স্বস্তি বোধ করে। এবং বাদার বাইরে মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়লে সে অস্বস্তি বোধ করে। কখনো ভীষণ উদ্ধত, কাউকে মানে না, আবার বেকায়দায় পড়লে পালিয়ে বাঁচে। এর হৃদয়হীনতার অন্তরালেই রয়েছে একটা নরম হৃদয়। সে দুর্লভ হালদারের সন্তানকে আটকে রেখেছে একশো টাকা পাবার আশায়। অথচ রাতের অন্ধকারে শিশুটির জন্য দুধ চুরি করে বেড়ায় অন্যের গোয়ালে। যে কেতুচরণ কোনোদিন ফুলের দিকে চেয়ে দেখেনি, সেই কেওড়া ফুলের গাছের মাথায় উঠে কোঁচড় ভরে ফুল তুলেছে বাচ্চাটিকে দেবার জন্য। কেতুচরণ শারীরিক ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতায় নারীর মন জয় করলেও সংসার করা তার হয়ে ওঠেনি। অরণ্যের মতই তার কোন বন্ধন হয়তো সহ্য হয় না। নোনা জলে দুর্গম নৌকা বেয়ে, সাঁতার কেটে এবং নগরমানবের পরিত্যক্ত পুত্রকে অরণ্যমানবের নিষ্পাপ ভালোবাসার মমত্বে জড়িয়ে কেতুচরণ অনন্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শেষে তাই বুনো কেতুচরণ উন্নীত হয় এক অপূর্ব মানবিকতার শিখরে। এই উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে ড .শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন —

> "মধুসূদন অরণ্যরাজ্যের মানব-প্রতিযোগীরূপে প্রকাশিত - তাহার মধ্যে এক প্রকারের স্বভাব-মহিমা, দৃপ্ত মর্যাদাবোধ ও দুর্জ্ঞেয় অন্তঃপ্রকৃতির দুর্ণিবার আকর্ষণ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত সংকল্পের পরিণতি, তাহার কল্প-সৌধের ভূমি-

> সমাধি তাহাকে ট্রাজিক চরিত্রের গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। এলোকেশী একটি অসাধারণ স্ত্রী-চরিত্র। সে কেতুচরণকে প্রলুব্ধ করিযা তাহার সহায়তায় দুর্লভের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু দুর্লভের ইতর চরিত্র ও অশালীন আচরণের মধ্যে তাহার প্রেমকামনা তৃপ্তি লাভ করে নাই। সে উচ্চতর অভিজাত সমাজে তাহার মোহজাল বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের দৃঢ় প্রত্যাখানে তাহার সে স্বপ্ন টুটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে কেতুচরণকেই আশ্রয় করিতে অভিলাষী হইয়াছে। কিন্তু কেতুচরণের অপ্রত্যাশিত কূটবুদ্ধি ও মোহভঙ্গ তাহাকে আবার দুর্লভের আশ্রিতা হইতে বাধ্য করিয়াছে। এই প্রত্যাবর্তনের মধ্যে একটা কাব্যোচিত ন্যায়বিচার আভাসিত হইয়াছে, বিবেকহীনা, স্বার্থবুদ্ধি-কলুষিতা স্বৈরিণীর যোগ্য দণ্ড মিলিয়াছে।”[৮]

‘জলজঙ্গল’ উপন্যাসের নায়ক কেতুচরণ। শক্তিতে, দুঃসাহসে, প্রেমে, দয়ায়, হিংস্রতায়, নিষ্ঠুরতায় সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিজ। বাদাবনের ডোরাকাটা বাঘ কেতুচরণ। গোটা অরণ্যভূমিই যেন একটা চরিত্র। Envoy পত্রিকায় এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখা হয় —

> “The Jungle, which like a mistress enjoys its inhabitants' love and hate at the same time, is the real hero and the real villain of the story.”[৯]

‘Readers Magazine’-এ সমালোচনা করা হয় এইভাবে —

> “These people have their own codes, jungle laws, and yet a surprisingly sophisticated emotional life.”[১০]

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে উমেশ, গোলপাঁচু, গুলিপাঁচুরা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। গৃহজীবনের জন্য ক্ষুধিত মানুষগুলি মাংসের দলা (জ্যোৎস্নাভূষণ) কাছে পেয়ে স্নেহ-মমতার তারা লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বাদাবনের বাঘদের স্বভাব ধীরে ধীরে নম্র হয়ে আসে। মরুভূমির মত শুষ্ক জীবনে ছেলেটি মরুদ্যানের মত, তাদের জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও সম্বল। জ্যোৎস্নাভূষণও প্রকৃতির এই অর্ধসভ্য সন্তানদের কাছে পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে, তাদের অকৃপণ স্নেহ আর আদর পেয়ে ভুলে গেছে কান্না। বহু ছোট ছোট চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক মনোজ বসু আরণ্যক মানুষদের জীবনযুদ্ধকে তুলে ধরেছেন। পদে পদে বিপদ, খল লোকের শোষণ চরিত্রহীনতার কবলে অসুরক্ষিত নারীকূল, চরম দারিদ্র্য, অজস্র কুসংস্কার, প্রাকৃতিক জটিলতা – এসব বাদাবনের জীবনে নৈমিত্তিক, তবু এখানে জীবন চলমান, বড়

রহস্যঘেরা সেই জীবন। এছাড়া দুকড়ি, হরিপদ, মতিরাম, দুর্লভ চরিত্রগুলি উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাস নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে ঘিরে নির্মিত হলেও আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। এখানে যে সব মানুষ এসেছে চরিত্র হিসেবে তাদের মুখের ভাষায়, জীবন-লগ্নতায় সেই বিশিষ্ট আঞ্চলিকতার ছাপ নেই। কোনো কোনো আঞ্চলিক শব্দ (যেমন বাওড়, পরালি, কশাড়, তেরছা, বৈজুত) ব্যবহৃত হলেও বাক্যগুলি আদর্শ কলকাতা কেন্দ্রিক কথ্য বাংলার আদলেই তৈরি করেছেন লেখক। চরিত্রগুলির জীবন সমস্যা অর্থনীতির সমস্যা এলাকা ভিত্তিক নয় যেন, বৃহৎ বাংলার জীবন প্রেক্ষিত এইসব নরনারীর ছবি বাস্তব এবং জীবন্ত। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের সীমায় আর যেন আবদ্ধ থাকে না। সম্ভবত লেখকের উদ্দেশ্যও তা নয়।

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের মানুষেরা মধু সংগ্রহ করে, মাছ ধরে এবং নৌকা বায়। বাদাবনের ক্ষুধার্ত মানুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন লড়াই করে জীবন-যাপন করে। গড়ে তোলে সাধের আবাদ। শহুরে সভ্যতায় বসবাসকারী মানুষেরা অর্থের প্রয়োজনে সভ্য সমাজ ত্যাগ করে চলে আসে বাদাবনে। এই বাদাবনের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার দলিল 'জলজঙ্গল' উপন্যাস। জলে-জঙ্গলে বাস করে এলোকেশী, কেতুচরণ, মধুসূদন, দুর্লভ – এরা কীভাবে সংগ্রাম করে তারই রচনা সম্ভার বলে উপন্যাসের নামকরণ সার্থক ও যথাযথ।

বকুল

'বকুল' (১৩৫৯) উপন্যাসটি পারিবারিক জীবনের রোমান্টিক কাহিনী। এই উপন্যাসে মনোজ বসু অব্যক্ত মাতৃহৃদয়ের মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন। কুমারী মায়ের মাতৃত্বের হৃদয়গ্রাহী চিত্র 'বকুল' উপন্যাসে শাশ্বত নারীধর্মের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

'বকুল' (১৯৪৪) নামে নজরুল ইসলামের একটি উপন্যাস রয়েছে। যেখানে সমাজের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে এক আই.পি.এস. অফিসারের (বকুল) সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। কিন্তু মনোজ বসু তাঁর 'বকুল' উপন্যাসে নারীর মাতৃত্বকে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ মনোজ বসুর বকুল পুরুষ নয় নারী। অমরেশের প্রথম স্ত্রী রেবা পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেই মারা

যান। এই ছেলের নাম বকুল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অমরেশ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ছেলের দেখাশোনা করতে গিয়ে তার চাকরি গিয়েছে। তিনমাসের বাড়ি ভাড়া বাকি। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়তে বলেছে। ডাক্তারের ফিস বাকি। জিনিসপত্র বাড়িওয়ালার দখলে রেখে বাড়ি ছাড়তে সে বাধ্য হল। অমরেশ ছেলেকে নিয়ে বেরোতে গেলে অপর ভাড়াটিয়া জনার্দনের কুমারী কন্যা মনোরমা (ধাত্রী) পথ আটকাল। বলল —

> "আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে যান, যা ইচ্ছে করুন গে। কোনো কথা বলতে যাব না। তুমি যে বলছ বাবা কষ্ট হয় নি ছেলে ধরতে? দিয়েছেন উনি তার দরুণ একটা পয়সা? এখন সবসুদ্ধ সরে পড়ার তালে আছেন।"[১]

তার পাওনা গণ্ডা না শোধ করলে সে ছেলেকে নিয়ে যেতে দেবে না। ধাত্রী মনোরমার বেতন না দিয়ে বকুলকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। অগত্যা মনোরমার হাতে ছেলেকে তুলে দিয়ে অমরেশ এক বন্ধুর মেসে গিয়ে ওঠে। একদিন দুপুর বেলা ইস্কুল মাষ্টারের চাকরি খোঁজ করে ফেরার পথে দেখা হয় এক সময়ের সহপাঠিনী জয়ন্তীর সঙ্গে। অমরেশকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়।

> "জয়ন্তীকে জানে অমরেশ। জানে প্রতিবাদ নিস্ফল। কোলাহল জমিয়ে লোকের নজরে পড়া শুধু।"[২]

শহরের সীমা পার হয়ে গাড়ি পৌঁচেছে গ্রামাঞ্চলে। পথে অবশ্য অমরেশের জন্য ভাল জামা - কাপড় কিনে পরিয়ে দিয়েছে জয়ন্তী। রাত্রিবেলায় গাড়ি এসে থেমেছে জয়ন্তীদের কাছারি বাড়িতে। সেখানে হিসাবপত্র দেখেছে। পরে গেছে কাছারির দেখাশোনা করার দায়িত্বে থাকা মামা আশুতোষের বাড়িতে। মুকুন্দ নামে এক আমিন জয়ন্তীর কাছে চিঠি দিয়ে তার মামার নামে নালিশ করেছে। জানিয়েছে এস্টেটের টাকার আত্মসাৎ-এর কথা। জয়ন্তীর মামা আশুতোষ সব কথা জেনে নিয়েছে অমরেশের কাছ থেকে। কথায় কথায় অমরেশ আশুতোষের কাছে একটা কাজের জন্য বলেছে। টাকা নয় ছয়ের কথা জানার পর জয়ন্তী অমরেশকে এস্টেটের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করে। এতে মামা আশুতোষ হাহাকারের সুরে বলেন –

> "আমরা খাব কি মা? একপাল পুষ্যি, সবাই উপোস করে মরবে – তাই তুমি চাও?"[৩]

উত্তরে জয়ন্তী মামাকে বলেছে —

> "উপোস করবেন কেন ? যেমন আছেন তেমনি থাকবেন এখানে। আর মাসে দু-শ টাকা করে পাবেন। এস্টেটের কোন কাজ কর্ম করতে হবে না।"[৪]

একদিন ছোট্ট ডিঙি করে জয়ন্তী এবং অমরেশ বেড়াতে বেরিয়েছে। এস্টেটের সীমানা ও লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য। স্রোতের মুখে এক খড় বোঝাই নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লেগে অমরেশের পা ভেঙেছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রায় দু-মাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। সে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। স্থান পেয়েছে জয়ন্তীর বাড়িতে। বাড়িতে একা একা অমরেশ ছেলে বকুলের কথা ভাবতে থাকে। কিন্তু করার কিছুই ছিল না।

এদিকে মনোরমা খোকনকে অর্থাৎ বকুলকে নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। এমন সময় মনোরমার বাড়িওয়ালা ফটিক তাকে একটি কাজের সন্ধান দেয়। একটি হাঁপানি স্ত্রীলোকের দেখাশোনা করা। রাতে খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে মনোরমা মালিকের গাড়িতে ওঠে। পথে ভদ্রলোকের অশালীন আচরণের জন্য মনোরমা বাড়ি ফিরে আসে। বাবা জনার্দনকে সব কথা বলে। নিমেষের মধ্যে জনার্দন দোকানের জিনিসপত্তোর পাচার করে দেয় গুরু ভাইর বাড়িতে। ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। কেননা, সেই ভদ্রলোকেরই এইসব ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি।

জয়ন্তী অমরেশকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মামা আশুতোষ রাজি ছিলেন না। সে জয়ন্তীকে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছে —

> "রাজি হয়েছে তো মিত্তির মশায়ের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। ও পাগল ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায় ? হ্যাংলাটা তো কড়ে-আঙুল বাড়িয়েই আছে।"[৫]

মামার অমতেই জয়ন্তী অমরেশকে বিয়ে করতে চায়। অমরেশ বিয়ের আগে এক ভাড়া বাড়িতে রয়েছে। একদিন ছেলের খোঁজে পুরানো ভাড়াবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। জানতে পারল মনোরমা অনত্র চলে গেছে। ডাক্তার করালী অমরেশকে বললেন –

> "রাতারাতি পালিয়ে গেছে। ছেলে খালাস করতে এসেছ বুঝি ? সে হবে না। অতি হতভাগা তোমার ছেলে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মা-টিকে তো সাবাড় করল। এখন তোমার অবস্থা ভালো-নিয়ে গিয়ে আদরে যত্নে রাখতে পারতে। কিন্তু কোথায় পাবে ?"[৬]

এরপর এক শুভলগ্নে জয়ন্তী ও অমরেশের বিয়ে হয়ে গেল। সুখেই কাটছিল তাদের সংসার। চার বছর কেটে গিয়েছে এইভাবে। জয়ন্তী মা হতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। মাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলেকে বাঁচানো গেল না। জয়ন্তী ভীষণ অসুস্থ হয়ে বিছানা নিয়েছে। অমরেশ সেবা করে চলেছে। তার সেবায় জয়ন্তী সুস্থ হয়ে উঠেছে। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ভুলতে বাইরের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সে পাথেয় করল। কাজেই জয়ন্তীর চালচলন অমরেশের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একদিন অমরেশ রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছে। এমন সময় দেখল একদল ছেলের মধ্যে একটি ছেলে গল্প গুজব করতে থাকে। এই ছেলেই যে বকুল তা এক দেখাতেই চিনেছে অমরেশ। মনোরমা অমরেশকে দেখেনি। মনোরমা ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। অমরেশ কিছুই বলল না। ভাবল –

> "টাকাটা সে হয়তো জয়ন্তীকে চুরি করে কায়ক্লেশে মিটিয়ে দিতে পারবে – কিন্তু ছেলে... রেবার স্মৃতিকন্টক ঐ ছেলে নিয়ে কি করবে এখন সে? কোথায় তুলবে?"[৭]

মনোরমার বাবার ছবির দোকানে বেশ মন্দা দেখা দিল। বকুল একদিন এক অন্ধ ভিক্ষুককে ভিক্ষা করতে দেখে। নিজেও এইভাবে একদিন সে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ে। জয়ন্তী ছোট্ট ছেলেকে দেখে অবাক হয় এবং তাকে একটি টাকা দেয়। –

> "আহ্লাদে তিড়িং করে এক নাচন দিয়ে গলিঘুঁজি ভেঙে বকুল চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্তী সেন সম্বিৎ হারিয়ে তাকিয়ে আছে।"[৮]

মনোরমার বাবা জনার্দন ছবি বাঁধানোর কাজ করছে পথে ঘুরে ঘুরে। বকুলও এই পথ বেছে নিয়েছে। একদিন জনার্দন একজনের বাড়িতে ছবি বাঁধাই করছে, ঠিক সেই সময় বকুল জয়ন্তীর বাড়ির বৈঠকখানায় টাঙানো ছবি ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিল। অমরেশের ছবি ভেঙেছে বলে জয়ন্তী শঙ্কান্বিত হয়ে জনার্দনের দোকানে ভাঙা ছবি পাঠিয়ে দেয় বাঁধানোর জন্য।

দারোয়ান বকুলকে ধরে এনেছে জয়ন্তীর কাছে। সে সময় অমরেশও এসে পড়েছে। জয়ন্তী বকুলের কাছ থেকে তাদের সব কথা শুনেছে। পরে অমরেশের ছবি আনতে দোকানে গেছে জয়ন্তী। ছবি বাঁধানো তখনও হয়নি। জয়ন্তী সেই ফাঁকে দোকানে বসে বসে ছবি দেখছে। আসার সময় পাঁচখানা ছবি পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনেছে। এরমধ্যে একটি অমরেশের ছবি ছিল—

> "একটি হাসিমুখ মেয়ে তার পাশে। দেখলে সন্দেহ থাকে না, স্বামী-স্ত্রী তারা। আবার বিয়ে করেছে অমরেশ? তা যে রকম জ্বালাতন হয়েছে জয়ন্তীর কাছে, যেমন অপমান পেয়েছে – সেটা কিছু অসম্ভব নয়। জীবনে সুখী হতে চাচ্ছে – হোক, তাই সে হোক।"[৯]

রাতে অমরেশও বাড়ি ফেরে না। জয়ন্তী সারারাত ঘুমোতে পারে না। সকাল হতেই ছবির দোকানে গেছে। সেখানে গিয়ে শুনতে পায় বকুলের অসুখ। বাড়িতে ডাক্তার এসেছিল। জোর করে জয়ন্তী বাড়িতে ঢুকেছে। সেখানে দেখতে পায় অমরেশকে। দুজনেই কি করবে ভেবে পায় না। পাশে কাঁথা চাপা দেওয়া অসুস্থ বকুল সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে —

> "না – তুমি যাবে না বাবা। কক্ষনো কোথাও যেতে পারবে না।"[১০]

বকুল ঘুমিয়ে পড়লে জয়ন্তী এবং অমরেশ বাড়ি ফিরেছে। গাড়িতে দুজনের কথাবার্তার পর ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে। বকুলকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে চিকিৎসা করিয়েছে জয়ন্তী। বকুল সুস্থ হয়ে ওঠার পর জয়ন্তী-অমরেশ-মনোরমা-জনার্দন-বকুল একই সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করতে থাকে।

উপন্যাসটিতে পারিবারিক চিত্র প্রাধান্য পেলেও এটি আসলে রোমান্টিক কাহিনী। এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র জয়ন্তী। ধনীর ঘরের মেয়ে জয়ন্তী মাতৃত্বকে দেখেছিল ঘৃণার চোখে। মামী নবদূর্গাকে সে বলেছে —

> "কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে বিয়ের কথা নিয়ে এবাড়ি ঢুকবে? ছেলেপুলে? কিছু মনে কোরো না মামি, তোমার ওগুলোকে নিয়ে বলছিনে। ছেলেপুলে কাছে এলে আমার কেমন গা শিরশির করে ওঠে। কেন্নোকেঁচোর মতো।"[১২]

বিধাতা বোধ হয় আড়ি পেতে শুনেছিল জয়ন্তীর কথা। মাতৃত্বের সব যন্ত্রণা ভোগ করেও সে পেল না মাতৃত্বের অধিকার। মামীর অমঙ্গল কামনা বিধিলিপিরূপে দেখা দিল জীবনে। শেষপর্যন্ত বকুলকে পেয়ে প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে উঠল মন।

উপন্যাসে আর এক চরিত্র মনোরমা কুমারী হয়েও মাতৃত্বে উপনীত হয়েছে। জীবনের কঠিন সময়েও বকুলকে কাছে টেনে নিয়েছে। স্নেহ-আদর-ত্যাগে মহৎ মনোরমাকে তাই বকুল মায়ের আসনে বসিয়েছে। কুমারী নারীও এভাবেই পেয়েছে মাতৃত্বের আস্বাদ। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অমরেশ, জনার্দন, মামা আশুতোষ উল্লেখযোগ্য। অমরেশ চরিত্রটি

কাহিনীর স্রোতে ভেসে গেছে। নিজের ব্যক্তিত্ব হার মেনেছে অর্থের কাছে। বৃদ্ধ জনার্দন চরিত্রটি কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কুমারী মেয়ের মাতৃত্বকে সে কখনো খারাপ চোখে দেখেনি। মামা আশুতোষ ধনী ভাগ্নির গলগ্রহ হয়ে থেকেছে। টাকা আত্মসাৎ করার ব্যাপারে সে ছিল সিদ্ধহস্ত।

উপন্যাসটি শুরু বকুলের জন্মগ্রহনের ঘটনার মধ্যদিয়ে। বকুলকে জন্ম দিয়েই মা রেবার মৃত্যু। অসহায় দুধের শিশুকে মনোরমার হাতে তুলে দিয়ে বাবা অমরেশ ঘর ছাড়ে। সেই বকুলকে খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে অমরেশ ও জয়ন্তীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। শেষপর্যন্ত জয়ন্তী রেবার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারে এবং জয়ন্তীর সঙ্গে অমরেশের মনোমালিন্যের অবসানের মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ বকুলের মায়ের স্থান পাওয়ার ঘটনাক্রম উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়। বকুলের পালিত মা মনোরমা এবং সতমা জয়ন্তীর মাতৃত্ব পূর্ণতা পেয়েছে একসঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়ে। বকুল কোন মাকেই কাছ ছাড়া করতে চায় না। তাই উপন্যাসের নামকরণ 'বকুল' হয়েছে সার্থক।

এক বিহঙ্গী

মনোজ বসুর 'এক বিহঙ্গী' (১৯৫৪) উপন্যাসটি প্রেমমূলক এবং গার্হস্থ্য জীবনের মধুর গল্প। গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে লেখক রোমাণ্টিক কাহিনী রচনা করেছেন।

গ্রাম জীবনের প্রতি লেখক মনোজ বসুর দুর্নিবার আকর্ষণ যেমন রয়েছে তেমনি শহর জীবনের অস্বাভাবিকতা লেখকের মনে সঞ্চার করেছে বিতৃষ্ণা। গ্রামে জন্মানোর সূত্রে গ্রামজীবন সম্পর্কে যেমন অভিজ্ঞতা ছিল তেমনি শহরে জীবিকার সূত্রে থাকাকালীন শহুরে জীবনকেও উপলব্ধি করেছিলেন। শহর জীবন ভালো না গ্রাম জীবন ভালো ? এই কথারই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র মিহির মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক; গ্রাম থেকে শহরে এসেছে চাকরির সন্ধানে। তার আচার-আচরণ গ্রামের মানুষদের মতই সহজ-সরল, সাদা-সিধে। শহরে তার আচরণ বেমানান। অন্যদিকে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত ধনীর মেয়ে অনীতার কাছে মিহিরের আচরণ কৌতুকের ব্যাপার। এই কৌতুক এবং কৌতূহল ধীরে ধীরে

মিহিরের প্রতি অনুরাগে রূপান্তরিত হয়েছে। অনীতা নগর জীবনের প্রতীক। তার চিন্তা ও কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। এই নগর সভ্যতার আর এক চিত্র ফুটে উঠেছে আলোকের মাধ্যমে। অলোক এবং অনীতার পারস্পরিক সম্পর্ক নগর জীবনের ছাঁচে ঢালা। দীপক চন্দ্রের কথায় —

> "অনীতার মনের মিটার মেপে অলককে চলতে হয়। অনীতাকে বিচার করা বা তার পথ থেকে নিবৃত্ত করানোর মত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব অলকের নেই। নাগরিক কৃত্রিমতায় অলকের চরিত্র আড়ষ্ট।"[১]

যা অনিতার পছন্দ নয়। সেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অনীতা দেখতে পেয়েছে মিহিরের মধ্যে। গ্রামের মতই সে খোলামেলা, সাদাসিধে। মিহিরের মতো চরিত্রগুণ শহরের মধ্যে দুর্লভ। যা অনীতার মনকে ছুঁয়ে যায়। তার প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে বহু জটিলতার সম্মুখীন হয়েও অনীতা বিয়ে করেছে মিহিরকে।

গ্রামের সাদাসিধে মানুষ মিহিরের সঙ্গে শহরের জেদি, খামখেয়ালি মেয়ে অনীতার বিয়ের পরই দেখা দিয়েছে আসল সমস্যা। কেননা পরস্পরের বিয়েতে মনের মধ্যে যতটা আবেগ ছিল, ততটা বিচারবোধ ছিল না। অচিরেই ঘনিয়েছে দাম্পত্য সংকট। এই দ্বন্দ্বের মূলে অনীতার খামখেয়ালি ও মিথ্যা আভিজাত্যের মোহ প্রাধান্য পেয়েছে। যে মেয়ে এতদিন বাইরের চাঞ্চল্য-হাসি ঠাট্টার মধ্যে মনকে ভরিয়ে রাখত সে মিহিরের ভালবাসতে রাতারাতি পরিবর্তিত হতে পারেনি। শহরের বন্ধনহীন জীবন থেকে গিয়ে বন্ধন-অসহিষ্ণু মন পাড়া গাঁর পরিবেশে অস্থির হয়ে ওঠে। তাইতো অনীতা ফুলশয্যা মিটবার আগেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে শহরে। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মটা প্রথম অনুভব করল সে। ক্লাব, থিয়েটার নিয়ে নিজেকে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এতে মনের শূন্যতা যে প্রতিনিয়ত বেড়েছে তা সে বুঝতে পারে না। অলকের চোখ দিয়ে লেখক দেখালেন তাকে —

> "আগেও অনীতা দেবীকে কত দেখেছি — এত হাসতে দেখিনি কখনো। পাগলের মত হাসছেন।"[২]

মনের রিক্ততা একদিন নিজেকে চিনিয়ে দিল। হাসি ঠাট্টার আর আড্ডার খামখেয়ালি জীবন যে নারীদের জন্য নয় তা উপলব্ধি করেছে অনীতা। বুঝতে পেরেছে নারীর স্থান ঘরের মধ্যেই। স্থানচ্যুত হওয়ায় সে ক্লান্ত, অতৃপ্ত। সোনারপুরে থিয়েটার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে

খুঁজে পায় নিজের স্থান। নকলে আর আসলে তফাৎ ধরার ক্ষমতা তার ছিল না। অভিনয়ের পরেই অন্তরের ফাঁকিটা পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়েছে চোখের সামনে। মন হয়েছে অনুতপ্ত। মিহিরের কাছে খেদোক্তি করে অনীতা বলে —

> "আজকে নতুন করে ভাবছি। আমার পড়াশুনো, নাচ, গান, অভিনয়, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতারের যশ ... কিন্তু চারদিকে ছড়ানো এলোমেলো যশে কেমন যেন মন ভরে না।"[৩]

মিহিরের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে অনীতার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। শহরের হৈ-হুল্লোড় ময় জীবনে প্রশান্তি নেই, শান্তি রয়েছে গ্রাম জীবনের সুখী দাম্পত্যে। অনুরাগের মধুর বন্ধনে বেঁধে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক মনোজ বসু। অনীতার অভিব্যক্তি –

> ''সহসা চোখ সজল হয়ে ওঠে। আমার মা ছিল না। ঘর সংসার কখনো চোখে দেখিনি সংসারটাকে অতি তুচ্ছ ভেবে এসেছি বরাবর। ... আমার মা নেই, ভালো কথা বলে শাসন করার কেউ নেই — তাই আমি এমন হয়েছি।''[৪]

নগর ও গ্রাম জীবনের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'এক বিহঙ্গী' উপন্যাস। উপন্যাসে অনীতার জীবন ও মননের সমস্যার আবরণমুক্ত করতে গিয়ে লেখক গ্রামের মানুষকেই আশ্রয় করেছেন। অনীতা মাতৃহারা বড় লোকের মেয়ে। সে খামখেয়ালী। এই খামখেয়ালীপনার জন্যই সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবলীলায়। পুরুষের মতই বাইরের জীবন নিয়ে সে মেতে থাকে। অলকের সঙ্গে বিয়ে হলে অনীতার মানস পরিবর্তন ঘটত কিনা বলা শক্ত। তবে মেয়েদের প্রকৃত রূপ সৌন্দর্য গার্হস্থ জীবনধর্মেই বেশি করে প্রতীয়মান হয়। অনীতার সঙ্গে মিহিরের বিয়ের মাধ্যমে লেখক অনীতার শহুরে অসংযত অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার সংশোধন করেছেন। মাতৃস্নেহবঞ্চিত এই নারীকে লেখক তুলে ধরেছেন—

> "অনীতা লেখকের পুরোপুরি রোমাণ্টিক সৃষ্টি। মুক্ত বিহঙ্গ সে। দুই পক্ষ বিস্তার করে রোমান্সের স্বপ্নরাজ্যে সে বিচরণ করে। বর্ষায় ভরা নদীর মত টলমল করছে তার যৌবন। স্রোতের জলের মত অস্থির তার মন। নিজের কাছে নিজেই সে একটা রহস্য।"[৫]

অনীতা শহর ছেড়ে গ্রাম জীবনে এসেই পেয়েছে জীবনের সার্থকতা। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র মিহির। সে গ্রামের সাদামাটা মানুষ। শুরুতে গ্রাম্যতা থাকলেও কাহিনীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে পূর্ণতা। মিহির চরিত্রের মধ্যে নেই কোনো কৃত্রিমতা, নেই কোনো প্রবঞ্চনা। এ

হেন মানুষ সম্পর্কে অনীতার অনুরাগরঞ্জিত মূল্যায়ণ — ছেঁড়া বস্তায় খাসা চাল। মিহিরের শান্ত নম্র আচরণ সন্ধ্যাপ্রদীপের মত আত্মপ্রত্যয়ে ও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। অনীতা যতই জেদী হোক না কেন সে কখনো মিহিরকে অবজ্ঞা করেনি। মিহিরের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে থেকেই অনীতা খুঁজে পেয়েছে জীবন সংশোধনের মূলমন্ত্র। অলক চরিত্রটি শহরের প্রতিনিধি স্থানীয়। আত্মধর্মে দুর্বল সে। কাহিনীতে অনীতার মত চরিত্রকে সংশোধন করানোর মতো দৃঢ়তা অলকের ছিল না। শহর কেন্দ্রিক আড়ষ্টতা চরিত্রটির মধ্যে ধরা পড়েছে। এরকম চরিত্র অনীতার পক্ষে নিতান্তই বেমানান। অন্যান্য চরিত্রগুলির বিকাশ উপন্যাসে সেভাবে দেখানো হয়নি।

অনীতাকে লেখক বিহঙ্গীরূপে তুলে ধরেছেন। শহরে নাচ-গান হাসি-ঠাট্টা করে সে বড়ো হয়েছে। যা নারীর প্রকৃত ধর্ম নয়। সেই নারী ধর্মের রূপান্তর দেখানো হয়েছে মিহিরের সঙ্গে অনীতার বিয়ের মাধ্যমে। নারীর স্থান বাড়ির অভ্যন্তরে বাইরের পরিবেশে তাকে মানায় না। সেই নারী চোখের জল ফেলেছে নিজের আচার-আচরণের কারণে। নারী যে মাতৃরূপিনী তাও প্রকাশ পেয়েছে অনীতার মাধ্যমে। খাঁচায় বন্দি পাখির মতই জীবন কাটিয়েছে অনীতা। অথচ তাতেই মনে করেছিল স্বর্গসুখ। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের সংস্পর্শেই অনীতা পেয়েছিল খাঁচা থেকে মুক্ত পাখির মতই মুক্তির আনন্দ। তাই বলা চলে উপন্যাসের নামকরণ ‘এক বিহঙ্গী’ সার্থক ও যথাযথ।

সবুজ চিঠি

স্বাধীনতা পূর্ব যুগের পটভূমিকায় লেখা ‘সবুজ চিঠি’ (১৯৫৬) উপন্যাসটি। দয়িতার প্রেম, সন্তানের মায়া, গৃহের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ ছেড়ে খ্যাতির তপস্যায় জয়ী হয়েও মিটল না জীবনের দাবদাহ। মানব মনের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আশ্চর্য উন্মোচন ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে।

উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ত্রিদিব নাথ ঘোষ এবং তার স্ত্রী মাধবীলতা। ডাকনাম ঝুমা। অত্যন্ত মেধার অধিকারী ত্রিদিব গ্রামের স্কুলের এক শিক্ষক। মাইনে সামান্য হলেও স্ত্রী ঝুমা খুব সুন্দরভাবে সংসার চালায়। তাদের সুখের সংসার বেশ আনন্দেই চলছে। ঝুমা একটি

মেয়েদের সংস্থা 'শক্তি সংঘে'র সঙ্গে জড়িত। এতে ঝুমার কিছু আয় হয় এবং আনন্দও পায়। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত বিপ্লবী কর্মী শংকর মিত্র। ত্রিদিব নিজের চাকরিতে সন্তুষ্ট নয়। বেশ কিছু জায়গায় চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে। ঝুমাও পুনরায় লেখাপড়া শুরু করেছে। তবে ছেলে হবার পর ঝুমা লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে। সে ত্রিদিবকে বলেছে –

> "হিমসিম হয়ে যাই একরত্তি ঐ দস্যি সামলাতে। আমার আবার কিছু হবে। বই-খাতা তাকে তুলে দিয়েছি। ঘরে মন রয় না বাবুর, অহরহ পালাই পালাই। পুরোপুরি বাপের স্বভাব।"[১]

ত্রিদিবের এই ছেলের নাম মুকুল।

গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী ঝুমা ও ছেলে মুকুলকে রেখে ত্রিদিব চাকরির খোঁজে কলকাতায় আসে। কলকাতায় সে চৌরঙ্গীর হোটেলে উঠেছে। পরে ছাত্রজীবনে থাকা সনাতন মেসে। এই মেসেই থাকে ত্রিদিবের পুরনো বন্ধু ভুজঙ্গ বাঁড়ুজ্যে এর কাছেই খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ত্রিদিব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ছাত্র। চাকরির খোঁজ করার মাঝে মাঝেই তার মনে পড়ে স্ত্রী ঝুমা এবং সন্তান মুকুলের কথা। সে নিজেকে বিরাট পণ্ডিত এবং ধনী ব্যক্তি বলে জাহির করলেও শেষ পর্যন্ত মেসের দেনা শোধ না করেই মেস ছেড়ে চলে যায়। আমেরিকার অ্যানুয়াল রিভিয়্যু-অব-ফিজিক্সে তার একটি লেখা বেরিয়েছে প্রোটন সম্পর্কে। লেখাটার প্রশংসা করেছে ওদেশের মানুষ। কিন্তু এদেশের মানুষের ঘুম ভাঙেনি। খবরটা বাংলা কাগজে ছাপাবার জন্য সে খবরের কাগজের অফিসে যায়। উৎপলার সঙ্গে সেই অফিসে দেখা হয়। সে ঐ অফিসে কাজ করে। উৎপলা হল ত্রিদিবের ছোটবেলার বন্ধু সুবোধের বোন। উৎপলাকে মিথ্যা করে বলেছে সে বর্তমানে ডক্টর অমল পালের কাছে চাকরি করে। বন্ধু সুবোধ মারা যাওয়ার পর থেকে ত্রিদিব আর ও বাড়িতে যায়নি।

এরই মধ্যে ত্রিদিবের আর এক বাল্যবন্ধু শেখরনাথের সঙ্গে গোপন এক বন্দোবস্তের ফলে ত্রিদিব হঠাৎপ্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছে। একটি একতলা বাড়িতে সে এবং আর এক মহিলা সুধাময়ী থাকে। এখান থেকে সে ঝুমাকে চিঠি দিয়েছে। ঝুমা সনাতন মেসে চিঠি পাঠিয়ে ভুজঙ্গ বাবুকে ত্রিদিবের ঠিকানা জানিয়ে দেয়। ভুজঙ্গ সেখানে হাজির হয় টাকা আদায়ের জন্য। এরপর এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে ঝুমা সপুত্র সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু

ত্রিদিবের বাড়িতে মহিলার উপস্থিতি দেখে ঝুমা চমকে ওঠে এবং বিদ্যুৎবেগে সে মুকুলকে কোলে নিয়ে ঝুড়-বৃষ্টির মধ্যে স্থান ত্যাগ করে। ত্রিদিব বাধা দিতে পারেনি।

> "ঝড়ের মওতা, মেঘের হুঙ্কার, বৃষ্টির প্লাবন তারই মধ্যে ঝুমা নেমে পড়ল। কোলে মুকুল। চক্ষের পলকে একেবারে অদৃশ্য। ত্রিদিব বাধা দেবে, দরজা আটকে দাঁড়াবে – কিন্তু কী যেন তাঁর হয়েছে, উঠতে পারল না চেয়ার ছেড়ে, দেহ যেন আটকে আছে কাঠের চেয়ারের সঙ্গে। মানা করবে ঝুমাকে – কিন্তু গলা কাঠ। অনেক কষ্টে অর্থহীন আর্তধ্বনি বেরুল, কোন কথা নয়।"[২]

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। অনেক পরে ছুটে বেরিয়েছে রাস্তায়। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও ঝুমাকে পায়নি। ভোর হতেই ত্রিদিব আগের মেসবাড়িতে ঝুমার খবর নিতে গেছে। জংবাহাদুর অর্থাৎ ভুজঙ্গ বাবুর কাছে জানতে পেরেছে তার সঙ্গে বড় ভাই এসেছিল –

> "বউমার দাদা। তিনিই তো সর্বেসর্বা দেখলাম। হুকুম - হাকাম ঝাড়ছেন, তাঁর কথা মতই সমস্ত হচ্ছে।"[৩]

কথা শুনে ত্রিদিব খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। কেননা তার কোন ভাই ছিল না। ত্রিদিব তার গ্রামের বাড়িতে খোঁজ করতে গেল। সেখানে শুনল, ঝুমা শঙ্কর মিত্রের সঙ্গে অনেক আগেই ঘর ছেড়েছে।

ত্রিদিবের বন্ধু শেখরনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মঞ্জুলার। মঞ্জুলার উৎসাহে শেখরনাথ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্রতী। সমাজে তার বিশেষ নামডাক। সে ত্রিদিবকে বাইরে পড়তে পাঠাবার চেষ্টা করেছে। মাসখানেক পরে ত্রিদিব বিলেতে যাত্রা করেছে। সুধাময়ী স্টেশনে তুলতে এসেছে। গাড়ি ছাড়ার আগেই ত্রিদিব সুধাময়ীকে একটি সবুজ খাম দিয়ে বলেছে —

> "পৃথিবীর পথ অতি পিছল। কার কি গতি হবে আগে থাকতে কেউ বলতে পারে না। এইটুকু বয়সে কম তো দেখলে না। সবুজ চিঠি হল দলিল। এটা যতক্ষণ আছে, আর যাই হোক, তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটবে না।"[৪]

এই কথা বলতে বলতে সেখানে হাজির হয় উৎপলা। সে খবর পেয়ে এসেছে বিদায় জানাতে।

দশ বছর বিদেশে কাটিয়ে ত্রিদিব দেশে ফিরেছে। ইতিমধ্যে শেখরনাথের স্ত্রী মঞ্জুলা মারা গেছে। সে বেঁচে থাকলে আজ সবচেয়ে বেশি খুশি হত। কেননা, তারই জন্য ত্রিদিব ঘুরে

এসেছে বিদেশ থেকে। দেশে ফিরে ত্রিদিব নিজের কাছে আসার জন্য চিঠি লিখেছে সুধাময়ীকে —

> "চলে এসো, শেখরনাথের কাছ থেকে চাবি এনে ঘরের তালা খুলেছি। ছোবড়া বেরিয়ে-আসা খাটের গদিতে শুয়ে শুয়ে আরামে এতক্ষণ দেয়ালের জালের মধ্যে মাকড়সার নিঃশব্দ শিকারের কায়দা দেখছিলাম। আর কি কাজ। শুধুমাত্র তিন কাপ চা খেয়ে এসেছি বাইরের দোকানে গিয়ে। গোপলার আর পাত্তা পায়নি আছে কি এতদিনে মরে ফৌত হয়েছে, কে জানে ? যাই হোক, তুমি তো বেঁচে বর্তে রয়েছ – শহরে এসে আবার রাজত্ব জমাও। অভাজনের নইলে ভারি মুশকিল...।"[৫]

চিঠি পেয়ে সুধাময়ী এসে গেছে। এদিকে দেওঘর থেকে উৎপলা একগাদা পেপার কাটিংস ডাকে পাঠিয়েছে ত্রিদিবকে। তা থেকে ত্রিদিব জানতে পারে বিপ্লবিনী মাধবীলতার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ। পেপারে বলা হয়েছে শঙ্কর মিত্তিরের স্ত্রী মাধবীলতার কথা। অর্থাৎ ত্রিদিব জেনেছে তার স্ত্রী ঝুমা মারা গেছে। ঝুমার প্রকৃত পরিচয় সে কাউকে বলতে পারেনি।

উৎপলা বর্তমানে দুলালচাঁদের কাগজের অফিসে চাকরি করছে। ত্রিদিব দেওঘরের বেলাবাগানে উৎপলাদের বাড়ি গেছে উৎপলার অসুস্থ বাবা হরিদাসকে দেখতে। দুলালচাঁদও উৎপলার বাড়িতে উপস্থিত হলে দুজনের মধ্যে আলাপ হয়েছে। দিন কয়েকপরে সবুজ চিঠির খোঁজ পড়েছে। সুধা সে চিঠি খুঁজে পায়নি। উৎপলা চিঠি সরিয়ে ফেলেছিল। উৎপলা বলেছে–

> "তাড়াতাড়ি চিঠি সরাতে হল – সাধু সদাশয় তোমরা, হয়তো বা ধর্ম রেখে ছিঁড়ে ফেলে দেবে। তোমার উপর যত অন্যায় হয়েছে, একদিন শোধ তুলব ঐ পাশুপাত -অস্ত্র দিয়ে।"[৬]

উৎপলা ত্রিদিবকে বিয়ে করতে চায়। বাড়িতে বিয়ের কথা বলার মত কেউ নেই। তাই নিজে থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ত্রিদিব তাঁর নিজের অতীত সম্পর্কে জেনে নিতে বললে উৎপলা জানায়–

> "না গো ত্রিদিবদা, না। অতীতের কবর খুঁড়ে লাভ নেই। তুমি চুপ করো।"[৭]

দুলালচাঁদের কাগজের অফিসের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে ত্রিদিব একটি ছোট ছেলেকে দেখে। সে তার পুত্র মুকুল। কিন্তু কেউ কাউকে চিনে না। এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়েছে ঝুমার সঙ্গে ত্রিদিবের। ঝুমা মারা যায়নি; নাম বদল করে সে হয়েছে লতিকা দেবী। ত্রিদিব তাকে

নিজের মানসিক অবস্থার কথা বলে। দুজনের ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়। সজল চোখে ঝুমা ত্রিদিবকে বলেছে–

> "আমিও যে চাই সমস্ত। স্বামী চাই, সংসার চাই একা একা আর পারিনে। ঝড়ের মধ্যে কেন বেরুতে দিলে সেদিন ? দোষ তোমারই – দুয়োর বন্ধ করে আটকালে না কেন আমায়।"[৮]

দুজনে পুনরায় সংসার করতে মনস্ত করেছে। পরে অবশ্য ত্রিদিব তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে ঝুমাকে অপমান করে বলেছে –

> "তুমি নয়, আপনি বল। ডক্টর রায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এমন কিছু অন্তরঙ্গতা সে স্বীকার করে না তোমার সম্বন্ধে।"[৯]

উৎপলা ত্রিদিবকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়েছে। ত্রিদিবের নীরবতাকে উৎপলা সম্মতি বলে ধরে নিয়েছে। উৎপলা লতিকাকে চেনে। তার বাবার অর্থাৎ হরিদাস অসুস্থতার সময় সে খুব সাহায্য করেছিল। লতিকা এখন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। স্কুলটি শেখরনাথের। শেখরনাথের এখন একজন স্বামীজির অনুগত। সেই স্বামীজির অনুপ্রেরণায় শেখরনাথ এখন দান ধ্যানে মগ্ন। স্বামীজি আসলে আত্মগোপনকারী শংকর মিত্র।

শেখরনাথ লতিকার প্রতি আকৃষ্ট, তাকে বিয়ে করতে চায়। অনিচ্ছুক লতিকা মন ফেরাবার জন্য শেখর অনুরোধ করেছে ত্রিদিবকে। ত্রিদিব শেখরনাথের স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা রূপে ঝুমাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছে। লতিকা ত্রিদিবের সঙ্গে অপরিচিতের মত ব্যবহার করেছে। সে শেখরকে বিয়ে করতে রাজি নয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শেখর তার চরিত্র সম্পর্কে কুৎসিত ইঙ্গিত করে বলেছে –

> "কুমারীর সন্তান। আর তাই গোপন রেখে পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে আছেন এতদিন। শহরের বিশিষ্ঠ ভদ্রঘর থেকে এখানে মেয়ে পাঠায়।"[১০]

লতিকাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে চেয়েছে। অন্যদিকে দুলালচাঁদের দুর্ব্যবহারের জন্য উৎপলাও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

কাউন্সিলের সভা ডাকা হয়েছে ঝুমা অর্থাৎ লতিকাদেবী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। শেখরনাথ সেখানে উপস্থিত। এ নিয়ে আলোচনা যখন চরমে উঠেছে তখনই উৎপলা ঢুকেছে

একটি সবুজ চিঠি হাতে নিয়ে। সেখানে উৎপলা উন্মোচন করে দিয়েছে শেখরনাথের প্রকৃত পরিচয়। এই সবুজ চিঠি তার দলিল। সে বলেছে —

> "এক সরলা উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে প্রেম জমিয়েছিলেন। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হল, চোখে অন্ধকার দেখলেন তখন! এঁর যত বড়মানুষি আর মহাত্মাগিরি স্ত্রীর পয়সায়। স্ত্রীকে বাঘের মত ডরাতেন। কুম্ভমেলার নাম করে বেরিয়ে পড়লেন, মেয়েটিও গেছে। নানারকম চেষ্টা করে দেখে শেষটা পরম বন্ধু ত্রিদিবের কাছে কাকুতি মিনতি করছেন, পাপের দায়িত্ব নিতে বলছেন তাকে, প্রলোভন দেখাচ্ছেন –"[১১]

এই সময় লতিকা দেবী উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। এগিয়ে এসে উৎপলার হাত থেকে কাড়িয়ে নিলেন চিঠিটা। উৎপলা বলে চলে —

> "তাই নিলেন ত্রিদিব রায়। সুনাম-সম্ভ্রম বিক্রি করে দিলেন টাকার দামে। দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। আর ত্রিদিবও চান তাই। ছোট্ট বয়স থেকে বিদেশের শিক্ষা নিয়ে বড় হওয়ার লোভ – শেখরনাথের টাকায় সে আশা পূরণ হল। শেখরনাথেরও লাভ। প্রতিভাশালী এক বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য তার নামে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। আপনারা কেউ জানেন না – দাম নয়, সেটা মূল্য-শোধ।"[১২]

সবুজ চিঠি আদ্যোপান্ত পড়ে লতিকাও হতভম্ব হয়েছে। ইতিমধ্যে ভুজঙ্গ বাবু ত্রিদিবের অসুস্থতার খবর নিয়ে এসেছে। লতিকা ব্যাকুল হয়ে সবার সামনে বলেছে, ত্রিদিব তার স্বামী, মুকুলের বাবা। লতিকার মুখে তার জীবনের ঘটনা জানা গেল। শঙ্করের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করেনি, দেশের কাজে নেমেছিল। মাধবীলতার মৃত্যু সংবাদ রটে যাওয়ার পর সে অন্য নামে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। উৎপলা, সুধাময়ী, ত্রিদিব, মুকুল সকলে যখন মিলিত হয়েছে, তখন পুলিশ এসেছে লতিকাকে অ্যারেস্ট করতে। শংকর মিত্রের সহকারী হয়ে সে খুন করেছিল এক গুপ্তচরকে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

'সবুজ চিঠি' উপন্যাসটিতে রোমান্সগুণ প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীর মধ্যে রহস্যঘন পরিবেশ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল লেখকের। ত্রিদিব এবং শেখরনাথ-এর সম্পর্ক প্রথম দিকে স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট নয় ত্রিদিব ও সুধাময়ীর সম্পর্কও। সমস্ত চরিত্রই রহস্যে ভরা। শেষে সবুজ চিঠির মাধ্যমে সমস্ত রহস্যের উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ত্রিদিবকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গেছে। যাত্রাপথে আগত চরিত্রগুলি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ত্রিদিব স্কুল শিক্ষক থাকার সময় শেখরনাথের কাছে চিঠি লিখে সে রূঢ় জবাব পেয়েছিল। ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় এসে ভুলে গেল স্ত্রী-পুত্রকে। সবকিছু ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাল। আসলে ত্রিদিব যেন এক অদ্ভুত চরিত্র। জ্ঞানের অধিকারী হয়েও উৎপলার কানের রিং চুরি করেছে অভাবের তাড়নায়। তাও স্বীকার করেছে নিজমুখে। চরিত্রটির মধ্যে প্রায়ই অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। ঝুমা চরিত্রটি উপন্যাসের শুরুতে সক্রিয় হলেও পরবর্তীতে তাকে কমই দেখা গেছে। উপন্যাসের শুরুতে ঝুমার প্রথম জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের নায়িকার মিল রয়েছে। উৎপলা চরিত্রটি উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শেখরনাথ চরিত্রটি কাহিনীকে নিয়ন্ত্রন করলেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখিনা। নিজ স্বার্থের কারণে বন্ধুপ্রীতি তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ। দুলালচাঁদ, ভুজঙ্গ, সুধাময়ী চরিত্রগুলিকে উপন্যাসে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়নি।

স্কুল শিক্ষক ত্রিদিব ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় এসে যখন লাঞ্ছিত হচ্ছিল তখনই হঠাৎ ভাগ্য ঘুরে গিয়ে পৃথক একতলা বাড়িতে বাস শুরু করে। এমনকি বিদেশ যাত্রাও করে। বিদেশ যাত্রাকালে ত্রিদিব সুধাময়ীকে প্রথম সবুজ চিঠির কথা বলে। যার দ্বারা সুধাময়ীর জীবনে অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটবে না। সেই চিঠি চুরি যায়। উৎপলা সেই চিঠি চুরি করে শেখরনাথের কাউন্সিলের সভায় সকলের সামনে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দেয়। অর্থাৎ এই চিঠিই ত্রিদিবকে বাড়ি দিয়েছে, বিদেশে পাঠাতে সাহায্য করেছে। আবার ঝুমাকে অসম্মানের হাত থেকেও বাঁচিয়েছে। সর্বোপরি উপন্যাসের শেষে ত্রিদিব ও ঝুমার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিও কেটে গেছে এই চিঠির হাত ধরে। তাই উপন্যাসের নামকরণ 'সবুজ চিঠি' যথার্থ এবং সার্থক।

বৃষ্টি বৃষ্টি

মনোজ বসুর 'বৃষ্টি বৃষ্টি' (১৯৫৭) উপন্যাসটি ইতিহাস ও প্রেমের কাহিনী স্থান পেলেও কৌতূক ও হাস্য রসে বিষয়বস্তু হয়েছে প্লাবিত। রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার সঙ্গে সংঘাতের ফলে

ইতিহাসের শান্তিকামী সাধক সুস্থির থাকতে পারল না। ঘটনায় জটিলতা থাকলেও অন্তরের হৃদয়গত প্রেম অনুভূতিকে লেখক মিলনের সমুদ্রসঙ্গমে এনে হাজির করেছেন উপন্যাসটিকে।

উপন্যাসের নায়ক অরুণাক্ষ ইতিহাসের ছাত্র। সে বিখ্যাত ডাক্তার অম্বুজাক্ষের একমাত্র সন্তান। এক প্রবল বৃষ্টির রাতে অরুণাক্ষের বাড়িতে ক্ষণিকের আশ্রয় নেয় উপন্যাসের নায়িকা ইরাবতী। ইরাবতীর বাবা বিশ্বেশ্বর সরকার ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেন। প্রথম সাক্ষাতেই অরুণাক্ষ ইরাবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অরুণের পিতা অর্থাৎ অম্বুজাক্ষ ছেলের জন্য বিয়ে ঠিক করেছে বন্ধুর মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। যদিও অরুণের মায়ের পছন্দ নয়। এ প্রসঙ্গে হরিহর বলে –

> "নাচুনে মেয়ে – ধিতিং ধিতিং করে নাচে। মা সেইজন্যে মুখ সিঁটকান। কিন্তু মেয়ের বাপ ডাক্তার বাবুর ছেলে বয়সের বন্ধু। বিচ্ছেদের জন্যে কলকাতায় এসে এখন মেয়েটাকে গছাবার তালে আছেন।"[১]

অথচ এই মেয়েকে অম্বুজাক্ষের পছন্দ। কারণ ওর মামাকে (অর্থাৎ পুতুল দত্ত) ধরেই ডাক্তার অম্বুজাক্ষ মনিরামপুর থেকে এ্যাসেমব্লি নির্বাচনে দাঁড়াতে চান। কিন্তু ডাক্তারবাবুর নির্বাচনে দাঁড়ানোর প্রধান অন্তরায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইংরেজ শাসনকালে রামনিধি সরকার ছিলেন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক। তাঁর বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান। পুরুত আসছেন না। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নীলকুঠির ইংরেজ সাহেব টমাস পুরুতকে জোর করে পথ থেকে নিয়ে গিয়ে উঠান ঝাঁট দিয়ে নিয়েছে। শুনে রামনিধি মশায় ক্ষেপে গেলেন। টমাস সাহেব অন্নপ্রাশন বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। টমাস সাহেব এলে রামনিধি মশায় সাহেবের হাতে ঝাঁটা তুলে দিয়ে নিজের উঠোন ঝেঁটিয়ে নিয়ে পুরুতের অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। এমনিতেই দেশের লোকেরা তখন নীলকুঠির সাহেবদের ওপর চটে ছিল। এই ঘটনায় আরও রেগে গিয়ে একদিন রাতে তারা নীলকুঠিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। টমাস সাহেব ওই আগুনে পুড়ে মারা যান। ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা পেতে রামানিধি সরকারকে আশ্রয় দেয় বন্ধু কাশীশ্বর রায়। পরে অবশ্য রামনিধি মশায় ইংরেজদের হাতে প্রাণ হারান। গ্রাম-বাসীদের অনুমান ইংরেজদের চর কাশীশ্বরই আসলে বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রামনিধি মশায়কে ধরিয়ে দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে

অম্বুজাক্ষের সম্পর্ক রয়েছে। অম্বুজাক্ষ রায় অর্থাৎ ডাক্তারবাবু কাশীশ্বরের রায়ের প্রপৌত্র হওয়ায় মনিরামপুরের লোকেরা তাঁকে পছন্দ করে না।

অন্যদিকে রামনিধি সরকারের প্রপৌত্র হলেন বিশ্বেশ্বর সরকার। অর্থাৎ ইরাবতীর বাবা। তিনি ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেন। তাঁর লেখা বই 'ভারত ইংরাজ' গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির জন্য 'যুগচক্রে'র সম্পাদক কৃতান্ত লেখককে সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করেছে। এ সম্পর্কে ড. দীপক চন্দ্র বলেন –

> "লেখক মানুষের আন্তরিকতা - স্পর্শহীন ফাঁকি-ত্রুটি, সমবেদনাস্নিগ্ধ বিদ্রুপের তীক্ষাগ্রে বিদ্ধ করে জীবনসত্যকে প্রকাশ করেছেন। বাগাড়ম্বরময় বক্তৃতাবহুল সম্বর্ধনা সভার অন্তঃসারহীনতা ও হৃদয়হীনতার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হল ইরা ও তার মা সরমা।"[২]

এই সম্বর্ধনা সভায় অপমানিত হয়েছে বিশ্বেশ্বর ও মেয়ে ইরা। ইরার ব্যধিত আচরণ প্রসঙ্গে ধড়িবাজ কৃতান্ত অসহিষ্ণু হয়ে মনের গোপন কথা ব্যক্ত করে –

> "বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি, দাদা নিজে ছাড়া কজন মানুষ পড়েছে ? আমাদের যে গায়ের জ্বালা। ফর্মার পাহাড় হয়ে আছে, হৈ হৈ করলে তবু যদি দু-দশ জনের নজরে পড়ে, দশবিশখানা বিক্রি হয়ে যায়।"[৩]

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অরুণাক্ষ 'ভারত ইংরাজ' বইটি হাতে পায়। ইতিহাসের ছাত্র অরুণাক্ষ বইটি পড়ে জানতে পারে রামনিধি সরকার ও কাশীশ্বর রায় পরম বন্ধু ছিলেন। এমনকি কাশীশ্বর রায়ই রামনিধি মশায়ের পড়ে থাকা মৃতদেহ সৎকার করেছে। অর্থাৎ কাশীশ্বর রায় নির্দোষ। গ্রামবাসীদের মনে কাশীশ্বর রায়ের প্রপ্রৌত্র অম্বুজাক্ষ সম্পর্কে সমস্ত রাগ দূরীভূত হয়। তাদের মনে সহৃদয় মানসিকতার জাগরণ ঘটে।

অরুণাক্ষের মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পারে অম্বুজাক্ষ। অম্বুজাক্ষের পূর্ব পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক দূরীভূত হয় 'ভারত ইংরাজ' বইটির মাধ্যমে। অম্বুজাক্ষ বইটি কিনে নিয়ে গিয়ে গ্রামের পাঠাগারে রাখার ব্যবস্থা করেন। যাতে গ্রামবাসীরা আসল ঘটনা জানতে পারে। সেইসঙ্গে 'ভারত ইংরাজ' গ্রন্থের লেখক তথা রামনিধির প্রপৌত্রকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে সভায় বক্তৃতা দেওয়ার আয়োজন করে। গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে ফেরার সময় অম্বুজাক্ষ বাবুর বাড়ি থেকে অনেক পুরানো কাগজপত্র সঙ্গী করে নিয়ে আসেন বিশ্বেশ্বর বাবু। এরপর অম্বুজাক্ষ

বাবু কলকাতায় ফিরে বন্ধুর মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে অরুণাক্ষের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেন। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ইরাবতীর সঙ্গে। এক দিন ডাক্তার অম্বুজাক্ষ বাবু হাজির হন বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁর 'ভারত ইংরাজ' বইতে রামনিধি ও কাশীশ্বর সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা ভুল ছিল। আসল সত্যি হল কাশীশ্বর নীলকর সাহেবদের চর। রামনিধিকে চাষাভূষারা দেবতার মতো ভক্তি করত। গ্রামাঞ্চলে থাকলে ইংরেজ রামনিধিকে ধরতে পারত না। কাশীশ্বর নীলকরদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বন্ধু সেজে রামনিধিকে ধরিয়ে দেন।

এই আসল সত্য গ্রামের লোকেরা জানতে পারলে ভোটে কোনমতেই জিততে পারবেন না অম্বুজাক্ষ বাবু। তাই বিশ্বেশ্বর বাবুকে অনুরোধ করেন এই সত্য কথাকে চেপে দিতে। কিন্তু ইতিহাস পাগল মানুষ বিশ্বেশ্বর রায় তাতে রাজি নন। অরুণাক্ষের সঙ্গে ইরাবতীর বিয়ের প্রলোভন দেখিয়েও ব্যর্থ হন অম্বুজাক্ষ বাবু। ইরাবতীর সঙ্গেও বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে বাড়ি ফিরে যান অম্বুজাক্ষবাবু। এরপর গরীব ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর বাবু নিজের মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসেবে সমস্ত নথিপত্র তুলে দেয় অরুণাক্ষের হাতে। আত্মভোলা মানুষ বিশ্বেশ্বর রায়কে কাহিনীর মধ্যভাগে রেখে লেখক সমাজ-মানুষের সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন। ড. দীপক চন্দ্রের কথায় –

> "স্বাধীন ভারতের গণপ্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষ্য করে প্রার্থীরা পরস্পরের উদ্দেশ্যে পাঁক ছোঁড়াছুড়ি করে, বিভিন্ন অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা নিয়ে ব্ল্যাকমেল চলে – অম্বুজাক্ষ, সাধন মিত্তির, কৃতন্তকে অবলম্বন করে লেখক তার এক নিঁখুত হাস্যকর বাস্তবচিত্র এঁকেছেন। অজ্ঞ নিরক্ষর সমাজে গণতন্ত্রের ধাপ্পাবাজি অপর্যাপ্ত হাস্যরসের উপাদান – লেখক ক্ষুরধার ব্যঙ্গে, বিদ্রুপ তাই ব্যঞ্জনাময় হয়েছে।"[৪]

অম্বুজাক্ষের বাড়ি বয়ে এসে অসম্মান করে ফিরে যাওয়া এবং ইরাবতীর আত্মসম্মানবোধ ও উগ্র মেজাজের কারণে অরুণাক্ষের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে থাকে। আর্থিক অস্বচ্ছলতায় ইরাবতীরা কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে ওঠে। যা ইতিমধ্যে অর্থের বিনিময়ে করায়ত্ত করে নিয়েছে অম্বুজাক্ষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরাবতী ও অরুণাক্ষ পিতামাতার অজ্ঞাতসারে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। ফেরার পথে বর্ষণমুখর রাত্রে তারা আশ্রয় নেয় এক ডাকবাংলোর বারান্দায়। সেখানে ইরাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে শ্বশুর অম্বুজাক্ষ ও শাশুড়ি সুহাসিনীর। ইরার সঙ্গে তাঁদের অনুরাগসিক্ত কলহ এবং পরিচয়ের মধুবন্ধন। সমস্ত

প্রতিকূলতার সীমারেখা মুছে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মেয়েকে অম্বুজাক্ষ তার পুত্রবধূ বলে মেনে নিয়েছে। আর ইরার সান্নিধ্যে অম্বুজাক্ষের রাগ অভিভাবকত্বের আত্মশ্লাঘা মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে বাৎসল্যে।

'বৃষ্টি বৃষ্টি' উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিজস্ব স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল। শিক্ষিত ইরাবতী টিউশনি পড়ায় এ-বাড়ি, ও-বাড়ি। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তাদের নেই কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্যই চরিত্রটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বেশ্বর বাবুকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যাপারে সকলের মধ্যে কৌতূক প্রবণতা লক্ষ করে ব্যথিত হয়েছে ইরাবতী। সভাস্থল থেকে সকলকে একপ্রকার অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় কিংবা কাহিনীর শেষ অংশে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে প্রথম আলাপের মধ্যেও ইরার মেজাজের জন্যই চরিত্রটি আপন স্বতন্ত্রতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্র সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন —

> "বিশ্বেশ্বরের মেয়ে ইরাবতী সুন্দরী, রোমাণ্টিক এবং অতি তুখোর, উগ্র স্বভাবের — সাদা কথায় দজ্জাল বলাই ভালো। ... নায়িকার এই স্বভাবই তার শ্বশুর-শাশুড়িকে বশ করে ফেলল। নায়িকার ঝগড়ুটে তিরিক্ষি মেজাজ এবং নায়কের একটু ঘরকুনো গোটানো স্বভাব। সবমিলে হাসোজ্জ্বল রোমাণ্টিক কমেডি।"[৫]

উপন্যাসের নায়ক অরুণাক্ষ। প্রাথমিক পর্বে চরিত্রটির মধ্যে স্বতন্ত্রতা বজায় থাকলেও ইরাবতীর সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে ততই যেন ইরার প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে কুণ্ঠিত ও আত্মসংকুচিত হয়ে পড়েছে অরুণাক্ষ। বিশ্বেশ্বর রায় চরিত্রটি উপন্যাসের এক জীবন্ত চরিত্র। তাঁর লেখা গ্রন্থের উপর ওপর ভিত্তি করেই কাহিনী এগিয়ে গেছে। কখনো তাঁর লেখালেখি কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু লেখক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চরিত্রটিকে হাস্যস্পদ করে তুলেছে। অরুণাক্ষের পিতা অম্বুজাক্ষ চরিত্রটি অনেকটাই স্বার্থপর। ভোটে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কিংবা জয়লাভ করার জন্য যখন যাকে কাছে পেলে সুবিধা হবে বলে মনে করেছে, তারই কাছে ছুটে গেছে। কিন্তু লেখক মনোজ বসুর চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> "লেখকের আসল কৃতিত্ব চরিত্রসৃষ্টিতে নহে, পরিহাসরসসিক্ত ঘটনা বর্ণনায় ও প্রতিবেশ রচনায়। রাজনৈতিক ও সাংবাদিক গোষ্ঠীর হাল-চাল ও আত্মপ্রচারকৌশল সুনিপুণ, সরস অতিরঞ্জনের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। মোটের উপর উপন্যাসটি সুখপাঠ্য ও বর্ণনা কৌতূকে পরিপূর্ণ এবং ইহাই উহার প্রধান আকর্ষণ।"[৬]

সরস গুণের কারণেই উপন্যাসটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'বৃষ্টি বৃষ্টি' উপন্যাসের সূচনায় আমরা দেখি এক বর্ষণমুখর রাতে টিউশন পড়িয়ে ফেরার পথে ইরাবতী আশ্রয় নেয় এক বাড়িতে। যে বাড়িটি অরুণাক্ষের পিতা ডাক্তার অম্বুজাক্ষের। বাড়িতে তখন একমাত্র অরুণাক্ষ। এখানেই পরিচয় ঘটে নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ অরুণাক্ষের সঙ্গে ইরাবতীর। এই সাক্ষাৎই ঘটনা প্রবাহকে ত্বরান্বিত করেছে। ভোটে দাঁড়ানোর জন্য অরুণাক্ষের বাবা ছেলের বিয়ে ঠিক করেছে বন্ধুর মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। কিন্তু বিশ্বেশ্বর রায়কে কাছে পেতে সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে। এমনই ঘটনা প্রবাহের শেষে অরুণাক্ষ ও ইরাবতী বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর এক বর্ষণমুখর রাতে ইরাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শ্বশুর শাশুড়ির। কলহ বিবাদের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত অম্বুজাক্ষ ইরাবতীকে বৌমা হিসেবে মেনে নেয়। সমস্ত দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল বর্ষণমুখর রাতে। আবার ঘটনার সমাপ্তিও বর্ষণমুখর রাতে। তাই রোমান্টিক মিলনান্তক উপন্যাসের নামকরণ 'বৃষ্টি - বৃষ্টি' হয়েছে যথোপযুক্ত এবং সার্থক।

আমার ফাঁসি হল

বিভূতিভূষণের 'দেবযান' উপন্যাসের মত মনোজ বসুর 'আমার ফাঁসি হল' (১৯৫৮) উপন্যাসে প্রেতলোকের সঙ্গে মনুষ্য লোকের কথাবার্তা তথা অতি প্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। মনোজ বসুর 'ছায়াময়ী' গল্পই যেন সম্প্রসারিত হয়েছে 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসে।

নিছক ভূতের গল্পরস সৃষ্টির আকাঙ্খা থেকে 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসের পরিকল্পনা। ভূতের গল্পের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত রহস্যময় ঘটনার আস্বাদন। তবে এটি ভৌতিক পটভূমিকায় রচিত সামাজিক উপন্যাস। গল্পের নায়ক একটি উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। দাদা-বৌদি ও ভাইপো টুনুকে নিয়ে তার পরিবার। নিজের যোগ্যতায় সে সাব-রেজিস্ট্রারের চাকরি পেয়েছে বিরাট-গড় নামে এক অজ্ঞাত, অখ্যাত স্থানে। বৌদি জোর করে, চাকরিতে যোগ দেওয়ার পূর্বে বিয়ের জন্য। নায়ক এখনই বিয়ে করতে রাজি নয়। এক্ষেত্রে দাদা বলেন –

"চাকরি বসে থাকবে না তোমার খাসা মেয়ের খাতিরে।"[১]

বৌদির কথা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিরাটগড়ে গিয়ে সবার আগে পরিচয় ঘটে টোনির (মক্কেলের হয়ে অদ্বির-তদারক করে, কাজ হাসিলের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বাছবিচার নেই। এই হল টোনির ব্যবসা) কাজ করা দয়ালহরি হোড়-এর সঙ্গে। সে অতিশয় ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক। থানার দারোগাবাবুদের সঙ্গেও তার বেশ দহরম মহরম রয়েছে। দয়ালহরির স্ত্রী রুগ্ন। তার একটি মেয়ে কলকাতায় থাকত। এখন সে গ্রামে বাস করছে। মেয়েটির নাম লাবণ্য। মেয়েটি অতিশয় কুৎসিৎ। বসন্ত রোগে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।

উপন্যাসের নায়ক তথা সাবরেজিস্ট্রার বিরাটগড়ের যে বাড়িতে বাস করতেন সেই বাড়িটি বন্যায় ভেঙে পড়ে। তখন তার থাকার বন্দোবস্ত হয় বিরাটগড়ের একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদে যার নাম গোলাবাড়ি। এই গোলাবাড়িতে এক সময় থাকত একটি অবস্থাপন্ন পরিবার। তাদের ব্যবসা ছিল কাশ্মীরে। কাশ্মীরে গোলমালের কারণে তারা কাজ করবার গুটিয়ে দেশে অর্থাৎ বিরাটগড়ের গোলাবাড়িতে বসবাস শুরু করে। তাদের তিন মেয়ের বিয়ে। মাখন মিত্তির নামে একজন কর্মচারী বিয়ের দেখাশোনা করছে। দেশে তখন দাঙ্গা চলছে। মাখন মিত্তির টাকার বিনিময়ে দাঙ্গার নেতাদের শান্ত করার জন্য কলকাতা গেলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করল মাখন –

> "সাহেব-কর্তাকে বুঝিয়ে এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে মাখন মিত্তির বিয়ের দু-দিন আগে রওনা হয়ে গেল। ফিরবে নৌকায়, বরপক্ষকে সঙ্গে করে নিয়ে। বিয়ে-বাড়ির সকলে পথ তাকাচ্ছে। নৌকাও অনেকগুলো লাগল এসে ঘাটে। কিছু রাত হয়েছে। সেটা হবেই - পথ ঘাট দেখে বুঝে সামাল হয়ে আসতে হল। মশাল নিয়ে কন্যাপক্ষ বর এগুতে ছুটেছে। ওরে বাবা, এ কী কাণ্ড! সিংদরজা বন্ধ করে দেওয়া হল তাড়াতাড়ি। মানুষগুলোকে মেরে-ধরে, মশাল কেড়ে নিয়ে দরজার উপর টিন টিন কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাচ্ছে। সাহেব কর্তা দোতলায় গোলঘর থেকে দুড়ুমদাড়াম বন্দুক ছুঁড়ছেন। কিন্তু ওদিকে কোন কায়দায় আর একট দল ছাতের উপর উঠে পড়েছে। ভিতর থেকে তারা সিংদরজা খুলে দিল।"[২]

ডাকাতের দল সকলকে হত্যা করে চলে যায়। বাড়িসুদ্ধ সকলেই ভূত হয়ে এখানে বসবাস করছে। সেই বাড়িতে বাস করতে এলেন সাবরেজিস্ট্রার। জ্বর বিকারের মধ্যে একটি অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত প্রভাবের ফলে সাবরেজিষ্টারের সঙ্গে প্রণয় জন্মে লাবণ্যের। আসলে গোলাবাড়ির মারা যাওয়া তিন বোনের মধ্যে বড় মেয়ের নাম ছিল চম্পা। সে সাবরেজিস্ট্রারের

প্রতি আকৃষ্ট হয়। চম্পা নিজের প্রেম তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কুরূপা লাবণ্যের ওপর নিজের সৌন্দর্য আরোপ করতে থাকে। সাবরেজিস্ট্রার লাবণ্যকে সরূপা দেখে মুগ্ধ হন। সে উপযাচক হয়ে লাবণ্যকে বিয়ে করতে চায়। বিয়ে স্থির হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃত লাবণ্যকে দেখে মোহভঙ্গ হয় সাবরেজিস্ট্রারের। তখন সে এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু দয়ালহরি সাবরেজিস্ট্রারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলে –

> "বাজে কথায় কাজ নেই। ষষ্ঠীপুকুরের চেয়ে বেশি পছন্দ তোমায়। তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করব। সেই জোগাড়ে লেগে যাও।"[৩]

চাপে পড়ে লাবণ্যকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় নায়ক। বিয়ের পর শ্বশুরকে হত্যা করলে শাস্তি স্বরূপ নায়কের ফাঁসি হয়।

অতিপ্রাকৃত পরিবেশ রচনায় লেখকের নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। লেখকের পরিবেশনায় রোমান্স ও বাস্তবের সমন্বয় ঘটেছে। উপন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> "এই উপন্যাসের আকাশ বাতাসে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে একটি মৃদু বিস্ময় ও রহস্যবোধ পরিব্যপ্ত হইয়াছে - উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যেন স্বপ্ন জাগরণের মত একটি কুহেলিকার ব্যবধান। এই পরলোকরহস্যের উদ্বোধন ও যথাযথ বিন্যাসে লেখক প্রশংসনীয় সঙ্গতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন। ঘটনা, মন্তব্য ও অনুভব প্রকাশের ভাবসঙ্গতি এই অবাস্তব কাহিনীকে পাঠকের নিকট প্রত্যয়যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে ও কলাসংহতির প্রত্যাশা পূর্ণ করিয়াছে। প্রকৃত ও তৎপ্রাকৃত জগতের বিভিন্ন বায়ুস্তর লেখকের শিল্পনৈপুণ্যে বেশ স্বাভাবিক রূপেই মিশিয়া গিয়াছে।"[৪]

অতিপ্রাকৃত পরিবেশ রচনায় লেখকের নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে ভৌতিক প্রভাব ঘটনার স্বাভাবিকত্বকে ক্ষুন্ন করেছে। নায়কের পরিণতি মোটেই সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। একে যদি নায়কের কল্পনাবিকার বলে লেখক পরিচয় দিতেন, তাহলে উপন্যাসের স্বাভাবিকত্ব বজায় থাকত। লেখক তা না করে বরং স্পষ্ট ভাষায় ভূতের জগতের পরিচয় দিয়েছেন। তাই অতিপ্রাকৃত সংযোজনকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে ত্রুটি বলেই গণ্য করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাস সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা তুলে ধরা যেতে পারে –

> "শচীন্দ্রের মনোভাব- পরিবর্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতি প্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিয়াছে, বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ-প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্যাসের দিক হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটি অপরিহার্য ত্রুটি বলিয়াই ধরিতে হইবে।"[৫]

সুতরাং মনোজ বসুর 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসের এটি একটি ত্রুটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লেখক মনোজ বসু কাহিনীতে ভৌতিক ঘটনার পরিবেশন করলেও সমাজ সচেতনতায় চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসের নায়ক বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সাবরেজিস্ট্রারের চাকরি পাওয়ার আগে থেকেই নায়কের বৌদি বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে শুরু করেছেন। বৌদি বলেন –

> "চাকরি হচ্ছে না তো বিয়েটা হয়ে যাক। আমার এই বয়সে পৌঁছবার আগেই আমাদের বাড়ির সকলেই ছেলেমেয়ের বাপ। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু একটা মানুষ আধা সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াবে। তাই বা চোখ মেলে কী করে দেখা যায়! স্ত্রী ভাগ্যে ধন-চাকরি বাকরি এবং যাবতীয় সুখ-সৌভাগ্য আটকে রয়েছে শুধু একটি ভাগ্যবতী স্ত্রীর অপেক্ষায়।"[৬]

সাবরেজিস্ট্রারের চাকরি পেয়ে নায়ক বাড়ি ছাড়ে। বৌদি বিয়ের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেও লাভ কিছু হয়নি। চাকরি স্থলে পৌঁছে মোটামুটি সকলের সঙ্গে মিলেমিশেই সময় কাটিয়ে দিত। কিন্তু বন্যার পর বিরাটগড়ের পরিত্যক্ত গোলাবাড়িতে থাকার সময় থেকেই শুরু হয় বিপত্তি। দয়ালহরি হোড়ের কন্যা লাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন নায়ক। আসলে লাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মূল কারণ ভৌতিক প্রভাব। ভূত-চম্পা নিজের প্রেম তৃষ্ণা মেটাবার জন্য কুরূপা লাবণ্যের ওপর নিজের সৌন্দর্য আরোপ করে। নায়ক আসল সত্য না জেনেই দয়ালহরি মশায়কে বাসায় ডেকে বলেন –

> "আপনার মেয়ের বিয়ের কথা বলছিলাম। আমি অযোগ্য হয়তো! যদি অনুগ্রহ করে মানে দাদাই অভিভাবক আমার, কলকাতার ঠিকানা আপনার জানা আছে। আমার মত আছে জানলে তাঁদের দিক দিয়ে খুব সম্ভব আপত্তি হবে না। কিছুদিন থেকে ভাবছি কথাটা, যদি আপনি প্রস্তাবে রাজি থাকেন –"[৭]

লাবণ্যের আসল রূপ জানতে পেরে সাবরেজিস্ট্রার বিয়ে ভাঙার সকল রকম চেষ্টা করে। দয়ালহরি হোড়কে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় এবং বিয়ের যৌতুকের টাকাও দিতে চায় নায়ক। বলে –

> "পণের সেই সাত-শ টাকা আমি দিয়ে দেব। আরও পাঁচ-শ' না হয় এদিক সেদিকে খরচ বাবদ।"[৮]

অবস্থার বেগতিক দেখে বিয়ে করতে বাধ্য হয় নায়ক। কিন্তু বিয়ের পর দয়ালহরি হোড়কে বন্দুক দিয়ে গুলি করে। হত্যার শাস্তি স্বরূপ ফাঁসি হয় নায়কের। ফাঁসির অব্যবহিত পরে নায়ক নিজের নিস্পন্দ দেহটা লক্ষ্য করে বলে –

> "থুতু ফেলছি: থু:, থু:। থুতু পড়ে না তো মুখ দিয়ে! লাথি মারব ওই কুৎসিত দেহটার উপর, পায়ের ধাক্কায় দৃষ্টির আড়ালে সবার। ছুঁতে পারি নে, পায়ে স্পর্শ পাই নে। বায়ুভূত হয়ে গেছি।"[৯]

আলোচ্য উপন্যাসে এক ব্যর্থ প্রেমকাহিনীকে অতিপ্রাকৃত ঘটনার মাধ্যমে লেখক রোমান্সধর্মী আখ্যান ব্যক্ত করেছেন। দস্যুর হাতে আকস্মিক মৃত্যুতে নায়িকা চম্পার বিয়ের সাধ পূর্ণ হয়নি। গোলবাড়িতে সাবরেজিস্ট্রারের আগমন বিদেহী তরুণী চম্পার জীবনের প্রেমের সঞ্চার করে। মানুষের সঙ্গে প্রেমের লোভে মানুষের রূপ ধরে অতৃপ্ত জীবন পিপাসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে চম্পা। প্রেতপুরীতে শুধুই তৃষ্ণার হাহাকার। চম্পা তাই বলে –

> "কুৎসিত লাবণ্যের গায়ে গায়ে কতদিন ছায়া হয়ে ঘুরেছি। ...ওই মেয়ে যা নয়, তাই সাজিয়ে দেখিয়েছি। লোভে পড়ে করেছি - যদি দুটো ভালোবাসার কথা বল, যদি একটু ছোঁয়া দাও, একবার যদি আলিঙ্গনে বাঁধ।"[১০]

প্রেতলোকের অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে চম্পা। চম্পা আরও বলে –

> "মাংস চাই, রক্ত চাই, মাটির উপর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে চাই। বাতাস হয়ে ভেসে আর পারি নে।"[১১]

এছাড়াও থানার দারোগা, সরকারী ডাক্তার, মাখন মিত্তির, টুনু, টুনুর মা ইত্যাদি চরিত্রের পরিচয় স্বল্প পরিসরে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। দয়ালহরি চরিত্রটি কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছে। সে সুবিধাবাদী কৃপণ এবং অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির চরিত্র। প্রথম থেকে সাবরেজিস্ট্রারের প্রতি টান ছিল। ছিল না কোনো অভিসন্ধি। কিন্তু মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে

তার যে পরিবর্তন তা স্বাভাবিক। ভৌতিক আবহের মধ্যে চরিত্রটির সার্থকতা চোখে পড়ার মতো। এছাড়া নায়কের ফাঁসির সময় দাদা-বৌদি এবং ভাইপো টুনুর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনা কাহিনীর মধ্যে মানবিকত্ব সঞ্চার করেছে।

উপন্যাসে লেখক বড়দের উপযোগী ভৌতিক গল্প শোনাতে চেয়েছেন। শুরুতেই লেখক লিখেছেন–

"আমার ফাঁসি হল। রাত তিনটে, জীবন কাহিনী লিখছি।"[১২]

অর্থাৎনায়ক তার জীবনের করুণ পরিণতি পাঠক তথা আমাদের শোনাতে চেয়েছেন। সাধারণ বাঙালি হিসেবে জীবন-যাপন করতে গিয়ে চাকরি নেয়। চাকরির পরেই বিয়ে। বিয়ের জন্য অপরূপা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। বিয়ের প্রস্তাব। সবকিছুই স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর পরেই ঘটনার পরিবর্তন। চম্পার আবির্ভাব কাহিনীতে। যে একজন ভূত। সেই ভূতের কারণেই লেখকের জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। হয় ফাঁসি। সেই ফাঁসির কথা শোনালেন নায়ক 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসে। সেদিক দিয়ে উপন্যাসের নামকরণ সার্থক।

মানুষ নামক জন্তু

'মানুষ নামক জন্তু' (১৯৫৯) উপন্যাসটি স্বাধীনতার পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের এবং তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতির পটভূমিকায় রচিত। একদা এক সঙ্গে বসবাস করলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আজ ক্ষুন্ন হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয়েছে বিদ্বেষ-দাঙ্গা-হানাহানি।

হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি গোপেশ্বর ডাক্তার। গোপেশ্বর ডাক্তারের দুই মেয়ে দুর্গা ও তারা। স্ত্রী নির্মলা এবং জামাই নিরঞ্জন। মুসলমান সমাজের মধ্যে জবেদ মিঞা এবং তার পুত্র আমিনুর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। গোপেশ্বর ডাক্তারের সঙ্গে জবেদ মিঞার খুব ঘনিষ্ঠতা। যেখানে জাতি-বৈষম্য উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরাতে পারে না। গোপেশ্বর ডাক্তারের বড়

মেয়ে দুর্গা পড়াশুনায় বেশ ভালো। পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই তার বিয়ে হল নিরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন তখনও ছাত্র। শহরে থেকে পড়াশুনা করে।

গোপেশ্বর ডাক্তারের ছোট মেয়ে তারার সঙ্গে আমিনূরের খুব ভাব। তারা প্রায়ই যাতায়াত করে জবেদ-এর বাড়িতে। বড় মেয়ে দুর্গাও ওবাড়ি যাতায়াত করে। এদিকে দেশের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য দেখা দিয়েছে। শুরু হয়েছে দাঙ্গা আর খুনোখুনি। বেশিরভাগ মুসলমান চাষীর জীবিকা চাষবাস। কেউ বা জনমজুর খাটে। তাদের মধ্যে রব উঠেছে হিন্দু বাড়িতে কাজকর্ম করা চলবে না। নিরঞ্জনের বাবা হরনাথ স্বচ্ছল গৃহস্থ। পেশা তেজারতি। এক মুসলমানের জমি বন্ধক রেখেছিল হরনাথ। সময় মতো টাকা শোধ না দেওয়ায় হরনাথ সেই জমির অধিকার নেয়। কিন্তু মুসলমান সমাজের লোকেরা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে হরনাথকে মারধোর করে। অত্যাচারে হরনাথ মারা যায়। তখন নিরঞ্জন কলকাতায় আইন পড়ে –

> "বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সদর থেকে গোমস্তার টেলিগ্রাম এলো; বিষম বিপদ, এক্ষুনি চলে এসো।"[১]

বাবার মৃত্যুর পর নিরঞ্জন পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। সে গ্রামে বাবার মতো তেজারতি ব্যবসায় মেতে ওঠে। সেই সঙ্গে নারীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।

দুর্গার শরীর খারাপ। নিরঞ্জন নজর দেয় না। গোপেশ্বর ডাক্তার নিজে চিকিৎসা করবেন বলে দুর্গাকে বাড়ি নিয়ে আসে। দুর্গার ছোট বোন তারার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। তারার বিয়ে হয়ে গেলে গোপেশ্বর ডাক্তারের আর কোনো দায় থাকবে না। ডাক্তারি ব্যবসা ছেড়ে দেবেন। দেশ ছেড়ে তীর্থে বেরিয়ে পড়বেন। কাশীতে গঙ্গাতীরে ভগবানের নাম করে শেষ জীবন কাটিয়ে দেবেন। আর তা না হলে –

> "দক্ষিণে গিয়ে সুন্দরবনের বাদায় খান দুই ঘর তুলে সেইখানে থাকবেন। মানুষের মতিগতি যখন এই, মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার ভাল।"[২]

তারার বিয়ের প্রায় সব যখন স্থির; তখনই তারার ঠাকুমা মারা গেলো। বিয়েতে বাধা পড়ল। শ্রাদ্ধের সময় মেয়ে-জামাই অর্থাৎ নিরঞ্জন ও দুর্গা তিনটি বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

দেশের অবস্থা দিনকে দিন আরও খারাপ হয়ে পড়ল। দেখে মনে হয় দেশে সভ্য মানুষ নেই আর। জন্তু-জানোয়ারের কমড়াকামড়ি। সময়মত গোপেশ্বর হিন্দুস্থানের দিকে জমির দাম করে এসেছেন। এদিকে তারার রূপে নিরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তাই দুর্গার কথামত তারার সঙ্গে নিরঞ্জনের বিয়ে হয়েছে। তারার বিয়েতে আমিনূরদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি। শ্বশুর বাড়িতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ তারাকে স্টেশন থেকে কৌশল করে মুসলমান সমাজকে ফাঁকি দিয়ে অনেক ছল চাতুরি করে জবেদ বাড়িতে এনে তুলেছে। দেশ জুড়ে তখন দাঙ্গা চলছে। আখেজের কাছে ধরা পড়ে অপদস্থ হতে হয়েছে জবেদকে। তবুও জবেদ কিংবা আমিনূরের মধ্যে হিন্দু প্রীতি কখনো খর্ব হয়নি। অসুস্থ তারাকে দেখতে এসে দুর্গা তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। দুদিন পরে অসুস্থ তারা মারা গেল। তারার মৃত্যুর কারণ দুর্গা। গোপেশ্বর ডাক্তারের কথার উত্তরে দুর্গা বলেছে –

"সব ভাল হবে বলেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"[৩]

আসলে অন্য কারো সঙ্গে নিরঞ্জনের বিয়ে হলে তার ছেলেমেয়েরা অনাথ হত। তাই এই ব্যবস্থা নিয়েছিল দুর্গা।

তারার মৃত্যুর পর হিন্দু লোকজন কম বলে কাঠ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না শ্মশানে। মড়া শ্মশানেও নিয়ে যাওয়া হল না। কাঠের অভাবে তারার মৃতদেহকে কাপার (মৃতদেহ যাতে ভেসে না ওঠে সেজন্য মৃতদেহের সঙ্গে কাঠ বেঁধে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা) ব্যবস্থা হল, যাতে মৃতদেহ জলের ওপরে ভেসে উঠতে না পারে। ফেরার পথে শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হল আমিনূরের। সে মুসলমান হলেও নিজের সমাজকে লুকিয়ে কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল শ্মশানে তারার মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য। তার চেষ্টা বিফলে গেল। আমিনূর বাধ্য হল কাঠ নিয়ে ফিরতে । হিন্দুর উপকার করতে এল অথচ হিন্দু সমাজই তাকে সন্দেহ করেছে। হিন্দু-মুসলমান সমাজের রেষারেষিতে সে অন্তরে ব্যথিত হয়। সবার অলক্ষ্যে অন্ধকারে শৈশবের কথা মনে করে আমিনূর অশ্রু বিসর্জন করেছে।

দেশভাগের পূর্বেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিরোধ জেগে উঠেছিল। যদিও লেখক মনে করতেন এই বিরোধ চিরস্থায়ী নয়। দুই জাতির মধ্যে আবার মিলন ঘটবে। লেখকের এই মনোভাব সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন -

> "বন্ধুবর মনোজ বসু দুই প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে একপ্রকার নাড়ীর টান অনুভব করেন। এ শুধু আজ নয়, আজীবন। তাঁর লেখার সঙ্গে যারই পরিচয় আছে তিনি জানেন যে তিনি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি।"[৪]

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার গোপেশ্বর হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি। তিনি উদারপন্থি মানুষ। দুই জাতির মধ্যে বিরোধ তিনি বিশ্বাস করেন না। গোপেশ্বর দুই কন্যা দুর্গা এবং তারার মাধ্যমে লেখক জমেদ মিঞার পরিবারের সঙ্গে গোপেশ্বরের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ফুটিয়ে তুলেছেন। দুর্গা চরিত্রের মধ্যে কিছুটা হলেও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তারা চরিত্রটি ততটাই নিষ্ক্রিয়। নিরঞ্জন কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করলেও বাবার মতো তেজারতি ব্যবসার মাধ্যমে পয়সা রোজগার তার জীবনের লক্ষ্য। বাবার বুদ্ধিসুদ্ধিও সে ষোলআনাই পেয়েছে। মুসলমান সমাজের জবেদ মিঞা একটি উজ্জ্বল চরিত্র। গোপেশ্বরের অসুস্থ মেয়ে তারাকে কিভাবে স্টেশন থেকে বাড়ি আসবে এই ভেবে ডাক্তার এবং হিন্দু সমাজের মানুষ যখন ব্যতিব্যস্ত তখন নিজেদের শাস্তির কথা না ভেবে রাতের অন্ধকারে গোপনে জবেদ নিজের গাড়ি করে কৌশলে তারাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আমিনূর চরিত্রটির মধ্যেও মানবতা লক্ষ্য করা যায়। শুধু হিন্দু-মুসলমান নয় মুসলমানে মুসলমানেও বিরোধ ছিল। আখেজ জবেদ মিঞার বাড়ি ক্রোক করলে ডাক্তার গোপেশ্বর সেই বিপদ থেকে জবেদ মিঞাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বিবাদ মিটবার নয়, ভেতরে ভেতরে জ্বলতেই থেকেছে।

হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা ধর্মের নামে মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিজেদের জন্তুরূপে পরিচয় দিয়েছেন। পারস্পরিক স্নেহ-মায়া-মমতা-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে রাজনৈতিক চালে। মানুষের মনুষ্যত্ব বিসর্জনের কারণে জাতিগত বিরোধই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে জন্তু করে তুলেছে বলেই উপন্যাসিক নামকরণ করেছেন 'মানুষ নামক জন্তু'।

রক্তের বদলে রক্ত

'রক্তের বদলে রক্ত' (১৯৫৯) উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ডের বীভৎসতা দেখানো হয়েছে। নির্মম বাস্তবতাকে লেখক আবেগ দিয়ে রুখতে পারেননি। ইতিহাসকে স্বীকার করে সমস্যার সাহিত্যায়ন ঘটিয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে লাহোরে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড দেখা দেয়। লাহোর মুসলমানদের সেখানে হিন্দুদের কোন স্থান নেই। হিন্দুদের অস্তিত্বটুকুও যাতে না থাকে, তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল সেদিনকার পাকিস্থান সরকার। সেই মানসিকতা আজও লুপ্ত হয়নি তাদের শরীর ও মন থেকে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বিভক্ত-বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি লেখককে জিজ্ঞাসাকুল করে –

> "হাসতে গিয়ে হাঁ হয়ে যাই দেশ-বিভাগের গতিক দেখে।....নিরীহ গৃহস্থমানুষ হঠাৎ দেখে, দয়াদরদ ভরা চিরকালের প্রতিবেশীদের আর চেনা যায় না। বাসভূমি রাতারাতি ভয়াল অরণ্য – হিংস্র, জীবজন্তু চতুর্দিকে।... কত পরিবার বিনা অপরাধে উৎসন্ন হয়ে গেল। মানুষের ইতিহাসে এক অনপমেয় কলঙ্ক।"[১]

লেখকের মনে প্রশ্ন জাগে ? অথচ একসময় গলায় গলায় ভাব ছিল হিন্দু-মুসলমানের। তারা পরস্পরের সুখ দুঃখের সাথী ছিল। হিন্দুর প্রতিনিধি সুরেশ, মুসলমানের প্রতিনিধি হল লায়লা। এদেরই মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সেতু নির্মিত হয়েছে। নরেশ ও সুরেশ দুই ভাই। মা নবনলিনী সদ্য বিধবা। ডাক্তার নরেশ চা বাগানের চাকরিতে যোগদান করে। সেখানে পরিচয় হয় কামালউদ্দিনের ভাইঝি অমলার সঙ্গে। মুসলমান বলে অমলা সঙ্গে নরেশের বিয়েতে রাজি ছিলেন না নবনলিনী। বলেছেন —

> "সে হয় না। আমার বাড়িতে লক্ষ্মী-জনার্দন রয়েছে, বউ এনে এখানে তুলব কেমন করে।"[২]

অমলা জানিয়েছে, তার বাবা হিন্দু। সে কামালউদ্দিন দত্তের বাড়িতে পালিতা। তবুও বিয়ের পর নবনালিনী ছোঁয়া ছুঁয়ি থেকে দূরে থাকত। সবাইকে খেতে দিয়ে গঙ্গা স্নানে যেত। ফিরে এসে রান্না করে খেত। হিন্দু মুসলমানের এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির খেলায় অমলা অতিষ্ট হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল। দত্ত সাহেবের শরীর ভেঙে গেল। চা-বাগানও বিক্রি করে দিলেন। পরে নরেশ যোগদিল কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। কলকাতায় নরেশের বাড়িতে দত্ত সাহেবের আনাগোনা। একদিন অমলার মেয়ে ইরার কাপড় চোপড় ভেজা দেখে অমলা জানতে পারে যে শাশুড়ি নবনলিনী গঙ্গাজল ছিটিয়েছে। এই ঘটনা অমলার আত্মসম্মান বোধে আঘাত করে। সে স্বামীকে বলে —

> ''হিন্দু বল মুসলমান বল খ্রীষ্টান বল, সব ধর্মের ভিতরে গোঁড়ামি আছে। মানুষের চলাচল এতদিন গণ্ডির মধ্যে ছিল। জ্ঞানবুদ্ধি ছিল সংকীর্ণ। তারই জের চলেছে।''[৩]

অহরহ খিচখিচ। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে নরেশ। সেই থেকে লাহোরে চাকরিতে যোগ। কিন্তু এখন সেইসব লাহোরে বসবাসকারী হিন্দুদের তাড়াতে বদ্ধপরিকর লাহোর সরকার। নরেশ, অমলা ও তাদের সন্তান ইরা, নীরাকে নিয়ে পাকিস্থান থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। আব্দুল তাদের সাহায্য করেছে। মুসলমানেরা জানতে পেরে স্টেশনে তাকে মেরেছে। রক্ত পড়েছে আব্দুরের শরীর থেকে দরদর করে। শুধু তাই নয়, অমলা ও ইরা প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসতে পারলেও নরেশকে ও নীরাকে তারা খুন করেছে।

লাহোর মুসলমানের, হিন্দুরা সেখানে অপাংক্তেয়। তেমনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ল কলকাতা শহরে। হিন্দুরাও মুসলমানদের তাড়াতে বদ্ধপরিকর। লেখকের কথায় -

> ''মানুষ যেন হিংস্র জানোয়ার। ভুল বললাম, জানোয়ারও লজ্জা পেয়ে যায় হিংস্র মানুষের কাছে।''[৪]

কলকাতা শহর অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে পড়ল। তামিল মা, বউ আর ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বাস করে কলকাতার এক বস্তিতে। তাদের সঙ্গে থাকে ভাগনী লায়লা। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আঁচ বুঝতে পেরে বুদ্ধিমান লায়লা মামাকে সাবধান করেছে। বলেছে –

> ''সময় থাকতে ভেবেচিন্তে কিছু কর মামু। শেষটা কিন্তু পালাবার পথ পাবে না।''[৫]

লায়লার ভাবনাই সত্যি হল। মামার পরিবারের সকলকেই সাম্প্রদায়িকতার বলী হতে হল। লায়লা বেঁচে থাকল মনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন নিয়ে।

সুরেশ দাঙ্গার কবলে পড়া দাদা-বৌদি ও ভাইঝিদের খুঁজে পেতে ব্যস্ত। বৌদি ও এক ভাইঝিকে খুঁজে পেলেও দাদা এবং আর এক ভাইঝি নীরাকে পেল না। এদিকে লায়লা অসহায় হয়েও বুকের মধ্যে আক্রোশ পুষে রাখে। সুযোগ বুঝে নবনলিনীর বাড়িতে সে মিথ্যা পরিচয়ে বাস করে। জনতার গর্জন ওঠে —

> ''কোথায় আছে বের কর। নখের বদলে নখ, দাঁতের বদলে দাঁত। রক্তের বদলে রক্ত।''[৬]

লায়লা তার নানী, মামা ও একফোঁটা নিষ্পাপ নীলুফারকে যারা মেরেছে; তাদের মেরেই মরতে চেয়েছিল। কিন্তু চরম মুহূর্তে তারও মতের পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দু বিদ্বেষী লায়লা ও মুসলমান বিদ্বেষী নবনলিনী পরস্পরের সান্নিধ্যে উভয়ে বিদ্বেষ ভুলে গেছে এবং মিলন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে তারা। এখন মনে হয়েছে হত্যার পরিবর্তে বাঁচার গরজটাই বেশি। লায়লা তাই শেষে বলেছে –

> "কাপুরুষ আপনারা – মানুষে মানুষে তফাত হবার কথা গলা ফাটিয়ে যারা প্রচার করেন। চুড়ি পরে আপনারাই অন্দরে ঢুকে পড়ুন। মানুষে যেন মুখ না দেখে। মানুষ সোয়াস্তিতে থাকুক, মানুষ বাঁচুক।"[৭]

শেষপর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বন্ধনেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

লেখক মনোজ বসু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে 'রক্তের বদলে রক্ত' নামক উপন্যাসটি লিখেছেন। আপন বিশ্বাসের সঙ্গে কাহিনীর মিলন ঘটেছে বলে চরিত্রগুলি স্বল্প পরিসরে হয়েছে প্রাণবন্ত। অমলার কাকা কামালউদ্দিনের নির্মল নিষ্পাপ পবিত্র স্নেহ ভালবাসাকেও গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করতে চেয়েছে নবনলিনী। নবনলিনীর সনাতন আচার সংস্কারের বিরুদ্ধে অমলার আত্মমর্যাদাবোধ উপস্থাপন করে লেখক বাস্তব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। নবনলিনীর ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে অমলার মানবিক প্রশ্ন —

> "তার চাচা নিচু এদের চেয়ে কোন বিচারে ? - যে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র হতে হবে চাচার ভালবাসার পাত্রদের।"[৮]

অমলা ও নবনলিনীর মধ্যে অঙ্কুরিত সমস্যাই পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজ তথা জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। নরেশ ডাক্তারের মেয়ে ইরার মধ্যেও প্রতিশোধ স্পৃহায় জাগ্রত হয়েছে। সে কাকাকে লায়লার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বলেছে। অন্যদিকে সুরেশ ও লায়লা চরিত্র দুটি উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "এখানে চরিত্র গৌণ, ঘটনারোমাঞ্চই মুখ্য, যাহারা নিষ্ঠুর হত্যার বলি, তাহাদের আর চরিত্র স্বাতন্ত্র্যস্ফুরণের অবকাশ কোথায় ? হিন্দু পক্ষে সুরেশ ও মুসলমান প্রতিনিধি লায়লা এই দুইজনই রক্তস্রোতের উর্ধ্বে একটি মিলনভূমি -রচনার প্রয়াস পাইয়াছে। এই দুইটি চরিত্রই যাহা কিছু জীবন্ত হইয়াছে।"[৯]

লায়লার প্রতিহিংসা পরায়ণতা পরিবর্তিত হয়েছে মানবপ্রীতিতে। সুরেশের মধ্যে আবার প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা কখনোও পরিলক্ষিত হয় না। স্বল্প পরিসরে চরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত পরিচয় উপন্যাসে সেভাবে ফুটে ওঠেনি।

হিন্দু-মুসলমান এক সময় পাশাপাশি বসবাস করেছিল। একসঙ্গে হোলির রং মেখেছে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের মানসিকতার। লাহোরে হিন্দুদের যেভাবে মেরে ফেলা হচ্ছিল ঠিক সেভাবেই হিন্দুরাও বসে নেই। কলকাতার রাজপথে হিন্দুরাও মুসলমানদের হত্যা করেছে। একদল রক্তপাত শুরু করেছে অন্যদল রক্তপাতের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের দুই প্রতিনিধি সুরেশ ও লায়লার আন্তরিকতাই সম্প্রীতির বীজ বপন করল। রক্তপাতই জীবনের শেষ কথা নয়, ধ্বংস নয় সৃষ্টিই জীবন, তাই প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের অন্তিমে। রক্তের বদলে মানবিকতাই প্রাধান্য পেল। তাই উপন্যাসের নামকরণ 'রক্তের বদলে রক্ত' হয়েছে সার্থক।

রূপবতী

মনোজ বসু 'রূপবতী' (১৯৬০) উপন্যাসটি এক সুন্দরী দরিদ্র মেয়ে রাধারাণীর বীভৎস আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী। অদৃষ্টের কাছে পরাজয়ের সার্থকরূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই সামাজিক উপন্যাসে।

'রূপবতী' উপন্যাস রচনার পরিকল্পনার পেছনে ছিল লেখকের এক স্মৃতিময় অতীত। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন –

> "এতে একজন জানা মহিলার জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। পাড়ায় বদনাম ছিল তার; অন্য সকলের মত লেখকও ছোটবেলায় তাকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। আকস্মিকভাবে একদিন জানতে পারলেন তার অজ্ঞাত জীবনরহস্য। নিয়তির বিরুদ্ধে সে প্রাণপাত লড়াই করেছে। কিন্তু জিততে পারেনি। পঙ্ককুণ্ড থেকে মুক্তি ঘটল না তার জীবন। লেখক-মন করুণায় ভরে উঠল। মমতা-মাখানো অনুভূতির নিবিড়তায় সেই মহিলা রাধারাণী রূপে কবিমানসে জন্ম নিয়েছে।"[১]

'রূপবতী'র কাহিনী পরিবেশনে স্মৃতি চারণার ঢঙটি অক্ষুন্ন। রাধারাণীর করুণ মৃত্যুতে লেখকের অন্তর আলোড়িত হয়েছে। Flash back (পশ্চাদেক্ষণ)-এ স্মৃতি রোমন্থণ করে লেখক রাধারাণীর অদৃষ্ট - নিপীড়িত জীবনের গল্প শোনালেন।

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত' কবিতার মত 'রূপবতী' উপন্যাসের শুরুতে শূণ্য গ্রামের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামের নাম কাপাসদা। গ্রামের দীঘির উত্তরপাড়ের কামারপাড়াটা টিমটিম করছে কোনরকমে। লেখকের কথায় –

> "কামারশালা তো এখনই গেছে। লোহা পেটানোর শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষ সবাই ওপারে। আছে গোটাগতক বুড়োবুড়ি শ্মশানের দিকে তাকিয়ে।"[২]

আজ চাঁপাতলার বাঁধানো ঘাট জনশূণ্য হলেও হিন্দুস্থান পাকিস্থান রূপে আত্মপ্রকাশ করার আগে এই গ্রামের গৌরব ছিল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় চাঁপাডাল স্বর্ণচাঁপায় পরিণত হত। এই গ্রামেরই অপরূপা সুন্দরী মেয়ে রাধারাণী। মেয়েটির রূপই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর মামা বাড়িতে থাকার সময় সে তার মামাতো বোনেদের বিয়ের বাধা হয়েছে। এক ধনী ঘরের নপুংসক মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর তার দাম্পত্য জীবন আরো বিড়ম্বিত হয়েছে। হঠাৎ নৌকাডুবিতে রাধারাণীর স্বামী গোবিন্দের অপমৃত্যু ঘটেছে। গোবিন্দের মৃত্যুর খবরে মুরারী উকিলের বোন অপর্ণা স্থির থাকতে পারেনি, —

> "রাধারাণীকে জড়িয়ে ধরে অপর্ণা হাউ-হাউ করে কাঁদে। রাধারাণীর চোখে জল নেই, যেন সে পাথর।"[৩]

গোবিন্দের ছোটভাই মুরারী নামকরা উকিল। মুরারী উকিলের স্ত্রী ছবি আঁতুড় ঘরে গেল; সুযোগ বুঝে সে যাতায়াত শুরু করে রাধারাণীর ঘরে। রাধারাণীর সতীত্ব নাশ করেছে। মুরারি উকিলের লাম্পট্য মানসিকতা রাধারাণীকে দ্রুত সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। রক্তপিপাসু নেকড়ের মতো রাধারাণীকে সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। অথচ মুরারী উকিলের মা তারকেশ্বরী দেবী রাধারাণীকে দোষী শাবস্ত করে গালাগালি দেয়। বাধ্য হয়ে রাধারাণী ভদ্র আশ্রয়ের খোঁজে শ্বশুর বাড়ি ত্যাগ করে। কিন্তু সে আশ্রয় খুঁজে পায়নি। সব জায়গাতেই তাকে পেটের ক্ষিদে মেটাতে দেহ বিক্রি করতে হয়েছে। সে তার মামার বাড়িতে স্থান না পেলেও মামতো বোনের অবৈধ ছেলের মাতৃত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু সন্তানকে নিয়ে সে যখন দেশে ফিরে এসেছে

তখন তার ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরুপায় আত্মসমর্পণের গ্লানি রাধারাণীর মনে অগ্নিদাহের সৃষ্টি করে। তাই সে –

> "দীঘির ঘাটে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। মা গঙ্গা, পতিতপাবণী সনাতনী, গা জ্বালা করছে, জুড়িয়ে দাও। পাপের পুঞ্জরক্ত থিক থিক করছে সর্বদেহে, সাফাই করে দাও।"[৪]

আরতির অবৈধ সন্তান এসে তার সৎ জীবন যাপনের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দেয়। কাশীতে খোকার মাষ্টারের বেতন কিংবা বাড়িওয়ালার - বাড়িভাড়া মিটিয়েছে দেহ বিক্রি করে। শেষপর্যন্ত কাপাসদা গ্রামের খেলার সঙ্গী হীরকও ডাক্তারির ফি মিটিয়ে নিয়েছে রূপবতীর দেহ থেকে। যেন একটা ভাণ্ডার থেকেই সব এসেছে। রূপবতী রাধারাণীর দুঃসহ জীবনের বেদনা সম্পর্কে হার্ডির মত –

> "The women pay her debt not by what she does but what she suffers"[৫]

এখানে সমাজ নয়, মানুষের তৈরী পরিবেশই রাধারাণীকে দুঃখজর্জর জীবনে ঠেলে দিয়েছে।

পালিত পুত্র দীপকের কাছে নিজের কলঙ্কিত ইতিহাস ঢাকবার চেষ্টায় তাকে আরও বেশি বিব্রত হতে হয়েছে। দীপককে নিজের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার অদৃষ্টের কোন পরিবর্তন হয়নি। সে কুৎসিত রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে। সকলের অবহেলা ও ধিক্কারের মধ্যদিয়ে রাধারাণী আত্মবিসর্জন করে।

রাধারাণীর জীবন সমস্যাবহুল। বিয়ের আগে সে ছিল মামাতো বোন আরতির বিয়ের বাধা, মায়ের দুশ্চিন্তা, মামার গলগ্রহ, শান্তিলতার ঈষার পাত্র। তারপর সব খুইয়ে যখন বিধবা হয়ে এল তখন সে হয়ে উঠল সন্ধ্যার চক্ষুশূল আর মামা-মামীর ঘৃণার পাত্র। নিয়তির বিরুদ্ধে সে প্রাণপাত লড়াই করেছে। কিন্তু জিততে পারেনি। পঙ্ককুণ্ড থেকে মুক্তি ঘটল না তার জীবনে। ব্যঙ্গে-বিদ্রুপে-শ্লেষে এক অপূর্ব বাস্তব জীবনধর্মী সাহিত্য হয়ে উঠেছে 'রূপবতী' উপন্যাসটি।

রাধারানীর একাকিত্ব ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মাংসলোভী নর পশুরা চুপিসারে আসে রাতের অন্ধকারে। তাদের সাধুতার ছদ্মবেশ, মুখোশ-পরা ভদ্রতাকে ব্যঙ্গ করে রাধারাণী বলে–

> "আমি তো নষ্ট মেয়েমানুষ। নিজের ঘরে দোর দিয়ে ঘুমোচ্ছি। তোরা সব দিনমানের ঋষিপুত্তুর। রাতে এসে ভূতের উৎপাত লাগাস। গোবর-জল ছিটিয়ে সে কূল পাই নে সকালবেলা।"[৬]

উপন্যাসের কাহিনীতের রাধারানীর মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তার অহসায়তা যেন অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। স্বামীর ভাই মুরারির কাছে তার আত্মসমর্পণ বিশ্বাস করা যেতে পারে। কেননা পরিবারের কর্তা-ব্যক্তি এবং তার হিতাকাঙ্খী অভিভাবকের অপ্রত্যাশিত আচরণ তাকে স্তম্ভিত করেছে। তাই আত্মরক্ষা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু যখন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মুরারি ও তাঁর মা তারকেশ্বরী দেবী শশুরবাড়ি থেকে রাধারাণীকে বের করে দিয়েছিল তখন কেন রাধারাণী প্রতিবাদ করেনি তা বোঝা যায় না। তীব্র প্রতিবাদের পরিবর্তে সে শশুরবাড়ি ছেড়েছে। নিজের জীবনের কথা কাউকেই না জানিয়ে গ্রহন করেছে পতিতাবৃত্তি। শেষে চরম পরিণতি মৃত্যু। যদিও দেহ বিক্রিতে তার কোন অনিহা ছিল না। যখন সে সৎ পথ ছেড়ে অসৎ পথে পা দিয়েছে, তখন সমাজের উৎপীড়ন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার কেন রইল না তা বোঝা যায় না। সে নিজেকে গণিকা জগতের শ্রেষ্ঠ করে তুলতে পারত। তা সত্বেও সে কেন গৃহ জীবনের দিকে তাকিয়ে সকলের অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্রী হয়ে থাকল তাও আমাদের বোধগম্য হয় না। এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> "সে গার্হস্থ্য আস্থাকুঁড় আঁকড়াইয়া থাকিয়া আপনাকে সর্বসাধারণের অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্রী করিয়াছে। তাহার অন্তররহস্যের এই অসঙ্গতি আমাদের বিশ্বাসবোধকে পীড়িত করে। পরিবার ও সমাজচিত্র অঙ্কণে লেখকের যথেষ্ট পটুতা আছে, কিন্তু তাঁহার রূপবতী নায়িকার মনস্তত্ব অনেকটা সংশয়াচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে।"[৭]

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুরারি উকিল এবং কাপাসদা গ্রামের ছেলে ডাক্তারি পাশ করা হীরককান্তি। মুরারি উকিল বৈমাত্রেয় দাদা গোবিন্দের অক্ষমতার কথা জানা সত্ত্বেও নিজের কামনার পাত্র করার জন্যই হয়তো রাধারাণীকে তাঁর বাড়িতে এনেছিল। তারকেশ্বরীর কথাতে সেরকমই ইঙ্গিত রয়েছে —

"ওই তো যত নষ্টের গোড়া। দেখেশুনে পছন্দ করে কালসাপিনী ঘরে এনে তুলল। কুল মান সবসুদ্ধ যায় এখন। লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রাখল না।"[৮]

এমনকি রাধারাণীর স্বামী গোবিন্দের মৃত্যুর জন্যও হয়তো মুরারি উকিলই দায়ী। মুরারি উকিলের লাম্পট্য কিংবা দাদার হত্যার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল অর্থের কাছে। বাইরের কেউ জানতেও পারল না রাধারাণীর জীবনের করুণ পরিণতির জন্য আসল দায়ী কে ? সৎ ও ভদ্র জীবন কাটালো মুরারি উকিল।

ডাক্তারি পাশ করা হীরককান্তির ছোটবেলার একমাত্র সাকরেদ ছিল রাধারাণী। গ্রামের বিভিন্ন কথা নিয়ে উভয়ের মধ্যে চলত ঠাট্টা-তামাসা। কিন্তু রাধারাণীর বিবাহ পরবর্তী জীবনের কুকীর্তির কথা শোনার পর হীরককান্তিই হল রাধারাণীর সবচেয়ে পড় শত্রু। কুৎসা করতেও শোনা যায় হীরককান্তিকে। পরে স্ত্রীর কথা মত হীরককান্তি রাধারাণীর পালিত ছেলে দীপকের চিকিৎসা করতে গিয়ে রাধারাণীর দেহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আসলে মুরারি উকিল, হীরককান্তিরা ভদ্র সমাজের লোকজন। তাদের কামনার পরিতৃপ্ত করার জন্যই যেন রাধারাণীদের মত অসহায় দরিদ্র সুন্দরী মেয়েদের জন্ম। যাদের সমাজ নামদের গণিকা। এছাড়াও রাধারাণীর মা মনোরমা, মামিমা শান্তিবালা, মামাতো বোন আরতি প্রমুখ চরিত্রগুলি স্বল্প পরিসরে পাঠকের মনযোগ আকর্ষণ করেছে।

নারীর রূপ ও যৌবনই যে রাধরাণীর করুণ পরিণতির কারণ তাই দেখিয়েছেন মনোজ বসু তাঁর 'রূপবতী' উপন্যাসে। লেখক 'রূপবতী' নামের মধ্যদিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ও শানিত মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। কাপাসদা গ্রাম ত্যাগের পর রাধারাণীর রূপই তাঁর জীবনযন্ত্রণার জন্য দায়ী। রূপের কারণেই হয়তো স্বামীকে অকালে চলে যেতে হয়েছে। কেননা, স্বামী গোবিন্দ বেঁচে থাকলে মুরারী উকিলের মত লম্পট চরিত্রের লোকেদের স্বার্থসিদ্ধি হবে না। আবার যে মামা-মামী একসময় রাধারাণীকে সভ্য সমাজে স্থান দেয়নি, তারাই মেয়ের অপকর্মের ফলে জাত সন্তানকে রাধারাণীর হাতে তুলে দিয়ে তার জীবনকে আরও দুর্বিসহ করে তোলে। দুজনের পেট চালাতে এবং ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে নিজের দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে রাধারাণী। কিন্তু কেনই বা ঘটবে এমন পরিণতি। এ দায় কী শুধু রূপবতী রাধারাণীর ? না-কী সভ্য সমাজের মুখোশধারী সভ্য ব্যক্তিদের ? লেখক মনোজ বসু তারই উত্তর খোঁজার জন্য নাম দিয়েছেন 'রূপবতী'।

বন কেটে বসত

বাদা অঞ্চলের অরণ্য পরিবেশের ইতিহাস কেন্দ্রিক কাহিনী নিয়ে রচিত 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) উপন্যাস। বাদা অঞ্চলের অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনরীতি, জীবিকা, গোষ্ঠীগত বিশ্বাস, সংস্কার, আচার- আচরণ এবং তৎসম্পর্কিত বিশ্বাসযোগ্য নানা আধিভৌতিক গল্প স্থান পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি নিতান্ত পরিচয়হীন অরণ্যচারী মানুষদের সংস্কারহীন প্রেম-ভালবাসা, রাগ-অনুরাগ ও দ্বেষ-বিদ্বেষ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যে অঞ্চল বাংলাদেশের হলেও অধিকাংশ বাঙালির অজানা, যে চরিত্রদের সম্পর্কেও শিক্ষিত বাঙালি সম্পূর্ণ অজ্ঞ – তাকেই মনোজ বসু তাঁর উপন্যাসের পরিধিভুক্ত করেছেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গগন। উপার্জন কম বলে সে স্ত্রী বিনোদিনী ও বিধবা বোন চারুবালার কাছে তাড়া খেয়ে ভাগ্যের অন্বেষণে চেনা জানা গণ্ডির পথ ধরে এসেছে শহরে, শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে। সেখানে আলাপ হয় সুন্দরবনের হাতুড়ে ডাক্তার মনোহরের সঙ্গে। তিনি গগনের কাছে বাদাবনের গল্প করেন। একদিন বেঁচে থাকার তাগিদে তাঁকেও সুন্দরবনে হাজির হতে হয়েছিল।

> "মনোহর যখন গিয়ে বসতি পত্তন করে , সে কী অবস্থা! বাঘের ডাক শোনা যেত, সন্ধ্যা হলে বউকে ছেড়ে দাওয়ায় বেরোনোর জো নেই, বউ কেঁপে মরে। এখন লোকজনে গমগম করে মনোহরের ডাক্তারখানা। দিন পাল্টে গেছে।"[১]

মনোহর এখন বাদাবনের ডাক্তার হয়ে দিন পাল্টানোর স্বপ্ন দেখেন। আশা নির্জন কুমিরমারি হয়ে উঠবে বাদাবনের কলকাতা। আর এই বনধ্বংস মানুষের হাতে এনে দেবে অঢেল টাকা। কিন্তু শহর সমৃদ্ধ বহুল হলেও লেখকের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায় শহরের প্রতি। শহুরে পরিবেশে গগনের কাজের চেষ্টাকে সমর্থন করতে পারেননি লেখক। সেই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বাদাবনের ডাক্তার মনোহরের বক্তব্যে –

> "শহর আর শহর –ওই তো মরণ হয়েছে মানুষের।ঝাঁকে ঝাঁকে শহরে এসে মরবে আলোর পোকার মতন। বলি, আছে কি শহরে ? গাদা গাদা পোড়া ইঁট – রসকষ যা -কিছু হাজার লক্ষ মানুষ আগে ভাগে শুষে মেরে দিয়েছে। বাদুড়চোষা আমের আঁটি দেখেছ, সেই জিনিস।"[২]

শহরকে শুষে নেবার আর কিছু বাকি নেই। কিন্তু বাদাবনে আছে অঢেল সম্পদ। তাই অবশেষে মনোহর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার হবার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে গগন গিয়ে পড়ল বাদাবনে। মনোহর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী থেকে স্বাধীনতার প্রত্যাশায় গগন হাতুড়ে ডাক্তারী শুরু করে। মনোহর

ডাক্তার বাদাবনে ব্যবসা জমিয়ে নিলেও গগন ডাক্তার হিসেবে ব্যর্থ হয়। আহারের সংস্থান করতে পারে না। তাই সে বুনো যুবক জগার পরামর্শ মেনে নেয়।

> "তুমি বিদ্যান মানুষ – উঁ। ডাক্তারী করছ, বিদ্যে অঢেল নিশ্চয়। তাহলে চল আমাদের সঙ্গে বয়ারখোলার আবাদে। আরও নাবালে। বাদাবনের মুখে। ডাক্তারী ছাড়ান দিয়ে গুরুগিরিতে লেগে যাও। ভাল গুরু পেলে পাঠশালা বসিয়ে দেব।"[৩]

ডাক্তারিতে ইস্তফা দিয়ে গগন এখন বয়ারখোলা পাঠশালার গুরুমশায়। যেখানে গগনের পাঠশালা, একদা সেখানে ছিল ঘন জঙ্গল। বাঘের আক্রমণে সেখানেই প্রাণ দিয়েছে জনৈক 'হাড়ো সর্দার'। বিদ্যাভ্যাসের পরিবর্তে বনের দেশে পাঠশালা হয় বড়দের আড্ডাখানা। কিন্তু এই নির্দয় গুরুগিরিও গগনের কপালে সয় না। আবাদের সময় এলে ছেলেরা পান্তা ভাত নিয়ে যায় বাপ-কাকার জন্য, অবসরে গরু-ছাগল চরায়। স্বভাবতই পাঠশালায় আর ছাত্র নেই। গুরুকে অপেক্ষা করতে হবে কবে আবার ঘরে ফসল উঠবে।এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে গগনকে আরেক অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়াতে হবে।

'বন কেটে বসত' মূলতঃ বাদাবনের ভাগ্যান্বেষী মানুষদের কথা। সুন্দরবনকে নিংড়ে নিয়ে যারা জীবনের রসদ জোগাড় করেছে। প্রথমদিকে সুন্দরবনে আসা মানুষদের প্রতিনিধি কাঙালিচরণ চক্রবর্তী।

> "গোড়ায় রসুয়ে বামুন হয়ে এসেছিলেন বনকরের এক কর্মচারীর সঙ্গে। মাইনে থেকে কিছু টাকা জমিয়ে ঘেরির বন্দোবস্ত নেন। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও নিজে ডিঙি বেয়েছেন, ভেসাল জাল টেনেছেন। হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল এই সমস্ত কাজে। প্রাণ হাতে করে এত দুর্গম অঞ্চলে ক'জনই বা আসত তখন। জনালয়ের বহুদূরে দুর্দান্ত নদীকূলে ক্রোশের পর ক্রোশ জঙ্গলে -ভরা জমি। জোয়ারবেলা জলে ভরে যায়, ভাঁটার জল সরে গিয়ে কাদার সর পড়ে। বড় বাদা থেকে হরিণের পাল বেরিয়ে গাছের ঝরা পাতা ও কচি ঘাস খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়। দিনের পর দিন এমনি কাটত। কাঠ ও গোলপাতার নৌকা মাঝে মাঝে মন্থরভাবে ভেসে যেত জঙ্গলের পাশ দিয়ে। মোম-মধু ভাণ্ডার মউলরাই শুধু মরশুমের সময় ডাঙায় উঠে ছুটোছুটি করত অন্য কেউ বড় একটা নৌকো থেকে নামত না।
>
> কাঙালিচরণ খাজনা করে নিলেন ছিট-জঙ্গলের হাজার খানেক বিঘে। সেলামি নেই – মাংনা দিলে কেই নিতে চায় না, তার আবার সেলামি। খাজনাও নামে মাত্র- বিঘে প্রতি ছ-আনা আট-আনা। তাও আপাততঃ নয়, বছর পাঁচেক পরে জমাজমি কারকিত হয়ে যাবার পর। এমনি অবস্থায় কাঙালিচরণ এক হাজার বিঘে জমি নিয়ে বাঁধবন্দি করতে লাগলেন। লোকে নানান কথা বলে, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে — মরে তাঁতি গরু কিনে।' হাঁড়ি ঠেলে চক্কোত্তিঠাকুর কটা টাকা গেঁথেছিল,

> জঙ্গল গ্রাস করে নিল সে টাকা। জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়ে চক্কোত্তি ধান চাষের ব্যাপারে গেলেন না অন্য দশজনের মত। মাছ জন্মাতে লাগলেন। চৈত্র -বৈশাখে বাঁধ কেটে নদীর জল তুলে দাও ঘেরির খোলে। নোনা জলের মাছ উঠল – ভেটকি, ভাঙন, পারসে, চিংড়ি। বাঁধ বেঁধে ফেল তারপর। মাছ বড় হচ্ছে এবং বিক্রিও হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। পৌষ- মাঘ নাগাদ ঘেরি শুকিয়ে খট-খট হয়ে যাবে, দুটো-চারটে খানাখন্দে কিছু জল — তারমধ্যে অল্পস্বল্প বাছাই মাছ রেখে দেবে বড় করবার জন্যে। ব্যবসায়ের মজা হল, যা কিছু পাওনা-গণ্ডা কটা মাসের মধ্যে ষোলআনা হাতে এসে যাচ্ছে। 'কয় শুভঙ্কর মজুৎ গোনো' – নিজ হাতে সর্বরকমের কাজ করে ঘাঁতঘোত বুঝে নিয়েছেন, নামই হয়ে গেছে মেছো চক্কোত্তি। গোড়ায় যারা টিপ্পনী কাটত, দেখাদেখি তারাও অনেক জঙ্গল জমা নিয়ে ঘেরি বানাচ্ছে। কিন্তু মেছো– চক্কোত্তির কাছে দাঁড়াতে পারে না। আগে যারা একবার জমিয়ে বসে যায়, পরবর্তীকালে এসে তাদের ওপর টেক্কা মারা দায়। একটা বিশেষ অসুবিধে – অন্ততঃ পক্ষে আটটা বাজবার আগে, ফুলতলায় মাল পৌঁছে দেওয়া । সেটা হয়ে উঠল না তো ফুটতলার বাজারে দু-আনা সেরেও মাছ বিকোবে না। পচা মাছ নদীর জলে দিয়ে বোঝা খালাস করতে হবে। কাঙালিচরণ একেশ্বর হয়ে ছিলেন অনেকদিন – বোঝা বোঝা পচা মাছ গাঙে ঢেলে দিয়েও চক-মেলানো প্রকাণ্ড বাড়ি তুলেছেন ফুলতলা শহরের উপর, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, মেয়েদের ভালো বিয়ে থাওয়া দিয়েছেন, ছেলেপুলে ইস্কুল-কলেজে পাঠিয়েছেন, একটা দুটো পাশও করেছে কেউ কেউ।"[৪]

প্রকৃতি রাজ্য সবার জন্য উদার এবং উন্মুক্ত; অপেক্ষা শুধু চলে আসার। প্রকৃতির সন্তান জগন্নাথ বা জগার মুখে তা ধরা পড়েছে —

> "খুঁটোয় বাধা গরু তোমরা। ভিটে বেড় দিয়ে চক্কোর মার। আরে, বেরিয়েছ তো আমার কেন সেই খোপে ফিরবে ? ডাঙা রাজ্যে মানুষ কিলবিল করে। জায়গা-জমি, টাকা-পয়সা সকলে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে।... বুদ্ধি শোন বড়দা, ডাঙার দেশ নয় – ভাঁটি ধরে তরতর করে নেমে যাবে গাজির নাম নিয়ে।... কত বড় দুনিয়া! মানুষজন এখনো সেই দিকে জমতে পারেনি — তুমি গেলে তুমিও দিব্যি জমিয়ে নেবে। ভাত কাপড়ের ভাবনা ভাবতে হবে না।"[৫]

শিক্ষকতার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে কপর্দকশূণ্য গগনের একমাত্র ভরসা জগা-র আশ্বাস বাণী। মেছোঘেরির সন্ধানে গগনের নতুন যাত্রা শুরু। প্রবল প্রসার করে নেওয়া চৌধুরীদের ঘেরির কাছাকাছিই গগন তৈরি করতে লাগল নতুন ঘেরি। মাটি কেটে 'আলা' বানানো হল, দেওয়া হল বাঁধ। বনের গোলপাতা দিয়ে তৈরী হল 'আলাঘর' অর্থাৎ মেছোঘেরির দপ্তর।

এই ঘেরি পত্তনের সূত্র ধরেই উপন্যাসে উঠে আছে সুন্দরবনের মেছো-ঘেরির রহস্যময় কাজকর্ম, শঠতা আর প্রতিহিংসার কথা। এক ঘেরির মাছ চুরি করে নেয় অন্য ঘেরির লোকজন। দিনের বেলায়

অলস নিষ্কর্মা মানুষগুলির মত আড্ডা দেয় অথবা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। এত ভাত খায় যে বিড়ালেও ডিঙাতে পারে না।

> "দিনমানে এই, রাত্রিরবেলা আলাদা এক চেহারা, যত রাত হয়, মানুষগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঝোপে-জঙ্গলে লুকোনো খেপলা জাল নিয়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে যেন পাখি হয়ে কে কোন্ দিকে সরে পড়ল। পাড়ার ভেতর থেকেও বেরিয়ে পড়ছে অমনি। যত অন্ধকার, ততই মজা। মরদগুলোর দু-চোখের মনি ধকধক করে জ্বলে যেন। অন্ধকার- সমুদ্রে ডুব-সাঁতার দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।
>
> ওরা তো বেরিয়ে গেছে। আরও অনেকক্ষণ পরে মোটাসোটা চিকন চেহারার তিন-চারটে মানুষ কোথা হতে এসে মাদুর বিছিয়ে বসল। মাছের পাইকার। বৃষ্টি-বাদলা হল তো চালা ঘরের ভেতরে, না হলে খাল-ধারে নতুন বাঁধের ওপর তাড়াহুড়ো নেই — গল্প গুজব হচ্ছে, কলকে ঘুরছে হাতে হাতে। আকাশে পোহাতি - তারা উঠল, ফিরে আসে এইবার মাছমারা লোকগুলো। মাছ মেরে নিয়ে আসে। কেউ আনে খালুইতে, কেউ ডালায় ঢেলে। যে জালে মাছ ধরছে, কেউ বা সেই জালের সঙ্গেই জড়িয়ে নিয়ে আসে মাছ। গাছগাছালির আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, কিংবা গাঙের খোল থেকে মাথা তুলে উঁচু বাঁধের উপর এসে দাঁড়াল। আগে ছিল না বুঝি এরা কেউ – আকাশ থেকে পড়ে গেল অথবা পরীতে উড়িয়ে এনে ফেলল, এমনিধারা মনে হবে।"[৬]

মাছধরার ব্যাপারটা যেন লুকোচুরি খেলা ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে। চৌধুরীদের মত বড় ঘেরির মালিক তাদের পুরো এলাকা নজর রাখতে পারে না। কিন্তু ছোট ঘেরির মালিক নিজেই তদারকি করে, বাড়াবাড়ি রকমের পাহারা সেখানে। সাগরে পাহারা না থাকলেও মাছ চোরদের দৃষ্টি সাগরের চেয়ে ঘেরির দিকেই বেশী। কারণ এখানে যেন জিইয়ে রাখা মাছ।

শুধু মাছ চোরদের নিয়ে সমস্যা নয় ভোররাতে মাছ নিয়ে নদীপথে যাত্রা; তার জন্য নৌকা দরকার, দক্ষ মাঝি দরকার। দেরি হলে মন মন মাছ জলে ফেলে দিতে হবে। এমনি ঝুঁকির মধ্যে টিকে থাকার লড়াই। সেক্ষেত্রে গগন দাসকে নির্ভর করতে হয় জগন্নাথ ও তার দলবলের উপর। ছোট ঘেরিদারকে প্রতিমুহূর্ত সতর্ক থাকতে হয় বড় ঘেরিদারের শঠতা বা আক্রমণ সম্পর্কে। তবে এর উল্টোও হতে পারে। যেমন গরীব রাধেশ্যামের জাল আটকে রাখে চৌধুরীদের ম্যানেজার অনিরুদ্ধ। অন্যদিকে চৌধুরীদের উচিত শিক্ষা দিতে তাদের নৌকা হাপিস করে দেয় জগন্নাথ। তার ফলে —

> "সমস্ত রাত্রি চৌধুরিগঞ্জে কেউ ঘুমোয় নি। ঝোড়া ঝোড়া মাছ – অত টাকার মাল – চোখের ওপর পচে যাচ্ছে, কোন – কিছু করবার নেই নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া।"[৭]

প্রতিনিয়ত পারস্পরিক শ্রেনীলড়াই সুন্দরবনের জনজীবনকে সচল রাখে।

বাদারাজ্যের বনপ্রকৃতির মধ্যে এসে হাজির হয় গগনের স্ত্রী, বোন এবং শ্যালক। বিনোদিনী, চারুবালা বাদারাজ্যে এক নতুন জীবনের সূচনা করে। অনভ্যস্ত জীবনযাত্রা বাদার মানুষদের মুগ্ধ করলেও তারা অনুভব করে না অন্তরের আকর্ষণ। সেই সঙ্গে নগেনশশী, টোনি চক্রবর্তীর মত স্বার্থান্বেষী মানুষদের আগমনে প্রকৃতির এই শান্তিপূর্ণ রাজ্যে অফুরন্ত আনন্দ উল্লাসে ছেদ পড়ে। আলায় ফিরে এসে বুনো জগার অসহ্য ঠেকে। গার্হস্থ জীবনের নিশ্চিন্ত ছবি জগন্নাথের পছন্দ নয়।

> "আলায় এসেছে জগা অনেক দিন পরে । তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চতুর্দিকে। হায়, হায় কী চেহারা করে ফেলেছে তাদের সাধের আলার! রাধেশ্যাম বাড়িয়ে বলেনি। আলা কে বলবে, ষোল আনা গৃহস্থবাড়ি। দরাজ উঠোন পড়ে ছিল– আগাছার জঙ্গল, আর নুন ফুটে-ওঠা সাদা মাটি। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সারা উঠোন ভরে লাউ-কুমড়োর চারা পুঁতে দিয়েছে, নটে-পালং শাক-মূলোর বীজ ছড়িয়েছে। নধর লকলকে শাকে মাটি দেখা যায় না। সামনের দিকে গোয়ালঘর বাঁধা হচ্ছে। উদ্যোগী মরদ- জোয়ানের অভাব নেই – খুঁটি পোঁতা হয়ে চাল উঠে গেছে এর মধ্যে। গোয়ালঘর শেষ হতে বেশী দেরি হবে না। শেষ হয়ে গেলে গরু আসবে, ছাগল আসবে। আর এখনই এই ভোর হবার মুখে হাঁস ঘটপট করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় এতটুকু খোপের ভেতরে। হাঁস তো এসেই গেছে আর গোয়াল হয়ে গেলে কী কাণ্ড যে হবে, ভাবতে শিহরণ লাগে। ... সাগরের কূলে চর পড়ে ভাঙা বেরুল, ডাঙায় জঙ্গল জমল আপনা-আপনি, জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার চরে বেড়ায়। সকলের শেষে এল মানুষ। শুধুমাত্র চরে খেয়ে ও জীবের সুখ হয় না। জমিজিরেত নিজস্ব করে ঘিরে নেবে, চিরস্থায়ী ঘর বাড়ি বানাবে - সকল জীবের মধ্যে এই মানুষই কেবল যেন অনড় হয়ে দুনিয়ায় এসেছে।
>
> সব চেয়ে কষ্ট হয় বড়দার জন্যে। ... পুরো হাতা কামিজ এবং পুরো দশহাতি কাপড় পরিয়ে খাতা কলম আর হাতবাক্স সামনে দিয়ে মাচার উপর গগনকে ভদ্রলোক করে বসিয়ে দিয়েছে। বসে বসে হিসাব কর, আর দেদার লিখে যাও।... শ্যালক নগেনশশী খোঁড়াতে খোঁড়াতে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে সামনের উপর। এবং কামরার দরজার আড়াল থেকেও দোর্দণ্ডপ্রতাপ বোন আর বউ নিশ্চয় এক গণ্ডা চোখ তাকিয়ে পাহারায় রয়েছে। খাতায় এই কেনাবেচার সময়, কাজের সময় বলেই নয়, এমনি নজর দিনরাত অষ্টপ্রহর। মানুষটাকে নড়ে বসতে দেবে না। সন্ধ্যার পর গান-বাজনা আর ফড়ের আড্ডা বসত এই খানে, আড্ডা এখনো আছে। কিন্তু রসের গান গাও দিকি একখানা — 'গায়লা দিদি লো , বড় ময়লা তোর প্রাণ,' — গাও দিকি কত বড় সাহস। শ্রীখোলের সঙ্গে নামগান করে এখন বড়দা বোন-বউ-শ্যালকের সামনে বাবাজি হয়ে বসে। হরিধ্বনি করে হরির লুঠ ছড়ায়, ঝাঁজ-শঙ্খ বাজায় হয়তো বা লক্ষ্মীপূজোর সময়। জেলের কয়েদী হয়ে আছে।"[৮]

এজন্যই বনের মানুষ জগন্নাথ বড়দা বা গগনের উপর আস্থা রাখতে পারে না। সে বুঝেছে তার দল আর গগনের দল আলাদা। একজন বনের কোলের সন্তান, অপরজন বনধ্বংসের দীর্ঘ মিছিলের

সামিল। লোকালয়ের বাইরে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতির পরিবেশে নতুন করে নীড় তৈরীর উদ্দেশ্যে আবার নৌকা ভাষায় তারা। প্রকৃতির যতই তারা স্বাধীন-মুক্তজীবনের অভিলাষী। লোভ ও বন্ধনের অধীন নয় বলেই প্রকৃতিতে তারা এই রকম বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া। জগন্নাথের মত বাদা অঞ্চলের মানুষদের অগাধ সম্ভ্রম এই বনের প্রতি। ক্ষ্যাপা মহেশের দয়ায় তাইতো বাদার মানুষগুলি আরও দরিয়ার কিনারে পা বাড়িয়েছে —

> "বনের বাঘ মানষেলার যায় না, মানুষ বাঘাও তেমনি সহজে আসতে চায় না, এই সব দুর্গম বনজঙ্গলে। সেইটে বড় বাঁচোয়া। সেই জন্যে বোকাসোকা জগাদের প্রয়োজন। বন কেটে এরা বসত বানায়। পুরোপুরি বানানো হয়ে গেলে তারপরে দলকে দল বড়দরের মানুষরা এসে পড়েন। ভাল ভাল দালাল-কোঠা হয়। ভারী ভারী মহাজনী নৌকা - এবং ক্রমশঃ ধোঁয়াকল-স্টিমার দেখা দেয় জলে। ঝনঝন টাকা পয়সা বাজে। ভাল রাস্তাঘাট হয় জুতো-পায়ে বাবুদের চলাফেরার জন্য, ঠেলা খেয়ে এরা চলে যায় আদাড়ে – আঁস্তাকুড়ে। হেজেমজে মরে কতক। গগন দাসের মত এককালের দুঃখ সুখের সাথী কতজনে ভিড়ে যায় বড়দের সঙ্গে। আর যারা নিতান্তই জগাদের মতন, নতুন জায়গায় তল্লাসে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে।"[৯]

সুন্দরবনে এভাবেই এক দল স্বার্থান্বেষী আখের গুছিয়ে নিচ্ছে আর অন্যদল বন কেটে বসত গড়ে তুলেও অনিশ্চিতের সঙ্গে লড়তে লড়তে বেঁচে আছে।

অনুরূপ প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসে। সাঁওতালদের অকৃপণ শ্রমে। কালিন্দীর চর যখন স্বর্ণপ্রসবিনী তখন চরটির দখল নেয় ধনতান্ত্রিক যুগের প্রতিভূ যন্ত্রকলের মালিকেরা। অর্থশক্তিতে করায়ত্ব করে নেন সাঁওতাল সম্প্রদায়কে। শ্রমদাসে পরিণত সাঁওতালরা পাড়ি জমায় আবার অজানা উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "যাযাবর সাঁওতাল-সম্প্রদায় অল্পদিনের জন্য ইহার আতিথেয় বক্ষে নীড় রচনা করিয়া আবার ইহার স্নেহশীতল অথচ পিচ্ছিল অঙ্ক হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে – চর ইহাদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিয়া বিমাতার ন্যায় বিসর্জন দিয়াছে।"[১০]

'বন কেটে বসত' বাদার ইতিহাস। বাদায় মানুষের আগমনের পশ্চাতে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং গ্লানিময় জীবন-সমস্যা। গগনের ভাগ্যান্বেষনের সূত্র ধরে পাঠক বাদারাজ্যে উপস্থিত হন। তৎসত্ত্বেও এই উপন্যাসের সে নায়ক নয়।বস্তুত উপন্যাসের কোন নায়ক নেই স্বার্থ চরিতার্থ করতে আগত মানুষেরা জঙ্গল ধ্বংস করে সভ্যতা গড়ে তোলে। জগন্নাথের মত সরল নির্লোভ শিশু প্রকৃতির লোক মিলেমিশে বসত নির্মাণ করে। তারপর লোভী, স্বার্থান্বেষী মানুষেরা এসে তার স্বত্ব ভোগ করে। গগন, নগেনশশী, টোনি চক্রবর্তীর মত নীচ ষড়যন্ত্রীরা আমে-দুধে মিশে যায়। আঁটির মত পরিত্যক্ত হয় জগা, পচা, বলাইয়ের দল। অথচ এদের পরিশ্রমেই বাদারাজ্য মানুষ বসবাসে উপযোগী হয়ে

উঠেছে। এই উপন্যাসের প্রকৃত আরণ্যক চরিত্র জগন্নাথ। 'জলজঙ্গল' উপন্যাসের কেতুচরণের সঙ্গে তার অনেক মিল রয়েছে। নৌকা চালিয়ে সে সারা সুন্দরবন চষে বেড়ায়। সঙ্গী পচা, বলাইয়েরা। বনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, তাই সে কখনোই অরণ্যের শত্রু হতে পারে না । বিপদের মুখে সে নির্ভীক, কারণ অরণ্যের ভৌগোলিক অবস্থান তার নখদর্পণে। তার গায়ে বুনো জন্তুর মত তাগদ। মাছের নৌকা বেয়ে দূরের গঞ্জে সময়মতো পৌঁছে দিতে তার জুড়ি কেউ নেই। অকুতোভয় এই যুবক কোন বন্ধনে বাধা পড়ে না। বনের ভেতর সেই গগন দাসকে নিয়ে আসে, ঘেরিদার হয়ে বসতে সাহায্য করে। সে বলে —

> "বড়দার মতো মানুষটাকে বুদ্ধি দিয়ে আমিই জঙ্গলে নিয়ে এলাম। তাই দায়িত্ব পড়ে গেছে, খানিকটা গোছগাছ করে দিয়ে সরে পড়ব। প্রাণ আমার ছটফট করছে।"[১১]

আসলে বাঁধাধরা নিয়মে বাঁধা যায় না প্রকৃতির পুত্রকে। গগন দাসের পরিবার এসে হাজির হলে অগোছালো আলোঘর নিপাট -নিটোল হয়। যা জগন্নাথ সহ্য করতে পারে না। জগন্নাথ বিশ্বাস করতে পারে না গগনের আশ্বাস বাণী। কেননা সে জানে তার দল ও গগনের দল পৃথক। একজন বনের কোলের সন্তান, অন্যজন বন ধ্বংসের দীর্ঘ মিছিলে সামিল। জগন্নাথ যেন শুধু মানুষ নয়, বনেরই আত্মা। বনধ্বংসী মানুষের হাত থেকে বাঁচতে আরো দূরে পালিয়ে যায়। সে বুঝেছে বনকে ভালোবাসলেই বন আশ্রয় দেবে। বনকে ধ্বংস করলে অস্তিত্ব টিকতে পারবে না। সে বলেছে —

> "বন কিছু রেখে দেব, তাতে বাঘ থাকবে। মানুষ পড়শীর চেয়ে বাঘ-পড়শী ভাল। বাঘেরা পাহারা দেবে – আবার কোনদিন খোঁড়া নগনা, গোপাল ভরদ্বাজ, প্রমথ নায়েব, আদালতের চাপরাসী আর অনুকূল চৌধুরিয়া ঢুকে পড়তে না পারে।"[১২]

উপন্যাসের শেষে তাই জগন্নাথেরা পাড়ি জমায় অথৈ কালাপানির সামনে। কোথায় যাচ্ছে তা তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তবুও জগন্নাথেরা বসতি গড়ে আর অপর দল আখের গোছাতে তা দখল দেয়। অন্যান্য চরিত্রগুলি উপন্যাসে ততটা জীবন্ত হতে পারেনি। নারী চরিত্রের মধ্যে গগনের স্ত্রী বিনোদনী এবং বোন চারুবালা। বিনোদিনী উপন্যাসের শুরুতে গগনকে রোজগারের জন্য যতটা তাড়া দিয়েছে পরে চরিত্রটির তার সক্রিয়তা চোখে পড়ে না। তবে চারুবালা কিছুটা কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নগেনশশীর হাত থেকে বাঁচতে সে দাদার কাছ পাড়ি জমায়। শেষপর্যন্ত নগেনশশীর হাত থেকে রেহাই পেতে শত্রু বলে চিহ্নিত জগন্নাথের সঙ্গে কালাপানির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। যার মধ্যে কিছুটা হলেও রহস্য ঘনীভূত। বাকি চরিত্রগুলি অবস্থার দাস, জীবিকার অধীন। নগেনশশী, পচা, রাধেশ্যাম, অন্নদাসী, মহেশ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "চরিত্রগুলি বাদা অঞ্চলের বিরাট, বিশৃঙ্খল পটভূমিকায় আপন আপন ক্ষুদ্র অংশ অভিনয় করিয়া যাইতেছে – ঘটনাস্রোতে ছোট্ ছোট্ মানব-বুদবুদ্। সীমাহীন প্রান্তরে ক্ষণিক খদ্যোত দীপ্তির ন্যায় ইহারা একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক মাত্র। কৌতুহলোদ্দীপক, কিন্তু অস্তিত্ব মর্যাদাহীন।"[১৩]

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের ভয়াল ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে রচিত উপন্যাস 'বন কেটে বসত' জীবিকার অন্বেষণে একদল মানুষ চেনাজানা গণ্ডির পথ অতিক্রম করে এসে পড়ে নির্জন অরণ্য ভূমিতে। উদার এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে কাজও জুটিয়ে ফেলে। সেই মানুষদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় অরণ্য প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষেরা। শহরের শিক্ষিত মানুষের হাতে বাদাবন ও নিজেদের সঁপে দেয়। বাদাবনের মানুষদের বলিষ্ট কর্মদক্ষতায় লোভী, স্বার্থন্বেষী মানুষের দল মালিকানা ভোগ করে। বিস্তৃত জঙ্গল ধ্বংস করে গড়ে তোলে মানবিক সভ্যতার বিকাশ। অনভ্যস্ত জীবনযাত্রায় বাদার মানুষেরা মুগ্ধ হলেও অন্তরে কোন আকর্ষণ অনুভব করতে পারে না। তাই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে লোকালয়ের বাইরে মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে নৌকা ভাসিয়ে দেয় শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের আস্তানার সন্ধানে। তারাও যেন প্রকৃতির মতই স্বাধীন, মুক্ত জীবনের অভিলাষী। লোভ এবং বন্ধন তাদের ধরে রাখতে পারে না। নতুন বসতি তারা গড়ে তুলবে ঠিকই কিন্তু ধরে রাখতে পারবে কি ? বিশ-পঁচিশ বছর পরে হয়তো আর কোন স্বার্থন্বেষী মানুষের দল এসে জুটবে এই বাদাবনে। তাদের সভ্যতা গড়ে তোলার পথ করে দিতে এইসব বাদাবনের প্রকৃতিচারী মানুষদের সেদিন আবারও পাড়ি দিতে হবে অজানা উদ্দেশ্যে। তাই উপন্যাসের সার্থক নামকরণ 'বন কেটে বসত'।

রাজকন্যার স্বয়ম্বর

দেশ বিভাগের সময় উদ্বাস্তু-সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল। দুটি উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে 'রাজকন্যার স্বয়ম্বর' (১৩৬৮) নামক উপন্যাসটি। দুটি পরিবারের দুই পাত্র পাত্রীকে উপন্যাসের নায়ক নায়িকা রূপে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামের নাম সোনাটিকারি। মস্তবড় অট্টালিকায় বসবাস করেন রাজবাড়ির মেজরাজা অশ্বিনীকুমার। এক ছেলে আশিস, এক মেয়ে বাঁশি এবং বিধবা বোন বিরজাকে নিয়ে তার সংসার। বাঁশির বয়স যখন মাত্র ছয় মাস, তখন মারা যান অশ্বিনীকুমারের স্ত্রী। সংসারের সব দায়দায়িত্ব নেন বিরজা। রাজার এক বাল্যবন্ধু তথা সর্বক্ষণের দাবা খেলার সঙ্গী স্কুলের

ভূতপূর্ব সেকেণ্ড মাষ্টার সদাশিব বাড়ুজ্জে। তিনিও রাজার সঙ্গে থাকেন। দেশভাগের কারণে পালানোর হিড়িক পড়লে অশ্বিনীকুমার বলেন –

> "আমি থাকব আর থাকবে আমার শিব-দাদা। দুজনে মজা করে রাঁধব বাড়ব খাব, দাবা খেলব, সন্ধ্যা দেব বাপ-পিতামহের জায়গায়।"[১]

দেশভাগের হিড়িকে সাধারণ মানুষ আগে থেকেই পালানো শুরু করলেও অশ্বিনীকুমার পালাতে রাজি নয়। রাজবাড়ির ভিতরে থাকেন রাজ-এস্টেটের পুরানো খাজাঞ্চি হরিবিলাস ঘোষ। হরিবিলাসের ছেলে বিনয় চাকরি করে কলকাতায়। বিনয়ের সঙ্গে বাঁশি এক বাড়িতে ছোট থেকে থাকত। সুযোগ পেলেই বাঁশি –

> "বিনয়ের পিছনে লাগবে। বিনয় বেকুব হলে তার আনন্দ।"[২]

বিনয় এখন কলকাতার একটি প্রেসের কর্মচারী। কিন্তু গ্রামের লোকেরা জানে সে কলকাতায় ছাপাখানা খুলেছে। বিনয়ের মা জ্ঞানদা অসুস্থ। অসুস্থ জ্ঞানদা বিনয়ের সঙ্গে বাঁশির বিয়ে দিতে চান। কিন্তু তারা মর্যাদায় ছোট বলে জমিদার বাড়ির লোকেরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। বিনয় তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে –

> "আমরা আশ্রিত, ওঁরা মনিব আমাদের এটা কোনদিন ভুলে যেও না।"[৩]

প্রত্যুত্তরে জ্ঞানদা বলেন —

> "ফুটো রাজত্বের দেমাক বেশিদিন নয় আর বিদেশে থাকিস, তাই খবর জানিস নে। মেয়ের বিয়ের ভাল ভাল সম্বন্ধ কেঁচে যাচ্ছে শুধু টাকার জন্য।"[৪]

ছেলের বিয়ে দিতে না পারার গ্লানি নিয়েই মারা যান জ্ঞানদা।

অবস্থার বিপাকে পড়ে এবং দেশভাগের কারণে শেষ পর্যন্ত অশ্বিনীকুমারকে দেশত্যাগ করতে হয়। ছেলে আশিস স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে লোকজনের পারাপার করে। তারই সহায়তায় বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত হীন হয়ে তারা আশ্রয় নেয় শিয়ালদহ স্টেশনে। খাজাঞ্চি হরিবিলাস এদের সমস্ত টাকাপয়সা নিজের স্ত্রীর চিকিৎসায় খরচ করেছে। খাজাঞ্চি ছেলে বিনয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা এনে তা শোধ দেওয়ার চেষ্টা করলেও বরফ গলেনি। খাজাঞ্চি হরিবিলাসের ঠাঁই হয় জামাইবাড়িতে। এদিকে শিয়ালদহ স্টেশনের জনসমুদ্রে রূপসী বাঁশিকে নিয়ে

অস্বস্তিতে পড়ে অশ্বিনীকুমার। আশিস বাসার জোগাড় করতে পারেনি অনেক চেষ্টা করেও। এ প্রসঙ্গে বাঁশি তার দাদাকে বলে -

> "তাকিয়ে দেখ দাদা, সবগুলো নজর তোমার হতচ্ছাড়ী বোনটার দিকে। গরবে বুক ফুলে ওঠে না, সত্যি করে বল। এই যত লোক ভিড় করে আছে, মেরে তাড়ালেও কেউ নড়বে না যতক্ষণ আমরা আছি এখানে। কিন্তু আমি ভাবছি আরও পরের কথা। মুখে মুখে চাউর হবে, দলে দলে আরও এসে জুটবে কাজকর্ম অচল হবে স্টেশনের। তেমনি অবস্থা হবার আগে সরে পড়া উচিত। দশের উপরে কর্তব্য আছে তো একটা।"[৫]

এমনি সময় অকুল সাগরে আলোকস্তম্ভের মতো স্টেশনে হাজির হয় বিনয়। বিনয় তার বাবার কাছ থেকে চিঠিতে খবর পেয়ে খোঁজ নিতে এসেছে। লজ্জায় অশ্বিনীকুমারের –

> "জিভ আটকে যায়। সোনাটিকারি ছেড়ে হরিবিলাসকে মাইল পাঁচেক দূরে জামাইয়ের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। সেই জায়গায় থেকেও তিনি পুরানো মনিবের খোঁজ রাখেন। এত কাণ্ডের পরেও ছেলেকে খোঁজখবর নিয়ে দেখাশোনা করবার জন্য চিঠি লিখেছেন।"[৬]

বিনয় সেখান থেকে তাদের নিয়ে যায় দমদমের কাছে প্রেসের বাড়িতে। সেখানেই একটা ঝুপড়িতে থাকে বিনয়। কিন্তু প্রেস মালিক রঞ্জিত রায়ের অনুমতি না নিয়ে বাগানবাড়ি দালান খুলে দেয় বিনয়, বাঁশিদের থাকবার জন্য। সদাশিব চিন্তিতভাবে বিনয়কে বলে –

> "মনিবকে না জানিয়ে ঘর তো খুলে দিচ্ছিস বিনয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল, তোর কোন ক্ষতি হবে কি না।"[৭]

বাঁশি বলে –

> "শিয়ালদা স্টেশন বসত করে এসেছি। আগুনের মধ্যে থাকলেও আর পুড়ব না, সাগরের নিচে রাখলেও আর ডুবব না।"[৮]

বিনয় সকলকে আশ্বস্ত করে। মালিক জানলেও কিছু হবে না। বাঁশিরা দু-চারদিন পরে চলে যাওয়ার পরিবর্তে আশিস-এর ব্যবস্থায় বাগানবাড়িতেই গড়ে উঠেছে কলোনি। যার রাজা অশ্বিনীকুমার। সমস্ত কিছু বিনয় মুখ বুজে সহ্য করছে একমাত্র বাঁশির জন্য।

প্রেসের মালিক রঞ্জিত রায়ের কাছে খবর পৌঁছায়। তিনি এখন কোলিয়ারির বন্দোবস্ত নিয়েছেন। রঞ্জিত রায়ের ম্যানেজার পুলিন খবর পেয়ে এদের বিতাড়িত করবার জন্য

বাগানবাড়িতে উপস্থিত হল। বাঁশির রূপে মোহিত পুলিন বাঁশিকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু বাঁশি পুলিনকে বিয়ে করতে চায় না। বাঁশি বলে –

> "তুমিই দায়ী বিনয়-দা। বাগানবাড়ি নিয়ে এসে বিপদে ফেলেছ। কী করে ঠেকাবে এখন ভাবো।"[৯]

বিনয় বাঁশির আপত্তিতে খুশি হয়। অনেক ভেবে চিন্তে বিনয় রঞ্জিত রায়ের ভাই ইন্দ্রজিৎকে একথা জানাতে ভোর বেলা হাজির হয় ব্যায়ামের আখড়ায়। বুদ্ধিতে কুলোয় না বলে ইন্দ্রজিৎ দাদাকে একটু ভয় করে। পুলিনের খারাপ অভিসন্ধি জানতে পেরে প্রতিকারের জন্য সে নিজে নিয়ে হাজির হয় বাগানবাড়িতে। বাঁশিকে দেখে সেও বাঁশির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এবার ইন্দ্রজিৎকে থামাতে বিনয় দ্বারস্থ হয় মালিক রঞ্জিত রায়ের। ছোটবাবু অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ-এর বিয়ে ভাঙতে বসেছে। এ প্রসঙ্গে পুলিন বিনয়কে বলে -

> "দাদা নিজে এবারে নেমে পড়লেন। রক্ষে নেই, বিয়ে করতে হবে না আর ছোটবাবুকে। বাড়া-ভাতে ছাই পড়ে গেল।"[১০]

মালিক রঞ্জিত রায় বিপত্নীক। তার ছেলে-মেয়েও আছে। বয়সে বাঁশির চেয়ে অনেক বড়। তবু রঞ্জিত বাঁশিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সে বিয়ে করতে চায়। বিবাহের দিনক্ষণ স্থির হয়ে যায়। যখন কোনোভাবেই আটকানো গেল না তখন বিনয় বিয়ের দিন কৌশল করে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসে রঞ্জিতের শাশুড়ি এবং ছেলে মেয়েদের। তাদের উপস্থিতিতে রঞ্জিতের বিয়ে করা আর হয়ে ওঠে না। রঞ্জিত বিনয়কে বলে -

> "অশ্বিনীবাবুর মেয়ের বিয়ে আজকে। বিয়েটা তোমাকেই তো করে ফেলতে হয়।"[১১]

বিনয় যেন আকাশ থেকে পড়ে। রঞ্জিতের পরামর্শ মত, বিনয়ের সঙ্গে বাঁশির বিয়ে হোল । যৌতুক হিসেবে কলকাতার বাড়ি এবং ভাল চাকরি পায় বিনয়। এরপর বাঁশির সঙ্গে বিনয়ের বিয়েতে আর কারোর কোনো আপত্তি থাকে না।

'রাজকন্যার স্বয়ম্বর' উপন্যাসে বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্সের মেলবন্ধন দেখানো হয়েছে। রাজা অশ্বিনীকুমার ধনী মানী গৃহস্থ থেকে সর্বহারা হয়ে অন্যের কৃপাপ্রার্থী হয়েছেন। দেশ ত্যাগের পর মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে গিয়ে যাকেই সামনে পেয়েছেন তাঁর হাতেই মেয়েকে সম্প্রদান করতে চান। চরিত্রটির মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভাব লক্ষ্য করি।

উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হল বিনয় ও বাঁশি। বিনয় সৎ ও কর্মনিষ্ঠ যুবক। পড়াশুনাতে সে কাঁচা হলেও কলকাতায় প্রেসের অফিসে চাকরি করে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা জানে নিজেই প্রেস চালায়। বিনয়ের সঙ্গে বাঁশি ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে। বাঁশি রাজার মেয়ে আর বিনয় খাজাঞ্চির ছেলে। বাঁশির মধ্যে এই অহমিকা বোধ কাজ করত। তাইতো বিনয়ের সঙ্গে যখন বাঁশির বিয়ের প্রস্তাব হয় তখন বাঁশি বিনয়কে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল –

> "আমরা দোতলার উপর থাকি, আকাশ ছোঁওয়া কোঠাবাড়িতে। তোমরা একতলার খুপরি ঘরে। হাত বাড়াতে যেও না কখনো উপর দিকে। পয়সা হয়ে তোমার হাত যত লম্বাই হয়ে উঠুক, অতদূর নাগাল পাবে না।"[১২]

সেই বিনয়ই অশ্বিনীকুমারের পরিবারকে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রঞ্জিত রায়ের বাগানবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছে। চাকরি চলে যেতে পারে সেই ভয়কেও গুরুত্ব দেয়নি। বাঁশির একের পর এক বিয়ে ভাঙার ব্যবস্থাও বিনয় করেছে বাঁশির কথায়। শেষ পর্যন্ত বিনয়ই বাঁশির বিয়ের পাত্র হয়ে উঠেছে।

সোনাটিকারি গ্রামে থাকার সময় বাঁশির সঙ্গে বিনয় কখনোই পেরে উঠত না। বাঁশি যেন বিনয়কে অপমান করলেই খুশি হত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাষ্টারমশায়-এর কাছে পড়াশুনার সময় কিংবা বিয়ের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে। তবে মা মরা মেয়ে বাঁশি যেমন সেয়ানা, তেমনি সুন্দরী। সদাশিব তাই বাঁশির নাম দিয়েছেন কাঞ্চণবরণী। লেখকের কথায় -

> "রাজবাড়ির ঐশ্বর্য হরণ করে নিয়ে সুদে আসলে যেন পূর্ণ করে দিয়ে যাচ্ছেন একটি মেয়ের চেহারার। এ আগুন নিয়ে পথে বেরুনো বিপদ।"[১৩]

দেশভাগের কারণে সেই মেয়েকে নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে রাত কাটাতে হয় বাবা অশ্বিনীকুমারকে। লোভাতুর মানুষগুলোর দৃষ্টি এসে পড়ে বাঁশির উপর। সেখান থেকে বিনয়ের মালিকের বাগানবাড়িতে গিয়েও বাঁশির সৌন্দর্যের কারণে পুলিন, ইন্দ্রজিতেরা বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বুদ্ধিমান বাঁশি বিনয়কে প্রতিকার করতে বলে। বিনয়ও একের পর এক মানুষজনকে ধরে বিয়ে ভাঙে। শেষপর্যন্ত বাঁশির বিয়ের মালা পরার সৌভাগ্য হয় বিনয়ের। যে বাঁশি একসময় বিয়ের ব্যাপারে বিনয়কে সাবধান করেছিল। সেই বাঁশিই এখন বলে –

> "কত বড় বড় ভারী ভারী সম্বন্ধ - কোনটার টাক মাথা, কোনটার অসুরের মত চেহারা, কোনটা বাঘের মতন হালুমহুলুম করে। উঃ, কী বাঁচাটাই বেঁচে গেলাম! ভাগ্যিস তুমি কাছেপিঠে ছিলে।"[১৪]

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কিংবা পরিস্থিতি উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা বাঁশির মধ্যে ছিল।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে বাঁশির দাদা আশিস, পুলিন, ইন্দ্রজিৎ, প্রেসের মালিক রঞ্জিত রায় উল্লেখযোগ্য। আশিস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করে। মানুষের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ায়। তাইতো উদ্বাস্তু মানুষজনকে বসবাসের জায়গা করে দিয়েছে রঞ্জিত রায়ের বাগান বাড়িতে। সেই বাগানবাড়িতে বসবাসকারী মানুষজনকে উচ্ছেদ করতে এসে পুলিন (রঞ্জিত রায়ের ম্যানেজার) বাঁশিকে দেখে সব ভুলে গিয়ে বাঁশিকে বিয়ে করতে চায়। বিনয় ইন্দ্রজিতের দ্বারস্থ হলে ইন্দ্রজিৎ উচ্ছেদ করতে এসে সেও বাঁশিকে দেখে বিয়ে করতে চায়। বিনয় এবার দ্বারস্থ হয় রঞ্জিত রায়ের। রঞ্জিত রায় ও একইভাবে বাঁশিকে বিয়ে করতে চায়। এভাবেই চরিত্রগুলি কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

রাজা অশ্বিনীকুমারের কন্যা বাঁশি। যার রূপের ছটায় মানুষজন বিভোর। শিয়ালদহ স্টেশনে রাত কাটানোর সময় মানুষেরা বাঁশির আশেপাশেই ভিড় জমাতে শুরু করে। সেখান থেকে রঞ্জিত রায়ের বাগানবাড়িতে গিয়েও নিস্তার নেই বাঁশির। সেখানেও বাঁশিকে বিয়ের জন্য পাত্রদের আনাগোনা। কিন্তু সেইসব পাত্রদের বিদায় জানিয়েছে বাঁশি বিনয়ের সাহায্য নিয়ে। রাজকন্যারা যেমন স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজপুত্রদের মধ্যথেকে স্বামী নির্বাচন করেন তেমনি আলোচ্য উপন্যাসে বাঁশিও তার পছন্দের স্বামী নির্বাচন করেছে। অনেক বরকে বাতিল করে সে বিনয়ের গলায় পরিয়েছে পুষ্পমাল্য। আর বিনয়কে বলেছে -

> "মন্দটা কি হল। অনেক রকমের বর দেখে নেওয়া গেল। স্বয়ম্বরা হলেন সোনাটিকারির রাজকন্যা।"[১৫]

তাই উপন্যাসের নাম 'রাজকন্যার স্বয়ম্বর' সার্থকতা লাভ করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসুর 'নিশিকুটুম্ব' (১৯৬৩) উপন্যাসটি বাংলা সহিত্যে তথা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে অভিনব সংযোজন। চোরেদের জগৎ ও জীবনকাহিনী রহস্যময়। সুকঠিন অধ্যবসায়ের মূল্যে লেখক চোরেদের অজানিত রহস্য ও সত্য আবিষ্কার করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

বাস্তব জীবন কাহিনীর দিকে যেমন মানুষের আকর্ষণ তেমনি আকর্ষণ আছে বাঘ, ভূত ও চোরেদের গল্পের প্রতি। ভূত ও বাঘের গল্প মনোজ বসু ইতিপূর্বে অনেক লিখেছেন। এখন চোরের গল্পকে তিনি সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করতে চাইলেন। এই উপন্যাস রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন -

> ''সমাজের আদিম পাপ দুইটি - চৌর্য আর গণিকাবৃত্তি। গণিকা নিয়ে পৃথিবীর নানা সাহিত্যে কালজয়ী সৃষ্টি রয়েছে, কিন্তু চৌরকর্ম নিয়ে কোন বৃহৎ সৃষ্টি আমার নজরে পড়েনি। কেন এই অবহেলা, বলতে পারি নে। উপন্যাস লিখতে বসে কয়েকটি বৃদ্ধ চোরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাঁদের অতীত কথা শুনলাম। শুনে রোমাঞ্চ লাগে, ঘৃণ্য চৌরকর্মের মধ্যেও আশ্চর্য মানবিকতা মাঝে মাঝে তাঁদের জীবনে ঝলক দিয়ে গেছে। রিটায়ার্ড পুলিশ-দারোগা ও জনসাধারণের কাছেও বিস্তর চৌরকাহিনী শুনেছি। এতকালের অনাবিষ্কৃত এক আশ্চর্য জগৎ - 'নিশিকুটুম্ব' বইয়ে সেই বিচিত্র জগতের পরিচয়। দিনমানে আমাদের সৎমানুষের সমাজ-সংসার ও কাজকর্ম, চোরের তখন বিশ্রাম। তাদের চলাচল নিশিরাত্রে, আমাদের ঘুমিয়ে যাবার পর। অলিখিত আইন আছে, সেগুলি তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সুনিপুণ কর্ম বিভাগেও নিয়ম-শৃঙ্খলা হেঁয়ালির মতন শোনাচ্ছে - কিন্তু চোরদের মতন সাধু অতিশয় বিরল। সাধুতা দলের মধ্যে - যার যেটুকু প্রাপ্য, তার মধ্যে তিলেক প্রবঞ্চনা নেই। সাধুরা কামিনী-কাঞ্চনে বীতরাগ, চোরের ক্ষেত্রে ঠিক অর্ধেক - কাঞ্চনলিপ্সু তারা কিন্তু কামিনীতে অনিহা। অন্তর্যামী ঈশ্বরের কাছে কোন-কিছু গোপন থাকে না, চোরের সম্পর্কেও খানিকটা তাই। যে বাড়িতে চুরি হবে, খোঁজদার দীর্ঘকাল ধরে সেখানকার যাবতীয় খোঁজখবর নেয়। আপনি ঘূনাক্ষরে জানেন না, নিশীথে আপনার গোপন কথাবার্তা ও কাজকর্ম তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেশুনে গেছে। লেখকের হাত নিশপিশ করে কিনা বলুন এমন জিনিস নিয়ে লিখতে ?''[১]

চোরেরা সমাজে অবহেলিত ও ঘৃণিত। সেই চোর ও তার কর্মনিপুণতাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে লেখক উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ সব সময় তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবার

চেষ্টা করে। কিন্তু চুরি যে বিশাল শিল্পকলা সেদিকেই লেখক ইঙ্গিত করেছেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

> "প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে চৌর্যক্রিয়ারও যে একটা বিধি-নিষেধ সমন্বিত নীতি-নির্দেশ, দেহমনের সাধনা প্রস্তুতি ও শিল্পোৎকর্ষ ছিল এই উপন্যাসে তাহারই একটি রোমান্স-রমনীয় চিত্র আকার প্রয়াস দেখা যায়। উপন্যাসবর্ণিত চোরের দলের সহিত কর্মজীবন সাধু, প্রলোভনজয়ী পুলিশ কর্মচারীও নিষ্ঠাবান, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া এই দলের লোকদের মধ্যে গরুর প্রতি একান্ত ভক্তি, পরস্পরের সহিত সহৃদয় বিশ্বাসরক্ষা ও যথাসাধ্য আচরণবিধি পালনের প্রয়াস প্রভৃতি সদগুণের প্রাচুর্য লক্ষণীয়।"[২]

চোরেদের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে যে আশ্চর্য মানবিকতা তাকেই সভ্য ও চিন্তাশীল মানব-সমাজের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসের নায়ক সাহেব চরিত্রকে কেন্দ্র করে গল্পটি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের শুরুতে জুড়নপুর গাঁয়ের ঘটনা। আশালতা বিয়ের পর বাপের বাড়িতে এসেছে। গা-ভর্তি গহনা। রাতের অন্ধকারে চোর এসে আশালতার বিছানায় একই সঙ্গে শুয়ে চুরি করেছে, সেই সোনার গহনা। চোরের নাম সাহেব। উপন্যাসের এক চরিত্র জগবন্ধু বলাধিকারীর মুখ দিয়ে লেখকের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর পরেই লেখক শুনিয়েছেন সাহেবের জন্মরহস্য এবং বাল্যকালের কথা। কালীঘাটের বস্তি এলাকায় বসবাস করে সুধামুখী নামের এক গণিকা। যার সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হলেও বছর তিনেক পরেই সব চুকিয়ে বাপেরবাড়িতে ওঠে। বাপের বাড়ি ছিল বেলেঘাটায়। যৌবনের দায়ে এসে পড়ল এই কদর্য পরিবেশ। একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে সাহেবকে কুড়িয়ে পেয়েছে। বয়স তখন দুদিন বা তিনদিন। সাহেবকে পেয়ে তার মধ্যে অবরুদ্ধ জননী মন উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। একদিকে স্নেহপ্রবণ মাতৃত্ব ও অপরদিকে জীবিকা। বাৎসল্য রসের কাছে তার দেহ-বিক্রির কলঙ্ক ম্লান হয়ে গেল। সে সমস্ত ধনী দেহলোভী অতিথিরা সুধাময়ীর বাড়িতে আসত তারাও সাহেবের প্রতি বাৎসল্য রসে অভিসিক্ত হয়েছে। রাজবাহাদুর সাহেবের প্রথম মুখ দেখে বলেছে –

> "রাজপুত্তুরকে বুঝিয়ে বল রে সুধা, আজকে নেই। সোনার টাকায় মুখ দেখে যাব আর একদিন এসে।"[৩]

সোনামুখীর বাড়িতে অতিথিদের আগমন নফরকেষ্টর পছন্দ নয়। নফরকেষ্টর সঙ্গে সুধামুখীর নিত্য ঝগড়াঝাঁটি। অথচ এদের মধ্যে রয়েছে মধুর ভালবাসার সম্পর্ক। সাহেবকে দিয়েছে পিতৃত্বের পরিচয়। ভর্তি করেছে স্কুলে। আবার নফরকেষ্টই সাহেবকে চুরিবিদ্যার হাতে খড়ি দিয়েছে।

সুধামুখীর ছোট বোনের মত পারুল। সকল সুখদুঃখের সঙ্গী সে। পারুলের মেয়ের নাম রাণী। সাহেবের সঙ্গে পারুল ও রাণীর ততটা মিল হয়নি। তবুও একদিন পারুল নিজের মেয়ে রাণীর সঙ্গে সাহেবের বিয়ের কথা তোলে। সুধাময়ী বিরোধীতা করে বলেছে -

> "আস্ত পাগল তুই একটা। মায়ের দুধের গন্ধ এখনও মুখে – সেই মেয়ের বিয়ের ভাবনা লেগে গেল। বিয়ে না দিলে অরক্ষণীয়া মেয়ে ঘর ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় হতে দে, তখন দেখবি সাহেব তো সাহেব - কত ভাল ভাল সম্বন্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সাহেবের কথা উঠলে তুই-ই হয়তো তখন নাকচ করে দিবি।"[৪]

কিন্তু রাণীর কৈশোর ইচ্ছা সাহেবকে চুরিবিদ্যার অনুশীলনে সাহায্য করেছে। রাণীর সোনার মাকড়িজোড়া চুরি করাই ছিল চোর সাহেবের প্রথম দিনের কাজ। মাকড়ি খোয়া যাওয়ার পর রাণীর মধ্যে বিষন্নতা সাহেবকে ব্যথিত করে। দৈবশক্তির প্রতি আস্থা পোষণ করে যে রাণীকে দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করতে বলে।

> "ঘরের দেয়ালে মা কালীর পটের উপর মাথা ঠুকছে জোর তাগাদা, গড়িমসি করলে ভক্তির চোটে পটের অধিকক্ষণ আস্ত থাকার কথা নয়। সেই শঙ্কাতেই বুঝি জানালা দিয়ে মা টুক করে ফেলে দিলেন, রাণী ছুটে গিয়ে কুড়াল জিনিসটা - তাই তো রে, সেই মাকড়ি।"[৫]

অর্থাৎ চুরি যাওয়া মাকড়ি যেন দেবী এসে ফেরত দিয়ে গেল। এরই মধ্যে একদিন নফরকেষ্টর সঙ্গে চুরি করতে বেরিয়ে ধরা পড়ার উপক্রম। গয়না ভর্তি ব্যাগ পথে সুধাময়ীর হাতে তুলে দিয়ে সরে পড়ল। চুরি করে মায়ের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে নফরকেষ্টর সঙ্গে সাহেব বাড়ি ছাড়ল। উঠল বলাধিকারীর আড্ডায়। সেখান থেকেই চলল সাহেবের নতুন জীবন। ঘটনাক্রমে বংশী, মধুসূদন, গুরুপদ ভট্টাচাজ মশাই-এর জীবন কাহিনী স্থান পেয়েছে উপন্যাসের এই পর্বে। সাহেব সবই শুনেছে বলাধিকারীর কাছ থেকে। বলাধিকারীর কাছ থেকেই লাভ করেছে চুরিবিদ্যা সম্পর্কে অনেক নিগূঢ় তথ্য।

দ্বিতীয় পর্বে সাহেব বলাধিকারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কালীঘাটের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। পথে সাহেব নফরকেষ্টকে ফাঁকি দিয়ে নেমে পড়ে। নফরকেষ্ট কলকাতা চলে যায়। চুরির ঘটনা ও কৌশল বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে অলংকার-গরবিনী আশালতার বাপের বাড়ির খবর। তার স্নেহময়ী মায়ের আতিথেয়তা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাদা মধুসূদনের সংগ্রামের কথা। এদিকে সাহেব পচা বাইটার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পচা বাইটার আসল নাম পঞ্চানন বর্ধন। চুরির সময় চলাফেরা, কান দিয়ে পদশব্দ শোনা, কিংবা চুরির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে করণীয় সবকিছুই শিখিয়েছে পচা বাইটা। এমনকি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পচা বাইটার আসনের তলায় রাখা গহনা চুরি করে হাতে দিয়েছে গুরুর। গুরু আশ্চর্য হয়েছে সাহেবের কাজে। পচা বাইটার একাকিত্ব ও নিসঙ্গ জীবন, কড়া সংসারি নায়েব মুরারি, ধর্মনিষ্ঠ স্কুলপন্ডিত মুকুন্দ, মুকুন্দ ও সুভদ্রার দাম্পত্য সম্পর্ক, সুভদ্রার সঙ্গে তার সম্পর্কের অনির্দেশ্য মাধুর্য - এ সবই গার্হস্থ্য জীবনের ছবি উদ্ঘাটিত হয়েছে এই অংশে। সাহেবের কাছে চোর পচা বাইটা যেন সিদ্ধপুরুষ। এরপর কানাইডাঙায় এসে সাহেব জেনেছে গাঙ্গুলি বাড়ির খবর। কনিষ্ঠ সহোদর হাকিমের পেশকার অনন্ত ও তার নিষ্ঠাবতী বিধবা ভগ্নী নমিতার গোপন প্রেমকাহিনী তুলে ধরেছেন লেখক। এরই মধ্যে কালীঘাটে ফিরে পালিতা না সুধাময়ীর মৃত্যু সংবাদ জেনেছে। তবে মায়ের শোচনীয় মৃত্যুতে তার মনে কোন গভীর রেখাপাত করেনি। রাণীর প্রেমও ফিরে পায়নি। সে যেভাবে গঙ্গার জলে ভেসে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই ছন্নছাড়া অসামাজিক জীবন নিয়ে তৃণলতার মত ভেসে গেছে। শেষে মধুসূদনের চুরির ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছে।

'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাহেব। সাহেবের জীবনকে কেন্দ্র করেই এসেছে - সুধামুখী, রাণী, পারুল, নফরকেষ্ট, সুভদ্রা, আশালতা, নমিতা, মধুসূদন, পচা বাইটা, বলাধিকারী ইত্যাদি চরিত্রগুলি। গঙ্গার ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন সুদর্শন চেহারার অধিকারী সাহেব। সাহেব সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

> ''দলের যে মধ্যমণি - সাহেব - তাহার চরিত্রে দুঃস্থের প্রতি দয়া, ন্যায়নীতির প্রতি ঝোঁক, সৎগৃহস্থের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মানুরাগ মাঝে মধ্যে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, তাহার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। সে যেন তস্কর-জগতের হ্যামলেট দার্শনিক চিন্তার আধিক্যে তাহার হাত হইতে সিঁদকাঠি স্খলিত হইয়া পড়ে ও

> অপহৃত ধন আবার গৃহস্থের ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায়। তাহার এই ভাবাতিশয্য কতকটা তাহার প্রকৃতিগত, কতকটা পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত।''[৬]

কালীঘাটের আদি গঙ্গায় ভেসে আসা পিতৃ-মাতৃহীন ছেলে সাহেব। গায়ের রং ফর্সা তাই নাম সাহেব। কেতাবী নাম গণেশ পাল। সে মানুষ কদর্য পরিবেশে হীনবৃত্তির এক স্ত্রীলোকের কাছে। তাকে দেখলেই অভূতপূর্ব বাৎসল্যের উদয় হয় মনে। মেয়েদের জননী স্বভাবের কারণে সুধামুখী তাকে মায়ের স্নেহ উজাড় করে দিয়েছে। কিন্তু সাহেবের অন্তরাত্মা ব্যাকুল পিতার জন্য।

ক্ষুন্নিবৃত্তির নিষ্ঠুর প্রয়োজন রাণীর কানের মাকড়ি চুরির মধ্যদিয়েই নিশিকুটুম্ব হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু সাহেবের। সাহেব চুরি করতে নেমে নফরকেষ্টর কাছে শিক্ষা পেয়েছে হাতে-কলমে। সময় সুযোগ অনুযায়ী শিক্ষা পেয়েছে বলাধিকারীর কাছে, পচা বাইটার কাছে। সাহেবের চৌর্যকর্মের মধ্যেই রয়েছে দক্ষতার ছাপ। চলন্ত ট্রেনে চুরি, সুভদ্রার চূড় চুরি করে ফিরিয়ে দেওয়া, সজাগ সচেতন স্ত্রীলোকের পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করে মাল চুরি, ঘুমন্ত নারী দেহ থেকে একে একে গহনা খুলে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে দক্ষতার ছাপ। আবার বিপদ বুঝে সঙ্গীদের পালাতে সাহায্য করেছে সাহেব।

সাহেবের মানসিক আচরণ সম্পর্কে লেখক একজায়গায় বলেছেন:

> ''অমৃতের বেটাবেটি সব, ভালো না হয়ে উপায় আছে।''[৭]

সাহেব খারাপ হতে চেয়েও খারাপ হতে পারেনি। সাহেব চোর কিন্তু তার হৃদয়ের অন্তরালে মানবিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহেব দয়াবান, কোমল হৃদয়। সে মেয়েদের কান্না সহ্য করতে পারে না। চুরির পর নিস্ব গৃহস্থের জন্য তার স্নেহপ্রবণ মন কেঁদেছে। অনেক জায়গায় সে চুরি করা জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছে। এই মনোবৃত্তি চোরের নয়। লেখকের কথায়–

> ''জন্মসূত্রে পাওয়া ভালমানুষি মনের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চেষ্টা করেও রোধ করতে পারে না।''[৮]

নয় বলেই তার মনে এক প্রকার অস্বস্তি ও যন্ত্রণা আছে। যন্ত্রণার মূলে রয়েছে সৎজীবনের প্রতি লোভ। এই জন্যই চোর হয়েও মানুষের কাছ থেকে সে কুড়িয়েছে অজস্র স্নেহমমতা।

সাহেবের গুরুভক্তির তুলনা হয় না। সে জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত গুরুর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। গুরুকে সেবা করে মন জয় করেছে; শিখে নিয়েছে চুরির কৌশল। তার পেশা চুরি করা হলেও সে কখনও ধর্মচ্যুত হয়নি। নারীর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে তার দেহ থেকে একে একে সমস্ত গয়না খুলে নিলেও নারীর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি।

সোনাখালি গ্রামের অধিবাসী পঞ্চানন বর্ধন। গ্রামের সবাই তাকে চেনে পচা বাইটা নামে। বাড়ির কারোর সঙ্গে পচা বাইটার মনের মিল নেই। ছেলেরা বাপের পরিচয় দিতে চায় না। বাপের পরিচয়ে ছেলেরা লজ্জা বোধ করে। পচা বাইটা মাকে খুব ভক্তি করে। সে দারোগাকে জানিয়েছে—

> ''আমি যদি একগুণ হই মা আমার এক'শ গুণ। মায়ের গুণেই যা আমার শিক্ষাদীক্ষা।''[৯]

চোরাই মাল ধরা পড়ায় পচা বাইটার মায়ের যখন জেল হবার উপক্রম মাকে বাঁচাতে পচা নিজেই জেল খাটতে চলে গেল।

পচা বাইটা সাহেবের শিক্ষাগুরু। প্রতিটি বিষয় নিঁখুত ভাবে শিখিয়েছে। শিক্ষায় কোন রকম গলদ রাখেনি। চুরির হুবহু নির্ভুল শিক্ষা দিয়েছে। পচা বাইটা সাহেবকে খুব স্নেহ করে, ভালবাসে। সে সাহেবকে বলেছে —

> ''বড় শক্ত কাজ। তেমন গুণী লোক এখন কম। সেইজন্যে বলি মন্তোরে ভরসা না রেখে ক্রিয়াকর্মের উপর জোরটা বেশি দিবি তুই।''[১০]

অভ্যাস বসে সে নিজেরই বাড়তেই চুরি করেছে। বৃদ্ধ বয়সে খাদ্যবস্তুর প্রতি লোভে নিজের বাড়িতে পিঠে-পুলি চুরি করতে দেখা গেছে। বাড়ির লোকেরা সবাই যেন তার শত্রু। পচা বাইটা বলেছে সাধু আর চোরের তফাৎ উনিশ আর বিশ। পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে —

> ''শরীরের কষ্ট নিয়ে সাধু সন্ন্যাসীর ভ্রুক্ষেপ নেই, চোরেরও ঠিক তাই। সাধুরা সত্যনিষ্ঠ, নিজ দলের মধ্যে চোরও তাই। বেচাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দল-ছাড়া করবে। খাঁটি সাধু কামিনী-কাঞ্চনে বিরাগী, মোক্ষলাভ তাঁর সাধনা। চোর এইখানটা একটি ধাপ নিচে কামিনীতে বিরাগী, কাঞ্চনে সাধনা তার।''[১১]

পেশায় দারোগা ছিলেন জগবন্ধু বলাধিকারী। পণ্ডিত মানুষ। তাঁর মুখ দিয়েই লেখক কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। চোরের দলে আসার পর থেকে তার কাজ হল চোরাই মাল-এর ব্যবস্থা করা। লোকে জানে তেজারতি কারবার। চোরেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়। তিনি চোরেদের দলপতি। যাবতীয় হিসাব নিকাশ তিনি নিজ হাতে রাখেন। চোরেদের শাস্ত্র সম্পর্কে বলাধিকারী শোনান –

> ''চোর চক্রবর্তী নাম রহে যেই ঘরে।
> চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার বাড়িরে।।''[১২]

বা –

> ''এই পুঁথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে।
> তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে।।''[১৩]

তিনি দলকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন।

ক্ষুদিরামের বাপ-ঠাকুরদা পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। ক্ষুদিরাম পড়াশোনা শেষ করে টোল চালাতেন। গ্রামে চুরি বন্ধ করার জন্য গড়ে তোলেন রক্ষীবাহিনী। রাত জেগে পাহারা দেন। কিন্তু চুরি আটকানো গেল না। একদিন ক্ষুদিরাম নিজের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেল –

> ''মানি ঘরের ছেলে ক্ষুদিরাম, টোল পড়া বিদ্বান, গ্রামের সকল সৎকর্মে অগ্রনী ভিতরে ভিতরে মানুষটা এই।''[১৪]

এ যেন সাপ হয়ে ছোবল দেওয়া, ওঝা হয়ে ঝাড়ানো। এই ঘটনার পর ক্ষুদিরামের যোগাযোগ হয় চোরেদের সঙ্গে বলাধিকারীর মাধ্যমে। কেননা জগবন্ধুর গোমস্তা ও ক্যাশিয়ার হলেন ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরামের বর্তমান কাজ খুঁজিয়াল। তিনি সংবাদ গ্রহণে পটু। হস্তরেখা বিচারে পারদর্শী। নৌকায় বসে নানান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সকলকে শোনান। শ্রোতারা মনযোগ দিয়ে শোনেন। নানা কথাবার্তার মধ্যদিয়ে বাড়ির খুঁটিনাটি সহজেই যেনে জান।

নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সুধামুখী অন্যতম। সে নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দা। গঙ্গার ঘাট থেকে শিশু সাহেবকে তুলে এনে লালন পালন করে। মাতৃত্বের স্বাদ পেয়ে জীবনের দুঃখ ভোলার চেষ্টা

করেছে। কিন্তু সাহেব বড় হয়ে সুধামুখীকে ফেলে চলে যায়। একাকিত্ব অবস্থায় থাকতে থাকতে বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। নিষিদ্ধ পল্লীর পারুলের মধ্যেও রয়েছে মাতৃত্বের আস্বাদ। মানবদরদী লেখক দুঃখী মানুষের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। লম্পটদের খুনীর সঙ্গে তুলনা করে পারুল বলেছে –

> ''মানুষ খুন করলে তো ফাঁসি হয়। আমাদেরও খুন করেছে। খুনেই শোধ যায়নি, মড়া নিয়ে খোঁচাখুচি করে খুনেরা এসে। এতে আরও বেশি করে ফাঁসি হবার কথা।''[১৫]

সুধামুখী এবং পারুলেরা মানুষের লালসার শিকার হয়েও মাতৃত্বকে বিসর্জন দেয়নি। মানুষের লালসার শিকার হয়েছে বলেই এরা পেয়েছে লেখকের সহানুভূতি।

পারুলের মেয়ে রাণীও সতী-সাধ্বী গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিল। সাহেবের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়েও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে ভাল হতে দেয়নি। মায়ের মতই নিষিদ্ধ পল্লিতেই ঠাঁই হয়েছে তার।

মনোজ বসুর বহুচর্চিত ও প্রশংসিত উপন্যাস 'নিশিকুটুম্ব'। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:

> ''দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপন্যাসে চোরের ইতিহাস যেমন একটা ছলনালীলা বলিয়াই মনে হয়। ইহারই অজুহাতে আমরা অসংখ্য, বিচিত্র নরনারীর জীবনমেলায় কৌতূহলী দর্শকরূপে উপস্থিতি হইবার সুযোগ পাই। চোরের পথ অনুসরণ করিয়া আমরা কত গ্রামে প্রবেশ করি,কত গৃহস্থের অন্তঃপুরের পরিচয় পাই, কত হৃদয়-রহস্যের ইঙ্গিতে উন্মনা হই। নববিবাহিতা অলঙ্কারগরবিনী আশালতার বাপের বাড়ীর খবর, তাহার মায়ের স্নেহময় আতিথেয়তা, তাহার দাদা মধুসূদনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম, চোরের দীক্ষাগুরু পচা বাইটার প্রতিষ্ঠাবান পুত্রদের সংসার, পচার নিঃসঙ্গতা ও সাধু পুত্রদের প্রতি অভিমান অনুযোগ, কড়া সংসারী নায়েব মুরারির, ধর্মনিষ্ঠ স্কুলপণ্ডিত মুকুন্দ, মুকুন্দ ও সুভদ্রার অভিমানবিদ্ধ দাম্পত্য সম্পর্ক, চৌর্যবিদ্যাশিক্ষার জন্য সাহেবের পচার শিষ্যত্বস্বীকার ও অনলস সেবা,সুভদ্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্কেও অনির্দেশ্য মাধুর্য - এই সমস্তের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের কি উজ্জ্বল চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। বিশেষত: পচাকে একটা সিদ্ধপুরুষ বানাইবার চেষ্টা ও তাহার গৃহের প্রতি একটা সিদ্ধপীঠের মহিমা আরোপ যেন একটা নবদেবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ভক্তিরসাপ্লুত দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরে। তাহার উপর কানাইডাঙার গাঙ্গুলিবাড়ি, কনিষ্ঠ সহোদর হাকিমের পেশকার অনন্ত, তাহার নিষ্ঠাবতী, গোপন প্রেমলীলা বিহারিণী

> বিধবা ভগ্নী নমিতা ও সাহেবের চুরি করিতে গিয়া এই ব্যাভিচার নিবারণ চেষ্টার আসল উদ্দেশ্য বিস্মরণ - সবই যেন একটা কৌতুকোজ্জ্বল কমেডির পাতার মত আমাদিগকে মুদ্ধ করে। এই সরল সমাজচিত্রগুলি এই চৌরকাহিনীর উপরি পাওনা।''[১৬]

দুই খণ্ডে বিন্যস্ত এই উপন্যাসে সাহেব চোর হওয়ার প্রথম দীক্ষা পায় নফরকেষ্ট-এর কাছে। ধীরে ধীরে পরিচয় ঘটতে থাকে খ্যাতনামা চোর পচা বাইটার যোগ্য শিষ্য সাহেবদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্ধকারের মানুষগুলোর। সেইসঙ্গে উন্মোচিত হতে থাকে এই অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষগুলোর করুণ ইতিবৃত্ত। করুণায়, ভালোবাসায় হৃদয় আদ্র হয় এই নিশিকুটুম্ব নামধারী মানুষগুলোর জন্য। সাহেব চৌর্যবিদ্যা শিক্ষার পর সেগুলিকে নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছে। সাহেবকে কুড়িয়ে পাওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে চোর হয়ে ওঠা এবং চুরিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে অর্থ সংগ্রহের পর শেষপর্যন্ত নরম কোমল মানসিকতার জন্য কারাবাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী এই উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। নিশিকুটুম্ব বা রাতের অতিথি বলতে চোর কে বোঝাতে চাইছেন লেখক। উপন্যাসের শুরুতে সেই আশ্চর্য চৌর্যকলার নিখুঁত বর্ণনা আমাদের সমগ্র উপন্যাস সম্পর্কে উদগ্রীব ও কৌতূহলী করে তোলে। - এইখানেই উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা।

স্বর্ণসজ্জা

মনোজ বসুর 'স্বর্ণসজ্জা' (১৯৬৪) উপন্যাসটি রোমান্স প্রধান। বাদা অঞ্চলে নিম্নভূমির সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার নীরিখে রচিত এই উপন্যাসটির পরিণতি বিষাদমূলক।

উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে চন্দ্রভানু রায়ের ঘটনা। আর দ্বিতীয় পর্বে চন্দ্রভানুর ছেলে ধ্রুবভানুর প্রসঙ্গ। চন্দ্রভানু রায়ের পূর্বপুরুষেরা একসময় গাঙে-খালে নৌকো মেরে বেড়াতো। চন্দ্রভানুর বাবার আমল থেকে থেকে পেশা পরিবর্তিত হয়েছে। গড়ে তুলেছে সাগরচক। সাগরচকে উৎপন্ন ফসলই রায়বাড়ির বিশাল সংসারের যাবতীয় যোগান দেয়। চন্দ্রভানুর স্ত্রী ইন্দুমতী। ধূমধাম করে দুর্গাপূজা করেন। কিন্তু পূজার আগেই হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে যান ইন্দুমতী। শয্যাশায়ী অবস্থা। পূজার আয়োজন কিভাবে হবে তাই নিয়ে রায় বাড়ির

দুঃচিন্তার সীমা নেই। চন্দ্রভানু এবং ছেলে ধ্রুবভানুর চেষ্টায় পূজার সমারোহ শেষ হল। বাড়ির দাস-দাসীরা বলে –

> "ছোট বউ উঠতে পারে না, কাজ কিছু আটকে থাকল তাতে ? কলের মতো সব হয়ে গেল, টু-শব্দটা নেই। ওঁর কেবল তো চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাটি, মাতবরি দেখানো - লোকে তাতে দিশা করতে পারে না। কাজে ভুলচুক হয়ে যায়। দেখ, অন্যবারের চেয়ে ভালো হল কিনা।"[১]

পূজার সমারোহে রায় বাড়িতে আমন্ত্রিত লালমোহন মিত্তির। কুচোচিংড়ির ব্যবসা করেন। দেখতে দেখতে বেশ উন্নতিও করেছে। রায় বাড়ির আপ্যায়নে তিনি মুগ্ধ। মিষ্টভাষী, বিনয়ী ধ্রুবভানুকে ভালোলাগে লালমোহনের। তার একমাত্র মেয়ে মীনাক্ষীর সঙ্গে ধ্রুবভানুর বিয়ে দিতে চায়। চন্দ্রভানুর কাছে প্রস্তাব রাখে —

> "ধ্রুবকে বড্ড ভালো লেগেছে। মীনাক্ষীকে নিয়ে নিন আপনি - ঐ আমার মেয়ে।"[২]

রাজী নয় চন্দ্রভানু। পূজা শেষ হলেও ইন্দুমতীর পীড়াপীড়িতে চন্দ্রভানু সাগরচকে আর যেতে পারেননি। সাগরচক দেখা শোনার দায়িত্ব এখন বৃন্দাবনের। বৃন্দাবনের কাছ থেকে, ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি আসতে শুরু করে। রায় বাবুর অনুপস্থিতিতে সাগরচকের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে শুরু করেছে। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। চন্দ্রভানু ডাক্তার ও নীহার-নলিনীকে বাড়িতে ডেকে নেন চন্দ্রভানু। ডাক্তার ইন্দুমতীকে পরীক্ষা করে। কবিরাজের মতো তিনিও কোনো আশার আলো দেখাতে পারেন না। ইন্দুমতীর সঙ্গে নীহার-নলিনীর ভাব জমতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত চন্দ্রভানু মিথ্যা প্রেমের অভিনয় শুরু করে নীহারের সঙ্গে। ইন্দুমতি ভাবতে শুরু করে এ কারণেই বুঝি ছোটরায় সাগরচকে পড়ে থাকত। চন্দ্রভানুর উদ্দেশ্য সফল হয়। চন্দ্রভানু সাগরচকের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

চন্দ্রভানু সাগরচকে চলে যাওয়ার দিন দশেক পরে ধ্রুবভানু শহর থেকে বাড়ি আসে। ঘটনাক্রমে লালমোহনের কন্যা মীনাক্ষীর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। ধ্রুবভানু নৌকা ডুবির হাত থেকে বাঁচিয়েছে মীনাক্ষীদের। ধ্রুবভানু তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু ধ্রুবভানুর পরিচয় জানতে পেরে মীনাক্ষীরা নৌকা ঘাটের দিকে রওনা দেয় –

> "পাষাণমূর্তির মতো ধ্রুব দাঁড়িয়ে রইল। ফটক অবধি এসে ছুটে পালানো – পরিচয় বুঝতে পেরে বাড়ি ঢুকতে ঘৃণা ?"[৩]

কেননা, ধ্রুবর বাবা বিয়ের ব্যাপারে প্রত্যাক্ষ্যাণ করেছিল মীনাক্ষীকে। অপমানে জ্বলতে থাকে ধ্রুব।

চন্দ্রভানুর নীলবোট সাগরচকে পৌঁছালো। সাগরচক নদীর গ্রাসে যেতে বসেছে। চন্দ্রভানু পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। সেচ বিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বললেন। নদীর স্রোতের টান ঘুরিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। প্রয়োজন হল বাঁধ দেওয়ার। লোক লাগল অন্তত শ পাঁচেক।

> "জলের বেগ আটকাতে স্রোতের জলের মতোই পয়সা খরচ। চলেছে সেই সব ব্যবস্থা।"[৪]

কিন্তু ফল কিছুই হল না। সমস্ত মাটি চক্ষের পলকে নদীর জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাতেও চন্দ্রভানু হাল ছাড়লেন না। রাতের অন্ধকারে নীলবোট পাড়ি দিল সোনাছড়ি। লালমোহনের মেয়ের সঙ্গে ধ্রুবভানুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সঙ্গে বরপণ। যা সাগরচকে নদী কাটতে খরচ হবে। বিয়ের কথা পাকা করে চন্দ্রভানু সদরে গেলেন নদীর সঙ্গে লড়াই -এর প্রস্তুতি নিতে। সদর থেকে ফিরে বেলডাঙা। শহর থেকে ধ্রুবভানুকে ডেকে পাঠানো হয়। পরীক্ষার পড়া ছেড়ে বাড়ি ফিরে সে জানতে পারে বিয়ের জন্য জরুরী তলব। ধ্রুবভানু বিয়ে করতে অস্বীকার করে। রাতের অন্ধকারে চন্দ্রভানু ছেলেকে সাগর চকের বৃত্তান্ত শোনায়। ধ্রুবভানু সমস্ত শুনে বাবার কথা মতো লালমোহন-এর মেয়ে মীনাক্ষীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে বাঁধা পড়ল।

কাহিনীর দ্বিতীয় পটে মীনাক্ষী রায়বাড়িতে। মীনাক্ষীর সঙ্গে রায়বাড়ির আশ্রিতা হতভাগিনী কিরণবালার ভাব জন্মেছে। কিরণবালা মীনাক্ষীকে সাবধান করে বলে –

> "এরা ভাই সুন্দরবনের বাঘ। বাঘ পোষ মানে না, এরাও তাই। পোষ মানাতে পারবিনে, তবে সর্বদা নজরে নজরে রাখবি - বেচাল কিছু করতে না পারে। অন্তত এই রায়বাড়ির ভিতরে।"[৫]

আসতে আসতে বাড়ির কর্তৃ হয়ে উঠল মীনাক্ষী। বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রভানু সাগরচক থেকে ফিরে এল। মাত্র কয়েকটা দিন থাকার পর আবার সাগরচকে পাড়ি দিল নীলবোট। কিন্তু মাস খানেক যেতে না যেতেই চন্দ্রভানু মারা গেল। দুর্যোগের মধ্যেও

ছোটরায়কে দেখার জন্য জনতা ভিড় জমাল। কিন্তু বোট বেলডাঙা ছাড়িয়ে চলল কুসির বটতলায়। বৃন্দাবন ধ্রুবকে জানায়—

> "মড়ার উপরের কাপড় সরিও না। কাপড়ের উপরেই জল ঢেলে চান করাবে। কাপড়চোপড় বিছানা - পত্তর ফুলটুল সবসুদ্ধ চিতায় তুলে দেবো।"[৬]

ধ্রুব বৃন্দাবনের কথা শুনে অবাক। বাবার মুখ দেখতে চাইলে বৃন্দাবন জানায় —

> ''মানুষই নয়। গরানে ছিটেয় খড় জড়িয়ে ছোটরায় সাজানো। জানি কেবল আমি আর ওরা ঐ পাঁচ জন।''[৭]

এবার বৃন্দাবন আসল কথাটা জানায়। ছোটবাবুকে মেরে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। লাস নিঁখোজ।

বাবার মৃত্যুর পর ধ্রুবভানুর উপর সমস্ত দায় এসে পড়ে। বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। বাড়ির ঝি-চাকরের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মীনাক্ষীর বাবা লালমোহন মেয়ের খবর নিতে আসে। তার পূর্বে সঙ্গী ভক্তদাসকে নিয়ে সাগরচক দেখতে যায় লালমোহন। কিন্তু সাগরচক কোথায় ? চারিদিকে ধূ-ধূ জলরাশি। লালমোহন হাহাকার করে ওঠে –

> "সাগরচকের জাঁক কানে শুনেই মজলাম। মেয়ে দেবার আগে একটিবার চোখে কেন দেখে গেলাম না।"[৮]

লালমোহন নিজের ক্ষোভের কথা বললেন ধ্রুবভানুকে। ধ্রুবভানু এড়িয়ে গেলেন। এরপর থেকেই ধ্রুবভানুর মনে হাসি নেই, আনন্দ নেই। রাতে ঘুমোতে পারে না। একদিন নিভৃতে মীনাক্ষীর সমস্ত গহনা নিয়ে নিলেন। এরই মধ্যে বৃন্দাবন এসেছে ধ্রুবর কাছে। টাকার দরকার। আবার সাগরচক গড়ে তুলতে। ধ্রুব রাজি নয়। তা সত্ত্বেও ধ্রুব বৃন্দাবনের ডিঙিতে চড়ে পাড়ি দেয়; সঙ্গে মীনাক্ষীর গহনার পোঁটলা।

একদিন পরে ধ্রুব বাড়ি ফিরে আসে। ধ্রুবকে হাসিখুশি দেখে মীনাক্ষীর বড় আনন্দ। কিন্তু মীনাক্ষীর গহনা নিয়ে বাড়ির অন্দর মহলে নানাকথা উঠতে শুরু করে। হঠাৎ করে রায়বাড়ির আশ্রিতা কিরণবালা স্বামীর ডাক পায়। রায় বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি যায় কিরণবালা। এতে কেউ কেউ গূঢ় রহস্য আছে বলে উপলব্ধি করে। মীনাক্ষী গহনার জন্য জোর করতে শুরু

করলে ধ্রুব বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কোনো খোঁজ খবর নেই। কয়দিন পরে মীনাক্ষীও ঠাকুমাকে দেখতে গেল সোনাছড়ি। সেখানে গিয়ে জানতে পারল –

> "গয়না কিরণবালা বা অন্য কারো গায়ে ওঠেনি, অভিমানী ধ্রুব এইখানে লালমোহনকে ফেরত দিয়ে গেছে। সামলে নিতে কিছু সময় লাগে মীনাক্ষীর। কালিমা কেটে গিয়ে তারপর সারামুখ ঝিকমিকিয়ে উঠল।"[৯]

সমস্ত গহনা পরে শ্বশুর বাড়ি রওনা দিল মীনাক্ষী। ফিরে গিয়ে ধ্রুবর কাছে ক্ষমা চাইবে; স্বামীকে ভুল বোঝার জন্য। ধ্রুব কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করে ফিরে আসে। সবাইকে নিয়ে কলকাতায় থাকবে সে। কিন্তু স্ত্রীর জন্য গহনা জোগাড় করতে বৃন্দাবনকে আদেশ দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃন্দাবন মীনাক্ষীর নৌকাকে আক্রমণ করে। মীনাক্ষী জলে ঝাঁপ দেয়। বৃন্দাবনেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে গহনা নিয়ে এসে তুলে দেয় ধ্রুবভানুর হাতে। জানায় মেয়েটি মারা গেছে। আর গহনা থেকে —

> "সকলের আগে যে বস্তুটা বের করে ধরল – সৌভাগ্যকঙ্কন, অপরূপ কারুকার্য – মকরমুখের দুজোড়া চোখে লাল-টুকটুকে পাথর জ্বলজ্বল করছে।"[১০]

'স্বর্ণসজ্জা' উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধান চরিত্র দুটি হল – চন্দ্রভানু ও তার ছেলে ধ্রুবভানু। চন্দ্রভানু রায় পূর্বপুরুষে মতোই সাগরচক নিয়েই পড়ে থাকত। স্ত্রীর অসুস্থতায় বাড়ি ফিরে আসে। বেশ কিছুদিন পর সাগরচকে ফিরে বুঝতে পারে, সাধের সাগরচক আর রক্ষা করা সম্ভব নয়। একসময় লালমোহনকে তিরস্কার করেছিল চন্দ্রভানু। কারণ লালমোহন কুচো চিংড়ির ব্যবসা করে। সে চেয়েছিল ধ্রুবভানুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে। কিন্তু এখন সাগরচক বাঁচাতে টাকার প্রয়োজন। টাকার বিনিময়ে মীনাক্ষীর সঙ্গে ধ্রুবর বিয়ের ব্যবস্থা করে। শেষপর্যন্ত ঐ সাগরচকের লোকেরা ছোটবাবু চন্দ্রভানুকে মেরে জলে ভাসিয়ে দেয়। লাশ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এক সময়ের দোর্দন্ড প্রতাপ ছোটবাবুর করুণ পরিণতি দেখানো হয়।

অন্যদিকে ধ্রুবভানু শহরে পড়াশুনার জন্য থাকে। পূজোর সময় বাড়িতে এসে অতিথি লালমোহনের সেবা করে। যার কারণে লালমোহন তাকে জামাই করতে চায়। পরোপকারী মানসিকতায় মীনাক্ষীদের নৌকা নদীর জলে ডুবতে বসলে তাদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্রুব। বিয়ের পর সুখের জীবনে বিপর্যয় নামল পিতার মৃত্যুতে। পরে আবার শ্বশুর লালমোহন

এসে শুনিয়ে গেল অনেক অপমানকর কটুক্তি। এরপর থেকেই ধ্রুবর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সকলের অজান্তে স্ত্রী সমস্ত গহনা ফেলে আসে লালমোহনের বাড়িতে। কিন্তু রায় বাড়ির অন্দরের কানা ঘুষো এবং হঠাৎই কিরণবালার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাওয়া নিয়ে মীনাক্ষীর মনে সন্দেহের জাগরণ ঘটে। স্ত্রী মীনাক্ষীকে নিয়ে কলকাতা যাওয়ার আগে গহনা জোগাড় করার আদেশ দেয় বৃন্দাবনকে। বৃন্দাবন মীনাক্ষীর শরীর থেকে গহনা খুলে এনে দেয় ধ্রুবভানুর কাছে। এই সোনাই মীনাক্ষীকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুতে।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে লালমোহন, মীনাক্ষী, ইন্দুমতী, কিরণবালা কিছুটা কাহিনীকে গতি দান করেছে। লালমোহন অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল। তাই ধ্রুবভানুকে জামাই করতে চায়। বড়ো বাড়িতে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার লোভে অনেক টাকা পণও দেয়। কিন্তু যখন জানতে পারল চন্দ্রভানুর সাগরচকের অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। তখন হাহাকার করে ওঠে –

> "সাগরচকের জাঁক কানে শুনেই মজলাম! মেয়ে দেবার আগে একটিবার চোখে কেন দেখে এলাম না ?"[১১]

মেয়ে মীনাক্ষীকে সাবধান করে বলে –

> "পানসি ভরে বরসজ্জা পাঠিয়েছি, মাথা থেকে পা অবধি তোকে গহনায় সাজিয়ে দিয়েছি - তার এক কণিকা থাকবে না। বেচে খাবে একটা দুটো করে। শেষ হয়ে গেলে তখন কি হবে এই ফুটো ইজ্জতের ?"[১২]

মীনাক্ষী ধ্রুবকে বিয়ে করেই খুশি ছিল। কিন্তু পিতা লালমোহনের কয়েকটি উক্তিই তার জীবনকে বদলে দিল। সেইসঙ্গে রায়বাড়ির কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা তার জীবনে নামিয়ে আনল বিপর্যয়। ধ্রুবর মা ইন্দুমতী উপন্যাসের সূচনাতে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি স্বমহিমায় বিরাজ করতে পারলেন না অসুস্থতার কারণে। উপন্যাসের প্রথম পর্বে কিরণবালার কোনো গুরুত্ব না থাকলেও দ্বিতীয় পর্বে কাহিনীর অগ্রগতিতে গুরুত্ব পেয়েছে চরিত্রটি। রায়বাড়ির পুরুষদের সম্পর্কে সচেতন করে কিরণবালা মীনাক্ষীকে বলে –

> "এরা ভাই সুন্দরবনের বাঘ। বাঘ পোষ মানে না, এরাও তাই। পোষ মানাতে পারবিনে, তবে সর্বদা নজরে নজরে রাখবি - বেচাল কিছু করতে না পারে।"[১৩]

মীনাক্ষীর কাছ থেকে ধ্রুব গহনা নিয়ে নেওয়ার পর হঠাৎ করে কিরণবালা শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়া এইসব ঘটনার মাধ্যমে চরিত্রটি গুরুত্ব পেয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাগরচককে নির্ভর করেই রায়বাড়ির বিলাস বৈভব। সেই সাগরচক নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার পর চন্দ্রভানুর অকাল মৃত্যু। সেইসঙ্গে ধ্রুব ও মীনাক্ষীর সুখের দাম্পত্য জীবনে ধীরে ধীরে আগুন জ্বলতে শুরু করে। মীনাক্ষীর সমস্ত গহনা ধ্রুব শ্বশুর লালমোহনকে ফেরৎ দিয়ে এলেও মীনাক্ষী ভাবল সমস্ত গহনা বোধহয় কিরণবালাকে দিয়েছে ধ্রুব। সন্দেহ বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে ধ্রুব কাউকে কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। অভিমানী মীনাক্ষী বাপের বাড়ি যায়। সেখানে জানতে পারে সমস্ত সত্য ঘটনা। সমস্ত গহনা নিয়ে ধ্রুবর কাছে ফিরে আসার সময় নৌকা আক্রমণ করে বৃন্দাবনের দলবল। মীনাক্ষী জলে ঝাঁপ দেয়। মারা যায়। নদীর মধ্য থেকে মৃতদেহ খুঁজে সমস্ত গহনা এনে দেয় ধ্রুবর হাতে। সেই গহনা দিয়েই নাকি ধ্রুব মীনাক্ষীর মান ভাঙিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনবে। সোনার গহনাই উপন্যাসের শেষের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আবার মীনাক্ষীর মৃত্যুর কারণও সোনার গহনা। তাই নামকরণ হয়েছে শিল্পসম্মত ও ইঙ্গিতবাহী।

ছবি আর ছবি

দেশবিভাগের ফলে মনোজ বসুর শিল্পীমন গভীরভাবে আহত হয়েছে। পল্লীপ্রাণ লেখক মনোজ বসু পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ দেশে পরবাসী হওয়ার যন্ত্রণায় কাতর। মর্মবেদনায় ভুক্তভোগী লেখক 'ছবি আর ছবি' তে (১৯৬৫) আত্মকথনের ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন সেই অনুভব।

'ছবি আর ছবি' স্মৃতিচারণমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস। দেশভাগের কারণে অনন্ত নামে নির্বাসিত একটি মানুষ বেদনার বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় শহরের দালানকোঠার মধ্যে। সে লিখে যাচ্ছে স্মৃতির ছবি – 'ছবি আর ছবি'। পাঠকের বাহবা পাওয়ার জন্য নয়, ছবির পায়চারি করে করে সে নির্বাসনের দুঃখ ভোলে। এই অনন্ত যে আসলে লেখক নিজেই, সেকথা বহু জায়গায় ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন। অনন্ত একজায়গায় আক্ষেপ করেছে –

> ''হায় রে হায়, এই সুতিঘাটার গল্প আবার আমায় নতুন করে লিখতে হল। এইতো সেদিন। 'কান্নার গাড়ি' সে গল্পের নাম। নজরে পড়েছে।''[১]

‘কান্নার গাড়ি’ প্রকৃতপক্ষে মনোজ বসুরই রচনা। এই উপন্যাসের মধ্যে মনোজ বসুর শিক্ষক জীবনের কথাও আছে। এই অনন্তর বাড়ি উল্লেখ করা হয়েছে ডোঙাঘাটায়। ডোঙ্গাঘাটা আসলে লেখকেরই জন্মস্থান।

‘ছবি আর ছবি’ উপন্যাসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতায় যে দেশবিভাগ হয়েছে তার কুফলগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। তিনি রাজনৈতিক নেতা নন। তিনি মানুষের বেদনা বোঝেন। সেই বেদনা নিয়ে তিনি দেখেছেন বাস্তুহারাদের দুর্গতি। দেশবিভাগের পর সংখ্যালঘুরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হল। শিয়ালদহ স্টেশনে নানান জায়গায় মানুষ যেভাবে দিন যাপন করছে, তা লেখকের মন ছুঁয়ে যায় —

> ‘‘স্বপ্নে এসে সেই সেকাল আমায় বলে...তুমি অমৃত সিঞ্চনের মতন কালির নিষেকে আমাদের বাঁচিয়ে তোল। .....সত্য জিনিসটাকে জাহির কর একালের সামনে।’’[২]

স্বপ্নের রাজপথ ধরে অনন্ত পাড়ি জমিয়েছেন ডোঙাঘাটার উদ্দেশ্যে। বাঁধাঘাট, নাগরগোপ, সুন্দলপুর, গড়ডাঙা, হরিতলা ইত্যাদি জায়গা পেরিয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌঁছেছেন ডোঙাঘাটায়। যাত্রাপথে, স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আশেপাশের মানুষজন ও গ্রাম। বইয়ের পাতায় ছবির মত একটার পর একটা ছবি স্মৃতিতে জাগরিত হয়ে উঠেছে। তাদের জীবন ও ঘটনার ছবি এঁকেছে হুবহু। মূলকাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি চরিত্রগুলির। গ্রাম-বাংলার জীবন-যাপন পদ্ধতি দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে গ্রামের মানুষদের আচার-আচরণ, ভোজন, কৌতূক প্রিয়তা, লোক-লৌকিকতা, বংশ মর্যাদা বিশিষ্ট রসমূল্য লাভ করেছে। ড. দীপক চন্দ্রের কথায় —

> “জন্মভূমি ডোঙাঘাটা তার আশেপাশের অঞ্চল এবং মানুষের সঙ্গে লেখকের নাড়ীর যোগ। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছন্দে ঘোরাঘুরির কোনো বাধা ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তিনি অনুভূতিপ্রবণ; গ্রামের শোভা-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হত তাঁর কবি-মন। শৈশবের বিমুগ্ধ কৌতূহল ফুটে উঠেছে তাঁর অসংখ্য রচনায়। ... যে সব উপাদান উপকরণ ঔপন্যাসিক জীবনের নেপথ্যে প্রেরণা জুগিয়েছে, ‘ছবি আর ছবি’ উপন্যাসে স্মৃতিবিধৃত সেই সব মানুষ ও ঘটনার ছবি। আনন্দ ও বিস্ময়বোধের তরঙ্গে ভেসে উঠেছে ডোঙাঘাটা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি।”[৩]

স্মৃতির চিত্রণে ডোঙাঘাটাকে তুলে ধরার পাশাপাশি লেখক মনোজ বসু সরকারী ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করতেও পিছুপা হননি। যে দেশের সরকার মানুষকে মানুষের মত রাখতে পারেনি সেই সরকারের প্রতি ভরসাহীন লেখক স্পষ্টতই হতাশ। দেশভাগের পর যে সব মানুষ দেশান্তরিত হয়েছেন তাদের থাকার কোনো জায়গা হয়নি। ভিড় জমে উঠেছে শিয়ালদা স্টেশনে। অনন্ত কিছুদিন আগেই চলে এসেছিল বলে তবু কলকাতা শহরের একটু জায়গা পেয়েছেন। এই সমাজে নীতি এবং আদর্শের কোনো দাম নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধুরন্ধররাই আজ হর্তাকর্তা। রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতার ফলে নীতি আদর্শও চলে গেছে সমাজ থেকে। লেখকের কথামত —

> ''সেকালের মানুষ বিবেক নামে কোন এক বস্তুর আর্তনাদ শুনত বুকের নীচে, শঙ্কিত হয়ে স্বার্থহীন এক একটা কাজ করে বসত। আদর্শ নামে এক মায়াবিনী ছিল, তার পিছনে দৌড়ে মরত। এখন তারা আর শব্দ সাড়া দেয়না — আপদগুলো সবংশে নিপাত গেছে অনুমান করি। কম চেষ্টা হয়েছে এর জন্য - সভ্যতার সেই আদি যুগ থেকে। যাঁদের মুখে নীতিমূলক কথা, বিষ খাইয়েছি তাঁদের। ক্রুশের উপর ভেলে পেরেক গেঁথেছি। ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি, গুলিবিদ্ধ করেছি। বোকামি ও ভীরুতার অবসান বুঝি এতদিনে।''[৪]

স্বাধীনতার জন্য, দেশ নায়কদের জন্য এত দিন ধরে লেখালেখির পর লেখকের মোহভঙ্গ হয়েছে। লেখক মনে করেন, স্বাধীনতা আমাদের কিছুই দিতে পারেনি। বরং যা কিছু ছিল ধর্ম মনুষ্যত্ব - বিবেক সব কিছুই হরণ করেছে —

> "ঊনিশ - শ সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট দিনটিতে আমাদের চোখের জল এসেছিল, নাটুদারা বেঁচে নেই বলে — স্বাধীনতার উল্লাস তাঁরা দেখতে পেলেন না। আজকে বড় সোয়াস্তি — ভাগ্যিস নেই তাঁরা, লাঞ্ছনা চোখে দেখতে হচ্ছে না। সেদিন যদি ফাঁসি এড়ানো যেত, আজকের দিনে নিশ্চয় তাঁরা নিজের কাপড়ে গলায় ফাঁস নিয়ে মরতেন।"[৫]

চারপাশের এই পরিস্থিতি লেখককে হতাশাগ্রস্থ করেছে। ডোঙাঘাটার পূর্বের পরিস্থিতি আজ আর নেই। নেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। অনন্ত তথা লেখক সেই হতাশার কথাই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন —

> "যুগান্তরই বটে! পিছনের পরিচয়-হীন আমরা, অতীত নিশ্চিহ্ন। স্বাধীনতার অথচ বিশটা বছরও যায়নি এখনো। ঘুরে ঘুরে আপনাকে দেখালাম — কানে যা শুনছেন

> আর চোখে যা দেখে এলেন, তিলেক মিল আছে দুয়ের মধ্যে ? বলুন। কোন এক দূর-কালের রূপকথা শুনিয়ে যাচ্ছি যেন আমি।"[৬]

উপন্যাসে সাধারণত একটি পূর্ণ কাহিনী থাকে। একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে ভিড় জমায় অন্যান্য চরিত্রগুলি। কিন্তু 'ছবি আর ছবি' গ্রন্থে কোন বিশেষ কাহিনী নেই। নেই কোন প্রধান চরিত্র। অনন্ত নামের চরিত্রটি যেন তার সাথীকে নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। এর ফলে অনেক চরিত্রই উপন্যাসে এসেছে, তারপর তারা বিদায় নিয়েছে। পৃথক পৃথক অনেক গল্পই তৈরী হয়েছে চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে। কিন্তু কোন গল্পই মূল কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়। কাহিনীর বর্ণনাতে এসেছে — সেকালের খাইয়েদের গল্প। গ্রামের বর্ণনা, হাটের বর্ণনা, বিবাহের সামাজিক রীতি-নীতি এবং কুলীন বিদায় ইত্যাদি। বিচিত্র কিছু চরিত্র যেমন — ফকির উদয়নাথ, হৃদয়নাথ, ভূষণদা, মাধব, নালু গোঁসাই প্রমুখ। স্মৃতি থেকে আহৃত চরিত্রগুলি সবই চিত্রধর্মী। উপন্যাস রচনা ও চরিত্রগুলি সম্পর্কে ২৫ .২.৫৯ এক বেতার ভাষণে মনোজ বসু বলেছেন —

> "গভীর রাতে এক-একদিন তারা যেন মিছিল করে আসে। আলতো ভাবে স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। স্বপ্নেও ভাবিনি কোন-কিছু লেখা চলে সেই সামান্যদের নিয়ে দূরে গিয়ে আজ তারা অপরূপ, দেখতে পাইনে বলেই কি দেখতে চাই এত করে ? ... শুধুমাত্র মানুষগুলি নয় – গাছপালা গরু-বাছুর খালবিল সুখ দুঃখ আশাউল্লাসে ভরা আমার সেকালের গ্রাম আর সমস্ত অঞ্চলটা। ...স্বপ্নে এসে সেই সেকাল আমায় বলে, লেখনী হাতে রুখে দাঁড়াও তুমি — অমৃত সিঞ্চনের মতন কালির নিষেকে আমাদের বাঁচিয়ে তোল। ... সত্য জিনিষটা জাহির করো একালের সামনে। ... তুমি সমস্ত জানো, তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। তোমারই কলম পারবে আমাদের বাঁচাতে।"[৭]

মনোজ বসুর সৃষ্টি নৈপুণ্যে মূল কাহিনীর সঙ্গে যে সকল চরিত্রের যোগ সামান্যই, তারাই স্মৃতিচিত্রণের ক্ষেত্রে হয়েছে খুবই উপযোগী। বহু বিচিত্র মানুষের সমাবেশে 'ছবি আর ছবি'র স্মৃতিচিত্র সার্থকতা লাভ করেছে।

পল্লী জীবনের প্রতি লেখক মনোজ বসুর প্রীতি অকৃত্রিম। গ্রামের পরিবেশে মানুষ হওয়ায় গ্রামের প্রতি আকর্ষণ ছিল তীব্র। গ্রাম জীবন তাই লেখকের কাছে অতীতের বস্তু, স্বপ্নের বস্তু। সেই গ্রামের কথা, পরিবারের কথা, পূর্ব পুরুষদের গল্প আনন্দের সঙ্গে স্মৃতিচারণা করেন। সেই স্মৃতিচারণার প্রসঙ্গেই এসে পড়ে স্বাধীনতার কথা। অনেক রক্তক্ষয়, অনেক মানুষের

আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা এলেও সাধারণ মানুষ তাতে যেন খুশি হতে পারেননি। দেশ বিভাগের ফলে বাস্তুহারা মানুষের দুর্গতির অন্ত নেই। অথচ রাষ্ট্রনেতারা তাদের কথা ভাবেন না। লেখক যেন তাঁর বাল্য-কৈশোর থেকে দেখে আসা ছবিগুলি একের পর এক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে মানুষের চরিত্রগুলি তুলে ধরেছেন স্মৃতিচিত্রণের ভঙ্গিতে যে চিত্র পরিবেশন করেছেন তার নাম 'ছবি আর ছবি' ব্যতিত অন্য কোন নামকরণ হতেই পারে না। সেদিক থেকে এই নামকরণ হয়েছে সার্থক।

সাজবদল

গ্রামীন পটভূমিকায় লেখা 'সাজবদল' (১৯৬৫) উপন্যাসটি। দুধসর এবং সুজনপুর পাশাপাশি এই দুই গ্রামের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর এই উপন্যাসের কাহিনী দাঁড়িয়ে আছে।

দুধসর গ্রামের বাসিন্দা শৈলধর ঘোষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যা কাঞ্চন ও ছেলে বেণুকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মামা জগন্নাথ একটি বড় কোম্পানীর ম্যানেজার। তার নিজের ছেলেমেয়ে নেই। কাঞ্চন আর বেণুধর তাদের কাছে নিজের সন্তানের মতো মানুষ হয়েছে। কাঞ্চন আই.এ. পাশ করেছে। জগন্নাথ বলে —

> "পড়াব ওকে যতদূর খুশি পড়বে। কলেজ খুলে গেলে বি.এ.ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড় কাঞ্চন।"[১]

এমন সময় কোন এক চক্রান্তে জগন্নাথ যে কোম্পানীতে কাজ করে সেই কোম্পানীর ডিরেক্টর গ্রেপ্তার হলেন। জেনারেল ম্যানেজার জগন্নাথও গ্রেপ্তার হলেন। পরে তিনি জামিনে খালাস পেলেন। জগন্নাথ ও জ্যোৎস্না নিজেদের বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে দিয়ে বস্তিতে আশ্রয় নেন। সেইসঙ্গে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর চেষ্টা করে। বেণুধর সংসারের প্রয়োজনে ফ্যাক্টরির শিক্ষানবিশি ছেড়ে অফিসের কেরাণীর চাকরি নিল। সে কলকাতার একটা মেসে গিয়ে উঠল। কাঞ্চন ফিরে এল দুধসরে। চোখের জল মুছে জগন্নাথ কাঞ্চনকে বললে –

> "আমার সাজানো সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। হিংসুটে লোকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছে। আমি ছাড়ব না। ... পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হয়েছিল, আমাদেরও তাই। তোর, বেণুর, আমার, তোর মামীর – এবাড়ির সকলের।"[২]

কাঞ্চন দুধসর গ্রামে ফিরে আসার পর থেকেই তাকে নিয়ে গ্রামবাসীদের কৌতূহলের সীমা নেই। তার সাজসজ্জা, চাল-চলন সমস্ত কিছুই গ্রামের মানুষদের আলোচনার বিষয়। তাকে নিয়ে গ্রামের মানুষের গর্বের সীমা নেই। পাশের গ্রাম সুজনপুরে একটি সাব পোষ্ট অফিস আছে কিন্তু দুধসরে তা নেই। আবার দুধসরে হাইকোর্টের প্রাক্তন উকিলের বাস কিন্তু সুজনপুরে তেমন কেউ নেই। দুধসরের মানুষের দুঃখ ছিল পোষ্ট অফিস না থাকার জন্য। সেই ক্ষত পূরণ করতে চায় মেয়েদের স্কুল খুলে। শিক্ষিতা কাঞ্চন হবে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। সুজনপুরকে টেক্কা দিতে স্কুল খোলার ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে গ্রামের যুবক নিরঞ্জন। তার নিজের খুব বেশি লেখাপড়া নেই। জমি জমা যা আছে তা দিয়েই সংসার চলে যায়। কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে তার খুব গর্ব। এ ব্যাপারে তার সহকারী নীলমণি নামে গ্রামের এক নিরক্ষর যুবক। প্রথমে নিরঞ্জনের সঙ্গে কাঞ্চনের বিরোধ বাধায় স্কুলের চাকরি করতে অস্বীকার করে কাঞ্চন। কিন্তু বাবার পীড়াপীড়িতে কাঞ্চন শেষপর্যন্ত মেয়েদের স্কুলের চাকরি নিতে রাজি হয়। তার মাইনে স্থির হয় পনের টাকা। জমিদারের পোড়ো বাড়িতে বিদ্যালয় শুরু হয়। হাইকোর্টের উকিল পুরজয় সরকারের নামে বিদ্যালয়ের নাম হয়; কারণ পুরজয়ের খেয়া ঘাটের ইজারা থেকে যাতে স্কুলের ব্যয় সঙ্কুলান হয়। এ সবই নিরঞ্জন ব্যবস্থা করেছে ব্যক্তিগত কৌশলে। এদিকে কলকাতা থেকে কাঞ্চনের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান দেখে নিরঞ্জন ভীত হয়ে পড়ে। কাঞ্চন কোন সময় কলকাতায় চাকরি নিয়ে চলে যাবেই। এইজন্য গ্রামে পোষ্ট অফিস স্থাপনের কাজে নিরঞ্জন উঠে পড়ে লাগে। যাতে কাঞ্চনের চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু সে জানতে পারে; সেইসঙ্গে সুজনপুরকেও টেক্কা দেওয়া যাবে। সুজনপুরকে তখন মুখ ঢেকে বেড়াতে হবে দুধসরের কাছে।

> "নিরঞ্জনের অতএব আহার-নিদ্রা নেই। কাকে ধরলে কি হয়, সর্বক্ষণ সেই তদ্বির। পোষ্টাপিসের প্রয়োজন জানিয়ে দরখাস্ত লেখা হয়েছে – দুধসর এবং আরও গোটা পাঁচেক গ্রাম ঘুরে ঘুরে শ'আড়াই সই জোগাড় করল। বাঁ হাতে রকমারি কায়দায় লিখে সই আরও শ'তিনেক বাড়ানো গেল। দরখাস্ত চলে গেল উপরে। আশা পাওয়া গেছে জুলাই থেকে দুধসরে পোস্টাপিস।"[৩]

টাকা জোগাড় করে দিতে হবে সরকারকে। সেজন্য নিরঞ্জন গ্রামের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের দোরে দোরে হানা দেয়। অনেক তদ্বির তদারকের পর অস্থায়ী পোস্টাপিসের অনুমোদন মেলে। অন্য কারোর ওপর ভরসা করতে পারে না বলেই নিরঞ্জন নিজেই চার টাকা মাইনের পোস্টমাষ্টার হয়ে বসে। চিঠিপত্র খুলে দেখতে দেখতে একদিন নিরঞ্জন একট চিঠিতে দেখতে পায় যাতে বেণুধরের মেসের লোকেরা তার বাবাকে জানাচ্ছে কলেরায় বেণুধরের মৃত্যুর খবর। নিরঞ্জন ব্যথিত কণ্ঠে জানায় নীলমণিকে –

> "কলেরায় মারা গেছে। আসল এশিয়াটিক। শেষরাত্রে হয়েছিল, দুপুরের মধ্যে শেষ। সৎকার সমিতি ডেকে শেষকাজ করিয়েছে। মেস বদল করে চলে গিয়েছিল বেণু – এখানকার মেম্বাররা দুধসরের ঠিকানা জানত না। খুঁজে পেতে ঠিকানা জোগাড় করে খবর দিয়েছে।"[৪]

নিরঞ্জনের মাথার ওপর যেন বজ্রাঘাত হয়। নিরঞ্জন চিঠিটি নষ্ট করে দেয় এবং মাসের পর মাস বেণুর নামেই নিজে টাকা পাঠায়। যেমন বেণুধর পাঠাত তেমনি পনেরো টাকা করে মানিঅর্ডার করতে থাকে।

বেণুধরের কোনো চিঠি আসছে না দেখে কাঞ্চনের সন্দেহ হয়, নিরঞ্জন বোধ হয় তাদের চিঠি ঠিক মতো বিলি করছে না। সে সুপারিটেনডেন্টের কাছে এই মর্মে অভিযোগ জানায়। বড় পোস্টাপিস থেকে তদন্তের জন্য লোক আসে। অনেক কষ্টে নিরঞ্জন তার চাকরিটি রক্ষা করে। তদন্তের প্রাক্কালে কাঞ্চন বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে কলকাতা যায়। সেখানে গিয়ে বেণুধরের মৃত্যুর খবর জানাতে পারে। সে বুঝতে পারে তার বাবাকে পুত্রশোকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই নিরঞ্জন ওরকম আচরণ করেছে। নিরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে কাঞ্চনের। এই শ্রদ্ধা শেষ পর্যন্ত অনুরাগে পরিণত হয়। কিন্তু তা জানাবার সুযোগ পায় না। এই সময় কাঞ্চনের মামার চিঠি আসে। চিঠিতে জানায় তিনি কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলায় জিতেছেন। এতদিনের প্রাপ্য বেতন তিনি সুদ সমেত পেয়েছেন। এমনকি চাকরিতে পুনরায় বহাল হয়েছেন। একদিন তিনি জীপ নিয়ে দুধসর গ্রামে চলে আসেন শৈলধর ও কাঞ্চনকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। কলকাতা যাবার সময় কাঞ্চন সাদা শাড়ি পরে গাড়িতে ওঠে। তা দেখে কাঞ্চনের মামা জগন্নাথ বলে —

> "গাঁয়ে পড়ে পড়ে মাস্টারি করে আদ্যিকালের বুড়ি হয়ে গেছিস তুই। রুচি জাহান্নামে গেছে। কলকাতায় কত আনন্দ করে বেড়াতিস - চল্ আবার দেখা যাবে সেখানে।"[৫]

কলাকাতায় মামা মামী তার জন্য শহরের উপযোগী জামা জুতো কিনে দেন। কিন্তু কাঞ্চন সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সাদা শাড়ি আর খালি পায়ে কয়েকদিন পরেই কলকাতা ছেড়ে দুধসরে চলে আসে। গ্রামের মেয়েদের স্কুলে পুনরায় যোগ দেয়।

'সাজবদল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হল কাঞ্চন এবং নিরঞ্জন। এছাড়া কাঞ্চনের মামা জগন্নাথ, নিরঞ্জনের সর্বক্ষণের সঙ্গী নীলমণি, পুরঞ্জয় সরকারের ছেলে অজয়, কাঞ্চনের মামীমা জ্যোৎস্না, বন্ধু মঞ্জুলা এবং ললিতা চরিত্রগুলি উপন্যাসে কিছুটা স্থান পেয়েছে।

মানুষ হিসেবে নিরঞ্জনের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। সে নিজের কথা ভাবে না, গ্রামের উন্নতির চিন্তাতেই সব সময় মগ্ন। দুধসরের গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে সুজনপুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত। গ্রামের মেয়েদের স্কুল খোলার সমস্ত ব্যবস্থা করেছে সে নিজের হাতে। শিক্ষিকা নিয়োগ করেছে কাঞ্চনকে। বেতনের ব্যবস্থাও করেছে। কাঞ্চন যাতে গ্রাম থেকে পালাতে না পারে সেজন্য পোস্টাপিস খুলে কাঞ্চনের চিঠি গায়েব করেছে। জগন্নাথ মামলা জেতার পর কাঞ্চনের কলকাতা যাওয়া এক প্রকার পাকা হয়ে যায়। এই সময় একদিন গ্রামে থাকার ব্যাপারে নিরঞ্জনকে খেলার ছলে কাঞ্চন জানায় –

> "বর হয়ে বসো নিরঞ্জনদা, তোমায় বিয়ে করে কায়েমি হয়ে থেকে যাই।"[৬]

কিন্তু নিরঞ্জন ইতিমধ্যে সুজনপুরের মেয়ে ললিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছে গ্রামের প্রয়োজনে। সে জানত কাঞ্চন আর গ্রামে থাকবে না। স্কুলকে সচল রাখতে শিক্ষিতা মেয়ের প্রয়োজন। ললিতা সেই মেয়ে। কাঞ্চনকে নিরঞ্জন বলে —

> "উপায় নেই যে কাঞ্চন। ললিতার সঙ্গে বিয়ে আমার - সুজনপুরের মেয়ে ললিতা দুধসরের বউ হয়ে আসছে। পাকা কথা দিয়েছি। ও পক্ষও রাজী। একটা চোখ কানা, নিজেই তা জাহির করে দিল।"[৭]

ললিতা এ গ্রামের বউ হয়ে এলে স্কুলের চাকরিতে কোনোদিন শিক্ষিকার অভাব হবে না। গ্রামের প্রয়োজনে কাঞ্চনের প্রেমকে প্রত্যাক্ষ্যাণ করেছে সে।

শহরে মানুষ হওয়া কাঞ্চনকে হঠাৎই গ্রামের পথে পা বাড়াতে হয়। গ্রামের পরিবেশে প্রথম অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারেনি। নিরঞ্জনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরঞ্জনের প্রস্তাব মতো গ্রামের মেয়েদের স্কুলের শিক্ষিকার পদ নিয়েছে। বুদ্ধিমতী কাঞ্চন বুঝতে পারে তার নামের চিঠি কেউ খুলে দেখে। অভিযোগও জানায় উপর মহলে। কিন্তু নিরঞ্জনের প্রেম ও নিরঞ্জনের উপকার করার মানসিকতায় সে বদলে যায়। কলকাতা শহরের প্রাচুর্য্য ও সাজ ত্যাগ করে গ্রামের জীবনকেই বেছে নেয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরিত্রটির মধ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। অন্যান্য চরিত্রগুলি উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। নীলমণি, অজয়, ললিতা চরিত্রগুলি কাহিনীতে অনেক স্থান জুড়ে থাকলেও কাহিনীর গতিপথকে ত্বরান্বিত করতে পারেনি।

শহরের শিক্ষিত মেয়ে কাঞ্চনের মানসিকতার পরিবর্তনই এই উপন্যাসের উপজীব্য। কলকাতায় মামার বাড়িতে থাকার সময় শহরকেন্দ্রিক জীবন-যাপনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তখন গ্রামের প্রতি ছিল অবজ্ঞা। পরিস্থিতির চাপে গ্রামে এলেও গ্রামকে ভালো ভাসতে পারেনি। প্রায় দু'বছর গ্রাম্য জীবন কাটানোর পর সে বুঝতে পেরেছে শহুরে মানুষের সঙ্গে গ্রামের মানুষের মানসিকতার পার্থক্য। সে একদিকে দেখেছে মামার সুসময়ের বন্ধুরা দুঃসময়ে কেটে পড়েছে আর অন্যদিকে অশিক্ষিত গ্রাম্য নিরঞ্জনের মধ্যে দেখেছে মনুষ্যত্বের প্রকাশ। শহরের প্রতি মোহ দূর হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের পাশে থাকতে চিরদিনের মতো বদলে নিয়েছে সাজসজ্জার। তাই উপন্যাসটির নামকরণ 'সাজবদল' যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

চাঁদের ওপিঠ

'চাঁদের ওপিঠ' (১৯৬৬) একটি সামাজিক উপন্যাস। শিল্প সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর সূত্রপাত হলেও পারিবারিক সমস্যাই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। শিল্পপতি নীরদবরণ ও তাঁর ছেলে ভাস্করের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস।

ভাস্কর চটশিল্পের কাজকর্ম শিখতে এবং জানতে বিলেত গিয়েছিল। সেখানে ভারতীয় এমব্যাসিতে ঢুকে মাতলামির কয়েকটি ছবি তুলেছিল। তাও আবার গান্ধীজির ছবির সামনে।

এ নিয়ে ভারতীয় এমব্যাসিতে রিসেপসনিষ্ট এর চাকরি করা একটি মেয়ের সঙ্গে ভাস্কর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে বিলেত থেকে ফিরে বাবার ব্যবসার কাজে হাত লাগায়। এই ঘটনা বর্ণনার পর লেখক ফিরে গেছেন পূর্ব ঘটনায়। অর্থাৎ নীরদবরণের শিল্পপতি হওয়ার বর্ণনায়। ভাস্করের বাবা নীরদবরণ প্রথম বয়সে রাধারমন রায় নামে এক ভদ্রলোকের সহযোগিতায় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানা ছোটখাট হলেও নাম দেওয়া হল জব্বর। সোনার-বাংলা স্টীল কোম্পানি। বাইরের লোকে জানত সেখানে লোহার রড বানানো হয় । কিন্তু ভেতরে ভেতরে তৈরী হত বোমা, রিভালভার। যা চলে যেত স্বদেশী আন্দোলনকারী ছেলেদের হাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর জিনিস তৈরী হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যে মেসিনগুলি বিকল হয়ে পড়ে। ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। রাধারমনকে ফাঁকি দেবার এটা একটা কৌশলও বটে। রাধারমন ব্যবসায় মন্দা চলার সময় বসিরহাটে গিয়ে একটি আশ্রম গড়ে তোলেন। সেখানেই একদিন হঠাৎ মারা যান। রাধারমন-এর ছেলে গৌরদাসকে সঙ্গে করে নিয়ে নীরদবরণ আশ্রমে যান। শ্রাদ্ধ শান্তি সেখানেই হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ব্যবসার খাতিরে নীরদবরণ গণ্যমান্যদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠে। এখন তিনি বাঙালি শিল্পপতিদের একজন। তখনই ভাস্কর বিলেত থেকে ফিরে ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের ওপর নিতে চায়। পিতাকে দিতে চায় বিশ্রাম।

ভাস্কর দায়িত্ব নিয়ে দু-হাতে টাকা খরচ করে যা নীরদবরণের বাল্যবন্ধু হিমাদ্রী শেখরের পছন্দ নয়। হিমাদ্রী শেখরের মেয়ে শম্পার সঙ্গে ভাস্করের বিয়ে হওয়ার কথা । কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরে ভাস্করের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয় গৌরদাসের। ভাস্কর আধুনিক মেসিন কিনে শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে চায়। রাজি নয় গৌরদাস। এই নিয়েই বিরোধ। গৌরদাস বলে —

> "রাধারমন রায়ের ছেলে কিনা আমি — আমার ভাবনাটা ভিন্ন পথে। যে দেশে জনসংখ্যা এত বেশি, সেখানে কলকব্জা বাড়িয়ে মানুষ বেকার করবার মানে হয় না। ওটা নৃশংসতা।"[১]

রাধারমনের বিধবা মেয়ে অনুপমা এবং ছেলে গৌরদাস রাধারমনের মৃত্যুর পর নীরদবরণের বাসায় থাকত। নীরদবরণের শাশুড়ি তারামনি একদিন জানতে পারল অনুপমা সন্তান সম্ভবা।

সেই রাতেই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই সব পুরোনো কথা শুনিয়ে গৌরদাস ভাস্করকে একপ্রকার শাসানি দেয় —

> "হাই-স্পীড মেশিনেরি বাতিল করে দাও – করবেই যখন। বাপকে তুমি কী চোখে দেখ জানি— ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, বাপকে বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত করতেই হবে তোমায়। দেরি করে গোলমাল বাড়িও না। ঐ আপদ সরিয়ে দিয়ে তারপর ডঙ্কা মেরে যেখানে খুশি বেড়িও, কেউ আর চোখ তাকিয়ে দেখবে না ।"[২]

ভাস্কর বুঝতে পারল –

> "গৌরদাস মোক্ষম অস্ত্র নিয়ে বসে আছে, তখন আর মুহূর্তের রেহাই করবে না। নীরদকে হাতকড়া পরিয়ে অন্ততপক্ষে একটা রাত হাজত বাস করিয়ে ছাড়বে। লাভ নাও যদি হয়, প্রতিহিংসা নেবে।"[৩]

এরপর হঠাৎ একদিন নীরদবরণ আত্মহত্যা করে। লেক থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ভাস্কর সমস্ত দায় থেকে মুক্তি পায়। এরই মধ্যে হিমাদ্রীশেখরের ভাগ্নে সিতাংশু যাত্রা দলে অভিনয় করা জলধরকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। যাকে দেখতে ভাস্করের মতো। তাকে শিখিয়ে পরিয়ে ভাস্করের মতো তৈরী করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে শম্পা লক্ষ্ণৌ থেকে টেলিগ্রাম পায়। জানতে পারে তার বাবা অসুস্থ। লক্ষ্ণৌয় ফিরে শম্পা জানতে পারে বাবার অসুখ-বিসুখ নয়; তার বিয়ে ঠিক করেছে হিমাদ্রীশেখর অন্য ছেলের সঙ্গে।

জলধরের কথা জানত সিতাংশু আর ভাস্কর। জলধরকে ভাস্কর সাজিয়ে ভাস্কর বোম্বে যাওয়ার নাম করে হাজির হয় গৌরদাসের বাড়িতে। সঙ্গে পিস্তল। উদ্দেশ্য গৌরদাসকে মেরে ফেলা। অর্থাৎ পথের কাঁটাকে উপড়ে ফেলা। তার আগেই গৌরদাস ভাস্করকে চিনে ফেলে। গৌরদাস-এর বাড়িতে ভাস্করের সঙ্গে দেখা হয় অসুস্থ অনুপমার। যে একসময় ভাস্করকে মাতৃস্নেহে পালন করত। অনুপমা ভাস্করকে দেখে আনন্দিত হন। ডাক্তারকে অনুপমা বলে –

> "কতকাল পরে ছেলে পাশে বসেছে, এখন কি আর যন্ত্রণা থাকে ডাক্তারবাবু? যন্ত্রণা-টন্ত্রনা নেই - আমি সেরে গেছি। কোন অষুধ লাগবে না – কাল-পরশুর মধ্যে উঠে বেড়াব, দেখতে পাবেন।"[৪]

অনুপমার অনুরোধে কয়েকদিন ওখানেই থেকে যায় ভাস্কর। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অনুপমার মেয়ে মীরার সঙ্গে। মীরাই ভাস্করের দেখাশোনা করে। অনেক বড় ডাক্তার দেখানো হলেও অনুপমা সুস্থ হয়ে উঠতে পারল না। মারা গেল অনুপমা। ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে, মাটির সঙ্গে

মিশে এক অন্য ভাস্কর তৈরী হয়েছে। মনে মনে ভালবাসতে শুরু করেছে মীরাকে। মনের সুপ্ত ভালবাসা স্বীকৃতি পেতে উৎসুক। সে গৌরদাসকে জানায় –

> "মীরার জন্য ভেবো না গৌর-কাকা। তার সকল ভাবনা আমার। তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের।"[৫]

গৌরদাস বাধা দিয়ে জানায় —

> "হবে না, হতে পারে না। মীরা বোন হয় তোমার। একই পিতার রক্ত দু'জনের দেহে।"[৬]

পিতার অপকর্মের কথা জানতে পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ভাস্কর। গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। বারো দিন পরে চেতনা ফিরে পায় ভাস্কর। ওদিকে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে আসে শম্পা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে। সম্পা ও ভাস্করের মিলনের মধ্যদিয়ে উপন্যাসের যবনিকা।

'চাঁদের ওপিঠ' উপন্যাসের চরিত্রগুলি সমহিমায় উদ্ভাসিত হয়নি। ভাস্করের পিতা নীরদবরণ চরিত্রটি উপন্যাসের শুরুতে সমহিমায় নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। চাকরী ছেড়ে ব্যবসায় ঢোকা এবং ব্যবসায় হাত পাকানো। পরে বন্ধুকে প্রতারিত করে সর্বস্বের মালিক হওয়ার মধ্যদিয়ে চরিত্রটির বিকাশ। অবৈধ কাজকর্মের ক্ষেত্রেও চরিত্রটির জুড়ি মেলা ভার। অথচ বাড়িতে পূজা-আর্চা নিয়ে সময় কাটে তার। হয়তো বা ব্যভিচার মূলক কাজকর্মের জন্যই এতো বেশি দেবতার প্রতি ভক্তি। নীরদবরণকে দেখে মনে আসে মধুসূদন দত্তের 'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের ভক্ত প্রসাদের কথা। ভক্তপ্রসাদের পরিণতির মতোই পরিণতি ঘটেছে নীরদবরণের। গৌরদাসের দেখানো পুলিশের ভয় থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

উপন্যাসের নায়ক ভাস্কর চরিত্রের মধ্যে প্রথমে মানসিক দৃঢ়তা দেখা গেলেও পরে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে চরিত্রটি। ভাস্কর বাবার ব্যবসাকে উঁচু জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। আনতে চেয়েছে নতুন যন্ত্রপাতি। শ্রমিক হাঁটিয়ে যন্ত্র সভ্যতার বাহক হতে চেয়েছে। তা নিয়েই শুরু হয় উপন্যাসের আসল দ্বন্দ্ব। গৌরদাসের সঙ্গে ভাস্করের দ্বন্দ্বের কারণে এবং নিজের সম্মানরক্ষার্থে নীরদবরণ বেছে নেয় আত্মহননের পথ। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গৌরদাসের ঠিকানায় হাজির হয়েছে ভাস্কর। এরপরেই চরিত্রটির মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন

লক্ষ্য করি আমরা। কিন্তু কেন ? শুধু কী পালিত মা অনুপমাকে দেখে ? নাকি অনুপমার কন্যা মীরাকে কে দেখে ? লেখক এক্ষেত্রে চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেননি। শুধু দেখি যে, মীরাকে ভয় পেয়ে সমস্ত মেনে নেওয়া এবং মীরার কথা অনুসারে ওবাড়িতে থেকে যাওয়া। অনুপমার মৃত্যুর পর গৌরদাসের কাছে মন্তব্যে যার চরম প্রকাশ –

> "ধরে নাও তারই প্রায়শ্চিত্ত। মীরাকে প্রতিষ্ঠিত করব সেই বাড়িতে, মীরা সর্বময়ী। কাব্যের মতন শোনাবে – কিন্তু মীরা সত্যি সত্যি শতদল পদ্ম, কোন্ পাঁকে জন্ম সে খোঁজে আমার গরজ নেই।"[৭]

গৌরদাস প্রকৃত সত্য বলে দেওয়ায় দুর্বল হৃদয় ভাস্কর নিজের পিস্তলের গুলিতে নিজেকে হত্যার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ভাস্কর তাঁর পুরানো প্রেমিকা অর্থাৎ শম্পাকেই জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের শুরুর সঙ্গে শেষের কোনো সামঞ্জস্য দেখানো হয়নি।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে সিতাংশু বেশ কিছুটা জায়গা পেয়েছে। সিতাংশুর পরিচয় দিয়ে লেখক বলেছেন –

> "তিনটে কারখানা চালান নীরদ, তার একটা সোনার-বাংলা কেমিক্যাল ওয়ার্কস। সিতাংশু ম্যানেজার ঐ কারখানার। সে পরিচয় কিছুই নয় – ভাস্করের বাল্যসখা, সহপাঠী।... তার উপরেও আছে – মিলের কাজকর্মে নীরদবরণের ডানহাত বলা হত তাকে।"[৮]

সিতাংশু উপন্যাসের ঘটনাবলী পরিবর্তনের সাহায্য করলেও লেখক তাঁর প্রতি থেকেছেন উদাসীন। শম্পা নায়িকা চরিত্র হলেও বেশ নিষ্প্রভ। সারা উপন্যাস মাত্র দুটি ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমটি ভাস্করের দেওয়া জন্মদিনের উপহার ফিরিয়ে দিয়ে। অন্যটি উপন্যাসের শেষের দিকে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ভাস্করের কাছে ফিরে আসার ক্ষেত্রে।

উপন্যাসের প্রারম্ভে গৌরদাসকে অনেকটা খল চরিত্রের মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে দেখি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। সেও ভাস্করের মত মানবিকতার সমুদ্রে অবগাহন করেছেন। ভাস্করের সঙ্গে আলাপ-চারিতায় সেই মানসিকতার বিলোপ ঘটেছে। ভাস্করের সঙ্গে মীরার বিবাহের প্রসঙ্গে বরং সহানুভূতিশীল মানবত্মার

প্রকাশ লক্ষ্য করি। উপন্যাসের চরিত্রগুলি। যেন লেখকের হাতে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায়নি।

নারী চরিত্রগুলির মধ্যে শম্পা, অনুপমা ও মীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে উপন্যাসে। শম্পা ভাস্করকে পাওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে ঝগড়া ফিরে এসেছে। অসুস্থ অনুপমা সন্তান তুল্য ভাস্করকে কাছে পেয়ে ডাক্তারকে জানায় –

"যন্ত্রণা-টন্ত্রণা নেই – আমি সেরে গেছি।"[৯]

মা ও সন্তানের সাক্ষাতে ভাস্করের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় মীরার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পরে। ভাস্কর কলকাতায় ফিরে যেতে চাইলে মীরা বলে –

> "যান না চলে খালি-পায়ে। বাসে ট্রেনে কিন্তু এই অবস্থায় যেতে হবে। মা একটু ভাল হয়ে উঠুন, তখন কেউ আর থাকার কথা বলতে যাবে না।"[১০]

অভিমানী মীরার পাশে থাকতে থাকতে হয়তো তাকে ভালোই বেসেছিল। কিন্তু মীরাকে নিজের বোন জানার পর গৌরকাকাকে ভাস্কর বলে –

> "ধন–ঐশ্বর্য নেই, কাজ কারবার নেই, বাবা নেই, অনু-মা নেই, মীরাকে পেলাম না, শম্পা তো আগেই গেছে – মুক্ত পুরুষ আমি।"[১১]

এর পরেই বন্ধুক নিয়ে নিজেকে গুলি করে। উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এভাবেই সাহায্য করেছে।

মানব জীবনের মানসিকতা বিচিত্র। 'চাঁদের ওপিঠ' আসলে মানব-সভ্যতারই উল্টোদিক। যেদিকে সভ্যতার আলোক পৌঁছায় না অথচ মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে তারই কথা লেখক তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র সভ্যতার আলোক উজ্জ্বল দিকটি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের আড়ালে বয়ে যাওয়া জীবনবৃত্তান্ত, না পারি জানতে, না চাই বুঝতে। সেই বিপরীত দিকের অর্থাৎ চোখের আড়ালের কথাই লেখক তুলে ধরেছেন 'চাঁদের ওপিঠ' উপন্যাসে।

শম্পা ও ভাস্করের কথোপকথনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার উল্টোপিঠের কথাই প্রতিভাত হয়েছে। শম্পার জন্মদিনে ভাস্করকে নিমন্ত্রণ করেছে। ভাস্কর নিজে না এসে অন্যের হাতে উপহার পাঠিয়েছে। শম্পা তা প্রত্যাক্ষাণ করে বলেছে –

> "চাঁদের উল্টো পিঠ আছে, মানুষেরও আছে, টাকার বাইরে যে দুনিয়া, সেদিকে নজর যায় না আপনাদের।"[১২]

এখানে শম্পার চরিত্রের উল্টোপিঠ অর্থাৎ চাঁদের ওপিঠ। অন্যদিকে ভাস্কর গৌরদাসকে মারতে গিয়ে অনুমার মাতৃস্নেহে বিভোর হয়ে পড়ে। সেখানে খালি পায়ে, রৌদ্রে পুড়ে এক অন্য ভাস্কর পরিণত হয়েছে। অনু-মা ও মীরাকে পেয়ে ভাস্কর ভুলে যায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও টাকা পয়সার কথা। এ এক নতুন ভাস্কর। যাতে এতোদিন আলো না পড়ায় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাই লেখকের দেওয়া 'চাঁদের ওপিঠ' নামটি হয়েছে সার্থক ।

সেতুবন্ধ

'সেতুবন্ধ' (১৯৬৭) মনোজ বসুর একটি বিশালকার সামাজিক উপন্যাস। প্রেমিকা নারীর মাতৃত্ব লাভের মনস্তাত্ত্বিক রূপ রোমান্সের আকারে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

কেরানী তারণকৃষ্ণের দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। অণিমা, পূর্ণিমা এবং তাপস। অনিমার বিয়ে হয়েছে তুলসীদাসের সঙ্গে। বড় মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর অর্থনৈতিক কারণে ছোট মেয়ে পূর্ণিমার বিয়ে দিতে পারছিল না তারণকৃষ্ণ। তখন তারণকৃষ্ণের প্রতিবেশী বন্ধু পূর্ণ চাটুজ্যের কথামত পূর্ণিমাকে কলেজে ভর্তি করে দেয় ভাল বর পাওয়া যাবে এই ভরসায়। যখন বর পাওয়া গেল না তখন পূর্ণর তদবিরে তারণকৃষ্ণ মেয়েকে কোম্পানির রিসেপ্সান ক্লার্ক হিসেবে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামের মধ্যে পূর্ণিমা নারীত্বকে ভুলে গিয়ে পুরুষের মত বহির্জীবনে সে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। অথর্ব তারণকৃষ্ণ অভাব অনটনের জন্য তার কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। পূর্ণিমা ধীরে ধীরে সেই অফিসের মালিক অরুণের সঙ্গে যখন ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, তখনই তাকে অন্য অফিসে চাকরি জুটিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিল কোম্পানির অন্য পার্টনাররা। দিদি অনিমাকে চাকরির স্থান পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ণিমা বলেছে –

> "নইলে কি হার্মান প্লাম্বার্সে এত টাকার চাকরিতে ঢুকতে পারতাম ? কত রকম তদ্বির কত সই সুপারিশ নিয়ে কতজনে মুকিয়ে ছিল - আমার তদ্বির সকলের সেরা। চিঠি নয়, টেলিফোন নয়, অসীমবাবু গাড়ি করে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দিলেন। মূলে তো ঐ কলঙ্ক।"[১]

এই অফিসেই কাজ নিয়ে এসেছে শিশির নামে এক যুবক। আগে থাকত পূর্ববঙ্গে।

দেশভাগের পর শিশিরের বাবার এক ছাত্র বড় অফিসারকে ধরে চাকরিটি জুটিয়ে দেয়। তার মামা অবিনাশ মজুমদার একসময় স্বদেশী ছিলেন। এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে একটি আদর্শ কলোনি গড়ে তুলেছেন।

> ''কলোনির নাম হল নব-বীরপাড়া। বীরপাড়া গাঁয়ে যেমন ছিল, এই নব-বীরপাড়ারও মোটামুটি সেই চেহারা দাঁড়াবে। বিশাল দীঘি ছিল বীরপাড়ার মাঝাখানটায়, ততদূর না হোক – মাঝারি গোছের একটা পুকুর কাটালেন এখানে। পুকুরের মাটিতে খানাখন্দ ভরাট হয়ে জমি চৌরস হল। কেয়ার জঙ্গল নিশ্চিহ্ন।''[২]

এক ভদ্রলোকের পতিত জমি ইজারা নিয়ে গড়ে ওঠে ওই কলোনি। শিশির বিপত্নীক যুবক। সে যখন পশ্চিমবঙ্গে চাকরি খুঁজছে তখন একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। কয়েকদিন পরে পূরবী অর্থাৎ শিশিরের স্ত্রী মারা যায়। শিশির মেয়েটিকে রেখে এসেছে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। লেখকের বর্ণনায় —

> ''ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে জাহাজ যেন বন্দরে নোঙর করেছে, রাত্রিটা আজ নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। কী আরাম, কী আরাম!''[৩]

কিন্তু শিশির অফিসের সকলের কাছে নিজের বিবাহিত জীবন ও মেয়ের পরিচয় গোপন রেখেছে। সে অফিস করার পর বাকী সময়টুকুতে মামার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এক সময় সে খবর পায় জমির মালিক আগুন লাগিয়ে কলোনি পুড়িয়ে দিয়েছে। সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

পূর্ণিমার ভাই তাপস ডাক্তার হয়েছে। পড়ানোর সমস্ত খরচ জুগিয়েছে পূর্ণিমা। সরলজ্ঞানে সে সংসারকে ভালবেসেছে। সংসারকে সে শুধু দিয়েছে, পায়নি কিছুই। এক বড় ডাক্তারের স্ত্রী বিজয়া পূর্ণিমার বাড়িতে এসেছে তাপসের সম্বন্ধ নিয়ে। বিজয়া দেবী বলেন -

> ''স্বাতীর জন্য এসেছি মা তোমাদের কাছে। এক মেয়ে ঐ আমার – তাপসের হাতেই দিতে চাই। ওঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল, দুজনে আমাদের কথাবার্তা হত প্রায়ই।''[৪]

তাপসের সঙ্গে স্বাতীর বিয়ের পর পূর্ণিমাদের বাড়িতে অসন্তোষ শুরু হল। তাপস স্বাতীকে নিয়ে উঠে গেল শশুরের ফ্ল্যাটে। পূর্ণিমা হতাশায় ভেঙে পড়ল না, বরং সংসারের দুঃখ ভোলার জন্য ভাব জমাল অফিসের সহকর্মী শিশিরের সঙ্গে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য

এবং সকলের চোখের উপরে বিজয়ীর বেশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তাপসের কথামত সে বিয়ে করল সহকর্মী শিশিরকে। বিয়ের পর পূর্ণিমার বাড়িতেই শিশির সংসার পেতেছে। বাবা তারণকৃষ্ণ তা পছন্দ করেন না। সে কাশী যাত্রা করেছে। এরপরেই শুরু হয়েছে বিবাদ। শিশিরের মেয়ে যার কাছে থাকত সেই ভগ্নীপতি শিশিরের মেয়ে কুমকুমকে ফেরৎ দিয়ে গেছে। শিশির পূর্ণিমার কাছে মেয়ের পরিচয় গোপন রেখেছে। আত্মীয়-কন্যা বলে পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ভগ্নীপতির একটি চিঠি পূর্ণিমার হাতে পড়ে। যা থেকে প্রকৃত সত্য জানতে পারে পূর্ণিমা।

> ''চিঠি না পড়েও বলতে পারতাম এ মেয়ে তোমার। মেয়ের মুখের উপর স্পষ্ট করে বাপের পরিচয় লেখা। নাক-মুখ-চোখ হুবহু তোমার।''[৫]

তখন থেকেই সংঘর্ষের সূচনা। রাগে আগুন হয়ে পূর্ণিমা শিশিরকে বলে —

> ''ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক! তোমার আগের বউয়ের কথা একবর্ণ বলোনি আমায়। গোপন করে এসেছ। এত বড় প্রতারণা কেন আমার সঙ্গে – কোন্ ক্ষতিটা আমি করেছিলাম।''[৬]

শিশিরের কন্যার উপস্থিতি আত্মীয়দের কাছে পরাভবের ভীতি প্রবল করে তুলল। বিপন্ন-বোধ করতে লাগল পূর্ণিমা। সকলের সামনে অভিনয় করে ভাল সাজতে চাইলেও শিশুকন্যার অস্তিত্বই তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। হঠাৎ করে দিদি অণিমার আগমনে পূর্ণিমার অভিনয় নতুন মাত্রা পেল। ড. দীপক চন্দ্রের কথায় –

> ''নীড় রচনার মুনসিয়ানায় মনোজ বসু অদ্বিতীয় শিল্পী, খুব ধীরে ধীরে মনের পাপড়ি খুলে ধরেছেন লেখক – পূর্ণিমার অভিনয় এখন নিজেরই সঙ্গে। বাইরের কাঠিন্য শুধু হেরে যাওয়ার আশঙ্কায়।''[৭]

সংঘর্ষের মধ্যে পূর্ণিমার হৃদয়ে যখন মেয়ে কুমকুম-এর প্রতি মাতৃত্ব জাগতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই শিশির তার মেয়েকে নিয়ে মামা অবিনাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অবিনাশের কলোনির মালিক মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে সেই কলোনি আবার গড়ে উঠেছে।

হঠাৎ করে কুমকুমের সঙ্গে পূর্ণিমার বিচ্ছেদ বেদনায় পূর্ণিমা অসুস্থ হয়ে পড়ল। হাসপাতালে পূর্ণিমার প্রকৃত অবস্থা বোঝা গেল। তাপস দিদির অসুস্থতার কারণ বুঝতে পেরে শিশির ও কুমকুমকে এনেছে পূর্ণিমার কাছে। পূর্ণিমা বলেছে –

> ''আমি সেরে গেছি, সেরে দিয়েছে সেই মেয়ে। জানেন না মামা, কুমকুমের হাতে মন্তোর। হাত বুলিয়ে একদিন মাথাধরা সেরে দিয়েছিল, আজ আমায় মরণের মুখ থেকে ফেরত নিয়ে এল।''[৮]

সকলের মিলনের মধ্যদিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসের প্রথম কাহিনী অনিমা-পূর্ণিমা তাপস ও তারণকৃষ্ণের কাহিনী। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বদেশী অবিনাশ মজুমদারের কাহিনী এবং শিশির ও পূরবীর কাহিনী। তবে দ্বিতীয় অংশে শিশির এবং পূর্ণিমার কাহিনীই উপন্যাসের প্রধান। মূল চরিত্র পূর্ণিমা খামখেয়ালী চরিত্র। সংসারে সে শুধু দিয়েই গেছে; পায়নি কিছুই। এজন্য তার স্বভাব একগুঁয়ে ধরণের। সে সকলের সামনে কাঁদে না বা দুঃখ করে না। অন্তরে যতটা কোমল বাইরে ততটাই রুক্ষ্ম। নিজের পরাজয় স্বীকার করে না। ঘাত-প্রতিঘাতের সংঘর্ষে পূর্ণিমার দর্প চূর্ণ হয়; উপনীত হয় মাতৃত্বে। চরিত্রটিকে বোঝা আমাদের পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

শিশির ব্যক্তিত্বহীন বাঙালী চরিত্র। জীবন সংগ্রামে পিছুপা না হলেও পূর্ণিমার কাছে সে যেন শিশুর মত। পূর্ণিমার দ্বারা চালিত চরিত্র সে। পূর্ণিমার অপমানে ব্যথিত হলেও প্রতিবাদী চরিত্রে পরিণতি হতে পারেনি। ক্ষোভ অন্তরে থেকেছে। পূর্ণিমার সম্মুখে বলার মত পৌরুষ তার নেই। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে তারণকৃষ্ণ, তাপস, অনিমা, অবিনাশ স্বল্প পরিসরে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কুমকুম চরিত্রটি যেন শিশির ও পূর্ণিমার মধ্যে মিলন রূপ সেতু।

পূর্ণিমার সঙ্গে শিশিরের পরিচয় উপন্যাসের কাহিনীকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। মানুষের কুৎসার উত্তর দিতেই নীরবে বিয়ে করেছে শিশিরকে। তখন পূর্ণিমা জানত না শিশির বিপত্নীক ও তার একটি শিশু কন্যা আছে। বিয়ের পর হঠাৎই সুখের দাম্পত্য সংসারে শিশু কুমকুমের আগমন জটিলতা সৃষ্টি করেছে। যে নারী মাতৃত্বকে অস্বীকার করে সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছিল; সেই নারীই মাতৃত্বের আহ্বানে পেয়েছে মুক্তি, শান্তি। এই শান্তির একমাত্র জায়গা কুমকুমের 'মা' ডাক। শিশির ও পূর্ণিমার দ্বন্দ্বের মিলন সম্ভব হয়েছে কুমকুম-এর কারণে। কুমকুম যেন মিলনের 'সেতুবন্ধ'। তাই নামকরণ হয়েছে সার্থক।

রাণী

সমাজ সমস্যা ও মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'রাণী' (১৯৬৭)। এই উপন্যাসের নায়িকা মঞ্জুপ্রভার জীবনের টানাপোড়েন অবলম্বনে কাহিনীর বিস্তার। নায়িকা ছোটরাণী মঞ্জুপ্রভার দুটি রূপ ধরা পড়েছে। একদিকে রাণীত্ব অন্যদিকে নারীর সহজাত মাতৃত্ব। এই দুটি রূপের সহবস্থানে কাহিনীর ঘনঘটা।

রাণী মঞ্জুপ্রভার ছোটবেলার ডাক্তার ধনঞ্জয় সেন। অনেকে নাম দিয়েছিলেন ধন্বন্তরী ডাক্তার। ডাক্তারের সেবাপরায়ণতা সম্পর্কে পাঁচু রাউত দুঃখ করে বলেছিল —

> "বেকার হয়ে পড়ে আছি, তা ভগবান মোটা রোগপীড়েও যদি একটা দিত। ভাল ভাল পথ্যি বাপের জন্মে যা জিভে পড়েনি — ধন্বন্তরী ডাক্তারের পয়সায় খেয়ে দেয়ে দেহখানা তাগড়াই করে নিতাম।"[১]

উদয়নারায়ণের অকাল মৃত্যুতে পত্নী মঞ্জুপ্রভার মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। তাদের গৃহচিকিৎসক ধনঞ্জয় ডাক্তার। ডাক্তারের কম্পাউন্ডার গোপাল। গোপালের পালিত ছেলে দীপক। মঞ্জুপ্রভার ছেলে অলোকনারায়ণ নামকরা স্কুলে লেখাপড়া করে। সেই স্কুলেই ভর্তি হয় দীপক। দীপক ও অলোকনারায়ণের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। দীপক জানতে পারে অলোকনারায়ণের সৎমা রাণী মঞ্জুপ্রভা।

দীপকের বাড়িতে রয়েছে তারা দুই ভাই গঙ্গাধর ও দীপক এবং বোন রাখী। মা বিনোদিনীর টান দীপকের প্রতি। প্রতিটি ব্যাপারে তার জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। হঠাৎ দীপক অসুস্থ হলে অলোকনারায়ণ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়। বাড়ির সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়। দীপক পড়া শেষ করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকল। আর অলোকনারায়ণ কিছু মানুষের সঙ্গে তাস খেলার নেশায় পড়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। এইসময় কম্পাউন্ডার গোপালের মৃত্যু হয়। দীপকের পড়াশুনার সমস্ত ব্যবস্থা করে ধনঞ্জয় ডাক্তার হরিদ্বার চলে যান। এই সময় একদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে দীপক জানতে পারে তাঁর পড়াশুনার টাকা ধনঞ্জয় ডাক্তার দেয় না, অন্য কেউ দেয়। হরিদ্বার যাওয়ার পূর্বে ডাক্তার ধনঞ্জয় রাণী মঞ্জুপ্রভাকে বলেছে —

> "প্রয়োজন আর বেশি দিন নয়। বছর তিনেক, তারপর আর দিতে হবে না।"[২]

মঞ্জুপ্রভারও না দিয়ে উপায় ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে লেখক মঞ্জুপ্রভার পূর্ব পরিচয় দিয়েছেন। ছোটরাজা উদয়নারায়ণের বাইজির বাড়িতে যাতায়াত ছিল। সেইসময় বাইজি মঞ্জুপ্রভার প্রতি আকৃষ্ট হন উদয়নারায়ণ। উদয়নারায়ণের সঙ্গে বিয়ের পূর্বেই মঞ্জুপ্রভা সন্তান সম্ভবা হলে ডাক্তার ধনঞ্জয় সেনের চেষ্টায় ছেলে হয়। সেই ছেলেই দীপক। পরে ডাক্তারের কথামত উদয়নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে হয় মঞ্জুপ্রভার। ছোটরাজার প্রথম পত্নী মারা গেছেন এবং তাদের একমাত্র সন্তান অলোকনারায়ণ। সেই থেকে মঞ্জুপ্রভার ছেলে দীপক গোপাল কম্পাউন্ডারের কাছে মানুষ। দীপকের যাবতীয় খরচ মঞ্জুপ্রভার কাছ থেকে আসত ডাক্তারের মাধ্যমে। কিছুদিন পরে রাজা উদয়নারায়ণ এক কুৎসিত রোগে মারা যান।

দীপক মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। রাণী মঞ্জুপ্রভার কাছ থেকে মাসে মাসে ব্যাঙ্কের মারফৎ টাকা পায় দীপক। রাণী মঞ্জুপ্রভার টাকায় টান পড়লে অক্ষয়কে দিয়ে গহনা বিক্রী করতে পাঠায়। দোকানদার অক্ষয়কে চোর সন্দেহ করে রাজ বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়িতে চেঁচামেচি শুরু হয়। অলোকরঞ্জন মায়ের গহনা বলে অক্ষয়ের হাত থেকে তা নিয়ে নেয়। অক্ষয় চাইলে সে দর্পের সঙ্গে বলে —

> "কী জন্য ফেরৎ দেবো ? আমার মায়ের জিনিস, গয়নার মালিক আমি। আমি অন্য কেউ নয়।"[৩]

আহত অক্ষয়কে রাণী ডেকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। অলোকরঞ্জন সেই গহনা উপহার দিল রাখীকে। বলল —

> "মা থাকলে তিনি নিজের হাতে পরিয়ে দিতেন, মা নেই বলে আমি এনেছি। আমার মায়ের জিনিস ছুঁড়ে ফেলতে পারবে না তুমি কখনো।"[৪]

গহনা পেয়ে রাখী খুব খুশি, সঙ্গে মা বিনোদিনী এবং বড় ভাই গঙ্গাধর।

হরিদ্বার থেকে পাঠানো ধনঞ্জয় ডাক্তারের চিঠির মাধ্যমে দীপক জানতে পারে গোপাল কম্পাউন্ডার তার বাবা নন। সে অন্যের পরিবারে পালিত হচ্ছে। রাখী তার বোন নন, গঙ্গাধর তার দাদা নয়। মা বিনোদিনীও তার নিজের মা নয়। ধনঞ্জয় ডাক্তারের একটি চিঠিতে দীপক জানতে পারে —

> "গোপাল মজুমদার তোমার পিতা নন। যাঁদের মা-ভাই-বোন-জেনে আছ, কোন সম্পর্কই নেই তাঁদের সঙ্গে। এখন হস্টেলে রয়েছে, বলতে গেলে আজন্ম তুমি হস্টেলে। হস্টেলে-খরচা যিনি দিচ্ছেন, তোমার যাবতীয় খরচ বরাবর তিনিই বহন করে এসেছেন। ইদানীং ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে যান তখন আমার হাতে দিতেন, আমি গোপালের কাছে পৌঁছে দিতাম। গোপাল মারা গেলেন, আমিও দেশ ছেড়েছি। সেইজন্য তোমায় তাড়াতাড়ি হস্টেলে পাঠানো হল। এবং টাকা এখন ব্যাঙ্কের মারফতে হচ্ছে।"[৫]

দীপক রাজবাড়িতে যায় রাণীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু রাণীর কাছে যে ব্যবহার পেল তা অপ্রত্যাশিত। রাণী তাকে পুত্র বলে স্বীকার করলেন না। দীপক ডাক্তারের পাঠানো কাগজপত্র বের করলে রাণী ছিনিয়ে নিতে চায়। অগত্যা দীপক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গুলি চলে। দীপকের কানের কাছ দিয়ে গুলি চলে যায়। সেই কাগজপত্র দীপক রাখতে দেয় রাখীকে। হস্টেলে ফিরে আসার পর লোক দীপকের বুকের উপর রিভলভার তুলে ধরে। বাক্স থেকে কাগজপত্র নিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু সে সব কাগজই নকল। হস্টেলে রাণী মঞ্জুপ্রভাও আসে। ভুলিয়ে ভালিয়ে কাগজ নেবে বলে। রাণী কাগজ সম্পর্কে জানতে চাইলে দীপক বলে —

> "কোন চিন্তা নেই মা, খুব নিরাপদ জায়গায় আছে। তোমার রাজবাড়ি সেদিন মাত্র একটা-দুটো জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম — সেগুলো কিন্তু আসল। আশায় আশায় গিয়েছিলাম — পরিচয় পেয়ে তক্ষুণি কোলে টেনে নেবে আমায়। কোল দিলে না মা, বন্ধুক মারলে। তাক ফসকেছিল সেদিন, কিন্তু জানি সে-ই শেষ নয় — তোমরা আবার আসবে। ছেলের মমতা কাটানো তো সোজা নয়। তোমার চেলা - চামুণ্ডারা এসেছিল কাল রাত্রে - তুমি নিজে এসেছ এই এখন। জেনে বুঝেই নকল-কাগজ বাস্কে রেখে আসল বস্তু সরিয়ে দিয়েছি। রাজরাণীর ছেলে আমি, রামা-শ্যামা নই — এমন জাঁকের পরিচয় লুপ্ত হতে দেবো কেন ? খুন যদি হয়ে যাই, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাউর হবে, সেই ব্যবস্থা করা আছে।"[৬]

পরে ধনঞ্জয়ের চিঠি পেয়ে দীপক হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। সে ডাক্তারের চিঠি থেকে জানতে পারে রাণী মঞ্জুপ্রভা কোন মতেই মা হতে চান না। বরং রাণী হয়েই থাকতে চান। দীপক বিদায় বেলায় কাছে পায় রাখীকে। সকলের অজ্ঞাতে দীপকের সঙ্গে রাখীর বিয়ে হয়ে যায়।

'রাণী' উপন্যাসে রাণীত্বের লোভ কিভাবে স্বাভাবিক মাতৃবাৎসল্যকে অবদমিত করেছে তার ছবি লেখক এঁকেছেন। নারীর যথার্থ পরিচয় মাতৃত্বে। রাণী মঞ্জুপ্রভা মা হয়েও পায়নি মাতৃত্বের গৌরব। এই খেদ শূন্য জীবনের করুণ পরিণতি। একদিকে ব্যর্থতার মাধুরী আর

অন্যদিকে প্রাচুর্য। 'রাণী' নাম বজায় রাখার জন্য মঞ্জুপ্রভা সদা-সতর্ক। কুমারী জীবনের কলঙ্কতিলক দীপকের প্রতি গভীর মমতাবশত সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করলেও দীপকের আবির্ভাব যেখানে সংঘর্ষ বাধাতে পারে, সেখানেই সে দীপককে ভেবেছে শত্রু। হিংস্র নাগিনীরূপ তার আচরণে হয়েছে স্পষ্ট। সে তখন নারী নয়, জননী নয় – রাণী। ডাক্তার বাবুর পাঠানো কাগজপত্র নিয়ে দীপক মঞ্জুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে এলে মঞ্জুপ্রভা মাতৃত্বকে অস্বীকার করে। এমনকি বাড়ির লোকেদের আদেশ দেয় —

> "গেলে কোথা অক্ষয়? বাড়ি বয়ে যাচ্ছে-তাই অপমান করে যায় — কেউ কোনখানে নেই আমার? ধরো, হাত-পা বেঁধে গুমটিঘরে চালান দাও —"[৭]

দীপকের চরম সর্বনাশ করতেও রাণীর বুক কাঁপে না। গুলিও চলে। আসলে রাণী নামের আড়ালে মঞ্জুপ্রভা তার মাতৃসত্ত্বাকে যেন অনেক আগেই সমাধিস্থ করেছে।

মাতৃত্ব এবং বিত্ত - এই দুই বিপরীত ধর্মী জীবনাদর্শের শিকার হয়েছে দীপক। যাকে সে মা বলে জানত তার সেবা-যত্নের আতিশয্য থেকে সে অব্যাহতি পেতে চায়। কিন্তু যখন নিজের মায়ের পরিচয় পেল তখন সে মার কাছে স্বীকৃতি পেল না। সে কারণেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সে পাড়ি দেয় হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। দীপকের সব না পাওয়ার মাঝে রাখীর সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারটি উপন্যাসের রোমান্সধর্মকে বজায় রেখেছে।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে ধনঞ্জয় ডাক্তার। অলোকরঞ্জন, রাখী বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ধনঞ্জয় ডাক্তার যে ধন্বন্তরী নয়, তা প্রমাণ হয় গোপালকে (দীপকের পালিত পিতা) বাঁচাতে না পারার মধ্য দিয়ে। ডাক্তার বলে —

> "যাই যাই করেও যেতে পারিনি, মোহচক্রে পাক খাচ্ছিলাম। মোহ কেটেছে — সামান্য একটা দুটো দায় সেরে রওনা হয়ে পড়ছি এবার।"[৮]

ডাক্তার ধনঞ্জয়ই উপন্যাসের কাহিনীকে গতি দিয়েছে। অলোকরঞ্জন মাতৃহারা পিতৃহারা হয়ে দীপকের মায়ের কাছে পেয়েছে মাতৃত্বের আস্বাদ। আর রাখী অলোকরঞ্জনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাণীর হার করায়ত্ত করলেও সমস্ত ঘটনা যেনে দীপককেই গ্রহণ করেছে স্বামীত্বে।

'রাণী' উপন্যাসে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের সঙ্গে মাতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। নিজের অবৈধ সন্তানকে অর্থ সাহায্যের জন্যই হয়তো রাণী মঞ্জুপ্রভা বিয়ে করেছিল উদয়নারায়ণকে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাণীর মনে সন্তানের প্রতি স্নেহ, বাৎসল্য দেখা যায় না। বরং সন্তানকে গারদে ঢোকানোর নির্দেশ দেয়। গুলিও চালানো হয়। উদ্দেশ্য যাতে কেউ জানতে না পারে যে, দীপক রাণীর অবৈধ সন্তান। দীপক শেষ পর্যন্ত মায়ের ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং মায়ের রাণীত্বকে রক্ষা করতে পাড়ি দিয়েছে হরিদ্বারে ডাক্তার ধনঞ্জয়ের কাছে। এভাবেই মাতৃত্বের থেকে অর্থ বড়ো হয়ে উঠেছে। মায়ের পরিবর্তে রাণীর আত্মমর্যাদাই প্রাধান্য পেয়েছে বলে উপন্যাসের নাম 'রাণী' হয়েছে সার্থক।

পথ কে রুখবে ?

'পথ কে রুখবে ?' (১৯৬৯) উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পশ্চিম বাংলা এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যাবলীর রূপায়ন।

'পথ কে রুখবে ?' উপন্যাসের শুরু হয়েছে ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের কথা বলে। সরকার কর্তৃক বর্ডার শীল করে দেওয়ার ফলে কালো-বাজারী হরিহরের প্রভাব শুরু হয়। প্রসঙ্গত উপন্যাসে জায়গা করে নেয় রঞ্জন দালাল। এপারে সে রঞ্জন দত্ত আর ওপারে রমজান মিঞা। এভাবেই পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার মধ্যে শাসনযন্ত্রের দ্বারা যেভাবে ভেদাভেদ পাকা করার বন্দোবস্ত হয়েছে তার পূর্বসূত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে আরো আগে থেকে।

স্বাধীনতার পূর্বে যে পরিস্থিতিতে রক্তারক্তির মধ্য দিয়ে দেশবিভাগ হয়েছে সেই পটভূমিতেই লেখক তাঁর গল্প শুরু করেছেন। যশোর নিবাসী বীরেশ্বরের পুত্র নিখিলেশ্বর ছিল লাহোর কলেজের অধ্যাপক। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের মাঝরাতে স্ত্রী লীলা এবং কন্যা ফুল্লরাকে নিয়ে হিন্দুস্থানে আসতে গিয়ে নিখিলেশ্বর লাহোর স্টেশনে নিহত হন। তার স্ত্রী লীলা ও কন্যা ফুল্লরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। বেশ কিছুদিন ছোটদা হেমকান্তর কাছে থাকার পর লীলা মেয়েকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্থানে বীরেশ্বরের বাড়িতে যাত্রা করে।

এরপরেই লেখক বর্ণনা করেছেন বাংলাদেশ বিভাগের। চতুর্দিকে চলতে থাকে যুদ্ধের উত্তেজনা। চারিদিকে অবর্ণনীয় হত্যালীলা। বীরেশ্বরের অবসর গ্রহণের পর স্ত্রী কমলবাসিনী, পুত্রবধূ লীলা এবং নাতনীকে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে উঠেছে। 'শতদল' নামে অনাথ শিশুদের এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে বীরেশ্বর এবং তার কয়েকজন বন্ধু মিলে। এই প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার ভার রয়েছে লীলার ওপর। এদিকে বীরেশ্বরের নাতনীর বিয়ের জন্য সম্বন্ধ নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে হিন্দুস্থানে।

নাতনী ফুল্লরাকে নিয়ে বীরেশ্বর পাড়ি দেয় পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে। পথে বাস যাত্রার এবং সীমানার দীর্ঘ বর্ণনা। মড়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার ছলে অসাধু ব্যবসায়ীদের চাল পাচারের কথাও বর্ণিত হয়েছে। দুই বাংলার মধ্যে পারাপারের নানা সংকেত, পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন ইত্যাদি বিচিত্র গল্পও পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীধর মল্লিকের নামে প্রচলিত মল্লিকঘাট দিয়ে সীমান্ত পারাপারের বিচিত্র বন্দোবস্ত রয়েছে।

দেশবিভাগের পরেও মানুষকে মরতে হয়েছে অনাহারে। খাদ্যের জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে জনতা ও পুলিশের মধ্যে। শহীদ হয়েছে বীর তরুণের দল। মল্লিকঘাটে পাওয়া যায় চালের হদিশ। কলকাতা নগরী জুড়ে কালো ব্যাজ পরে চলেছে মৌন মিছিল। মৌন ধিক্কার বর্বরতার বিরুদ্ধে। ধর্ম ও রাজনীতির বিভেদে জনগণ দ্বিখণ্ডিত হয়নি। ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) ও খাদ্য আন্দোলনে (১৯৬৫) সরকারের বর্বরতা, নৃশংস গণহত্যা, লক্ষ শহীদের রক্তলেখা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। লেখক সাংবাদিক সুলভ মানসিকতায় তুলে ধরেছেন সেইসব কাহিনীকে। কানাইলাল দত্ত 'বন্দেমাতরম' বলে নিজ হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন। গোপীনাথ সাহা প্রাতঃস্নান সেরে পট্টবস্ত্র পরে গীতা পাঠ করতে করতে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এসেছে ক্ষুদিরামের প্রসঙ্গ, বিনয়-বাদল-দিনেশ-এর কথা। মেদিনীপুরের আঠারো বছরের ছেলে প্রদ্যোত সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে মেরে ফাঁসিতে যাওয়ার বিবরণও স্থান পেয়েছে উপন্যাসে।

এইপ্রসঙ্গে কাহিনীতে এসেছে নাইজেরিয়ার গণতন্ত্রের কথা। ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৯) কথা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। ২১শে জানুয়ারী ১৭৯৩ গিলোটিনে রাজমুণ্ড কাটা পড়ল। সুন্দরী রাণীও রেহাই পেল না। সে হত্যা কতদূর নৃশংস তা চোখে দেখে আন্দাজ

পাবার ব্যবস্থা রয়েছে লণ্ডনে মাদার তুসোর মিউজিয়ামে। খবরের কাগজের মতো রিপোর্ট উদ্ধৃত হয়েছে উপন্যাসে।

লেখক মনোজ বসু পূর্ববঙ্গ ভাষা আন্দোলনের (১৯৫২) ইতিহাস বিবৃত করেছেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে করাচির গণ পরিষদে ধীরেন দত্ত বলেছিলেন —

''উর্দুর মতন বাংলারও ব্যবহার চাই রাষ্ট্রিক কাজকর্মে।''[১]

ইনি প্রথম পাকিস্থানে বাংলা ভাষার দাবি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ ঢাকার কার্জন হলে ঘোষণা করেছিলেন —

''Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan.''[২]

এই প্রতিবাদে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে পালিত হয় ধর্মঘট। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আট জন ছাত্র। এজন্য দিনটি আজও পালিত হয় 'ভাষা শহিদ দিবস' হিসেবে।

পশ্চিম বাংলাতেও বাংলা ভাষা অবহেলিত। এজন্য লেখক খেদ প্রকাশ করেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি আর ১৯শে মে দুটো তারিখ জুড়ে পালাগান রচনা করার কথা বলা হয়েছে। সেই পালাগান উদ্বুদ্ধ করবে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান উভয় দেশের মানুষকে। এপারে হিন্দুস্থানে বলবে 'মাতৃভাষা' ওপারে পাকিস্থানে বলবে 'জিন্দাবাদ'। ভারতের আসামে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬১ সালের ১৯শে মে। এই আন্দোলনে ১১জন ভাষা শহীদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল শিলচর স্টেশনে।

ভাষা-শহীদদের আত্মত্যাগের পর লেখক চালের চোরা-কারবারি হরিহর খাঁ চৌধুরীর নৃশংস মৃত্যুর কথা তুলে ধরেছেন। জনতা সমুদ্রের তরঙ্গের মত আছড়ে পড়েছে তার বাড়িতে। সহস্র বুভুক্ষু শীর্ণ মুখের উপর দাঁত বের-করা উৎকট হাসি দেখে আতঙ্কে হরিহর চেতনা হারিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। রাজা সৈন্যের হাতে বন্দী হয়ে প্রাণ দিয়েছে।

ধান চালের চোরা -কারবারির ঘটনার মধ্যে এসেছে তারাফুলি ও ফুল্লরার বন্ধুত্ব। বীরেশ্বরের মাধ্যমে সমসাময়িক রাজনৈতিক সচেতনতা তুলে ধরেছেন লেখক। বড় বড় নেতারা মনে

করেন বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু চার্চিলের হিসাব মত অন্তত ছয় লক্ষ মানুষ দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে। নেতাজী আহ্বান করেছেন —

''আমায় রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি।''[৩]

ধারে কাছে থাকা ভারতীয়রা নেতাজীর এই কথায় বিদ্যুৎস্পর্শ পেয়েছিল অন্তরে। ফলে জওহরলাল নেহেরু তো নেতাজীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে উদ্যত। মুসলমানের নামে দুটুকরো করে ফেলা হল ভারতবর্ষকে। যে লাখ লাখ মুসলমান ভারতে রইল তাদের সম্বন্ধে নেতারা নিশ্চুপ। গান্ধীজি বলেছিলেন —

"যে মূল্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা নিচ্ছি, তাতে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।"[৪]

কিন্তু এ শুধুমাত্র তাঁর মুখের কথাই ছিল। চিরকেলে গান্ধীভক্ত বীরেশ্বর ভারত-পাক বর্ডারে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেছে গান্ধী-বাণী। গান্ধীর কথা তাঁর কাছে বেদবাক্যের মত। ফুল্লরা ও তারাফুলির সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গে এসেছে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথা। সীমানা পারাপারের পর বীরেশ্বরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আরো কিছু মানুষের। পরিচয় হয় বীরেশ্বরের আত্মীয় হেমকান্ত মজুমদারের। তিনি হলেন একজন প্রধান বিপ্লবী। বীরেশ্বরদের বাড়ি বদল হয় তারাফুলির মামা আবুল হাসিনের সঙ্গে। সবশেষে লেখক বলতে চেয়েছেন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি দুই পারের বাঙালির পথ রুখতে পারবে না। দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মিলন ভিতরে ভিতরে হয়েছে, লেখক সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন ফুল্লরার মুখ দিয়ে—

> ''নিজের ঠাঁই ফিরে পেতে ইহুদিদের দু-হাজার বছর লেগেছে। আমাদের তো বিশটা বছর হয়নি এখনো। তারই মধ্যে কত কাছাকাছি এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন। হাতিয়ারে হাতিয়ারে বেড়া বেঁধে দিয়েও পথ রুখতে পারে কই ?''[৫]

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের ঘটনা অবলম্বন করে লেখা একালের রাজনৈতিক ইতিহাস 'পথ কে রুখবে ?' রাজনৈতিক চক্রান্তে খণ্ডিত ভারতবর্ষ, দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিভাগ লেখককে পীড়া দিয়েছে। তিনি দেখতে পেয়েছেন বাংলাদেশের মানুষ - সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক এই বিভাগ মন থেকে মেনে নিতে পারবে না। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় ধ্বনিত হয়েছে সেই সুর —

> "সীমান্তে পাহারা বসিয়ে দুই বাংলার মানুষদের পৃথক করে রাখা যায় না, তারা মিলবেই — এই মানবিক আবেগ সমৃদ্ধ এই উপন্যাস বাঙালীর সাম্প্রতিক জীবনের আলেখ্য।"[৬]

তিনি আরও মনে করেন রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শিতার জন্য দেশবিভাগ হয়েছে। যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে বাঙালি জাতিকে। বাঙালিকে দ্বিধা-বিভক্ত করার চক্রান্ত করেছিল ইংরেজ। তদানীন্তন নেতারা তা মেনে নিয়েছেন। এমনই রাজনৈতিক কথাবার্তা বলতে গিয়ে কখনও কখনও রুশ ও ফরাসি বিপ্লবের কথা তিনি শুনিয়েছেন। বাংলাদেশের দুই পারের জনসাধারণের জীবনের বর্ণনা এতে নেই। বীরেশ্বর, লীলা, ফুল্লরাদের নিয়ে কাহিনী গড়ে ওঠার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তাও বিসর্জন দিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্য প্রচারে মনোযোগ দিয়েছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে তাঁর উক্তি —

> "দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা হয়তো ভাববেন, বঙ্গের নামে এপারের মন আনচান করে উঠবে। এজন্য পূর্ববঙ্গের স্থলে পূর্ব পাকিস্থান। আর পশ্চিম বাংলাই বা কেন থাকে। ওটুকু বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই হয়। বঙ্গ নাম থাকে তো কেবল বঙ্গোপসাগর।"[৭]

রাজনীতির শিকার উভয় বাংলার জনগণ এর পাত্র-পাত্রী। চরিত্রগুলির ব্যক্তিক পরিচয় ফুটে ওঠেনি। রাজনীতির শিকার হয়ে কিভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে তা হেমকান্ত, প্রনব, রঞ্জন তারাফুলি প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই বলেই কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্রও নেই; তাছাড়া ছোট-বড় কোন চরিত্রেরই কোন বিবর্তন এখানে দেখানো হয়নি। লেখকের সমাজ সচেতন মন ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে উপন্যাসে। তাঁর জীবনমুখী দৃষ্টির পরিচয় নেই বলেই চরিত্রগুলি জীবন্ত নয়। রাজনীতির ভিড়ে হারিয়ে গেছে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ধর্ম বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান তৈরীর চেষ্টাকে লেখক তীক্ষ্ণভাষায় আক্রমণ করেছেন। এমনকি যে গান্ধীবাদ একদিন দেশকে পথ দেখিয়েছিল, সেই গান্ধীজি এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের বিরুদ্ধেও বলেছেন লেখক। কিন্তু লেখক আশাবাদী; লেখক সম্পর্কে ড. দীপক চন্দ্রের উক্তি —

> "নৈরাশ্য হতাশা দিয়ে জীবনের গতি রুদ্ধ করতে চাননি তিনি। বরং এই অবসন্নতার মধ্যে দেখেছেন মানুষের আশাকে বেঁচে থাকতে।"[৮]

মনোজ বসু জীবনের এক অসীম আনন্দ ও কল্যাণে নিত্য বিশ্বাসী। তাইতো রাজনৈতিক বাতাবরণ, খাদ্য আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনে রক্তস্নাত হয়েও দুই বাংলার লোকেরা সীমান্ত পার হয়ে খুঁজে নিয়েছে নিজেদের আশ্রয়স্থল। দেশভাগ হিন্দু মুসলমানকে শান্তি দেয়নি রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে মাত্র। দুই বাংলার মানুষের মধ্যে বিভেদ চিরস্থায়ী হয়নি। 'পথ কে রুখবে?' গ্রন্থপ্রকাশের তিন বছরের মধ্যেই লেখকের উপলব্ধি বাস্তবে পরিণত হয়েছে —

> "স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অরুণোদয় উভয় বঙ্গের আন্তর সৌহার্দের পরিচয় পত্র। ভ্রাতৃত্বের মাল্যবন্ধনে বাঁধা পড়ল হিন্দু ও মুসলমান।"[৯]

অর্থাৎ 'পথ কে রুখবে?' এই নামকরণটি হয়েছে সার্থক ও যথার্থ।

প্রেমিক

প্রেম সম্পর্কে নিজস্ব ধারণাকে আশ্রয় করে মনোজ বসু রচনা করেছেন 'প্রেমিক' (১৯৬৯) উপন্যাস। মানব মনের হৃদয়গত অনুভূতি প্রেম; সেই প্রেমের বিকাশ মানব-মানবীকে আশ্রয় করে। উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র অর্থাৎ ডাক্তার অরিন্দম রায়, তাঁর স্ত্রী ইভা এবং বন্ধনহীন পুরুষ কমলমুকুল। এদের ত্রিকোণ প্রেমই 'প্রেমিক' উপন্যাসের বিষয়।

ডাক্তার অরিন্দম রায় এবং তাঁর স্ত্রী ইভার দাম্পত্যজীবনের কাহিনী দিয়েই শুরু হয়েছে 'প্রেমিক' উপন্যাস। বাইরে আন্তরিক হলেও ভেতরে ভেতরে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। বেডরুম পর্যন্ত আলাদা। বিচ্ছেদের মূলে কমলমুকুল। লেখক এরপর পূর্ববর্তী ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

কমলমুকুল সাধারণ এক পরিবারের সন্তান। তার বাবা ট্রাক্সি ড্রাইভার আর মা রুক্মিণী দেবী নার্সের কাজ করেন। বাপ ও মায়ের বহুদিন ছাড়াছাড়ি হলেও কমলমুকুল লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করত। একদিন নার্সের ডিউটি দিয়ে ট্যাক্সি ধরে বাসায় ফেরার সময় ট্যাক্সির মধ্যে কমলমুকুলকে তার বাবার গাড়িতে বসে থাকতে দেখতে পায় রুক্মিণী দেবী। রাগে ক্ষোভে বাঁশের টুকরো ছুঁড়ে মারলেন রুক্মিণী দেবী।

> "বোঁও – করে কমলের কপালে গিয়ে লাগল, তাও রুক্মিণী দেখতে পেলেন। টাল খেয়ে ঘুরে পড়বার মতো হয়েছিল। পড়ল না, বড় শক্ত জান ছেলের - কপালে হাত চেপে ছুটে বেরুল। সেই পালাল — ফিরলও একদিন। সেদিন নয়, সে মাস-বছরেও নয়। বছর পঁচিশেক পরে ফিরে এল।"[১]

ঘর ছেড়ে কমলমুকুল জাহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পৌঁছে গেল লণ্ডনে। সৈয়দ মুজতবা আলির 'নোনাজল' গল্পের নায়ক সমীরুদ্দি যেমন আমেরিকায় পৌঁচেছিল তেমনি কমলমুকুল পৌঁচে যায় লণ্ডনে। অরিন্দম রায় লণ্ডনে পাড়ি দেয় ডাক্তারি পড়ার জন্য। ফরেন সার্ভিসের কর্মচারী মনোহরকে ধরে অরিন্দম একটি বড় হাসপাতালে ঢুকতে চায়। সেই সূত্রে পরিচয় ঘটে মনোহর-এর কন্যা ইভার সঙ্গে। এই ইভার মাধ্যমেই কমলমুকুলের সঙ্গে পরিচয় হয় অরিন্দমের। কমলমুকুল এ বাড়িতে প্রতি শনিবার আসত ইভাকে পান খাওয়াতে। লণ্ডনে কমলমুকুল নাম নিয়েছে মি. কামাল। ইভার মধ্যস্থতায় অরিন্দম কমলমুকুলের বাসার আশ্রয় পায়। কমলমুকুল বিবাহিত। সে বিয়ে করেছে ডরথি নামে এক মেমকে। বিয়ের পর ডরথির আগের বরের কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। ডরথির চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান কমল। ডরথি ও তার ছেলে মেয়েদের জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে কমলমুকুল লণ্ডন ছাড়ে। চীনা বন্ধুর সঙ্গে পাড়ি দেয় চীন দেশের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার আগে তিনশ পাউন্ড দান করে যায় ইভাকে। কেননা অরিন্দমের পড়ার ব্যাপারে প্রয়োজন। ইভা গহনা বিক্রি করে সেই টাকা জোগাড় করতে চাইলে কামাল গহনার দাম বাবদ তিনশ পাউন্ড দান করে। যদিও গহনা ছুঁয়েও দেখেনি কামাল।

কামাল চীন দেশে ঢুকতে না পেরে হংকং-এ থেকে যায়। চীনা বন্ধুর (নাম ঊ) কাকাই ব্যবসার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেয়। তিনি বলেন —

> "ক্যামেরার দোকান আমার, কৌলুন হোটেলের গায়ে। জাপান, আমেরিকা, জর্মনি নানান জায়গা থেকে মাল আসে। ডিউটি-ফ্রি বলে দামে সস্তা — এই যেমন সার্ট কিনেছ, আমরাও তেমনি কষে-মেজে যার কাছ থেকে যেমন দাম নিতে পারি। দিব্যি তুখোড় তুমি, আমার দোকানে থেকে যাও। ভাল মাইনে দেবো।"[২]

এই কাকার মেয়েকে (নাম - কাউ-সিয়া) বিয়েও করে। ইতিমধ্যে কামালের একটি মেয়ে সন্তান জন্মায়। নাম সোনিয়া। কাউ-সিয়ার বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসায় সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ে কামালের উপর। বাড়িতে চিঠি লিখে দাদা পঙ্কজমুকুলকে এনে কাজের ভার দিয়েছে।

ব্যবসা যখন জমেছে তখন একদল লোক কাউ-সিয়াকে ধরে নিয়ে যায়। কামালের শ্বশুরের অজ্ঞাতে শাশুড়ি যেখানে মেয়েরা বিয়ে দিয়েছিল। মেয়ে সোনিয়াকে নিয়ে অবশেষে কামাল পাড়ি দিল কলকাতা। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর দেশে ফেরে কমল। মেয়ের চিকিৎসা সূত্রে আবার দেখা হল ডাক্তার অরিন্দম ও ইভার সঙ্গে। ইতিমধ্যে লণ্ডন থেকে ফিরে অরিন্দম ইভা বিয়ে করেছে। যদিও ইভার বাড়ি থেকে এ বিয়েতে মত ছিল না। একটি পুত্র সন্তান এদের। নাম কিং। অরিন্দম ডাক্তারি করলেও আয় তেমন হয় না। কমলমুকুল ডাক্তার বাবুর অবর্তমানে সোনিয়াকে নিয়ে আসে ইভার কাছে। ইভা সোনিয়াকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। ইভাদের আর্থিক অবস্থার কথা বুঝতে পেরে কমলমুকুল ব্লু-হল ফার্মেসি কিনেছে ইভার নামে। কিন্তু মেয়ে সোনিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাঁচানো গেল না কিছুতেই। অরিন্দমের সংসারে অশান্তি বাড়তে শুরু করল। একদিন অরিন্দম কাউকে কিছু না জানিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। ইভার ছেলে কিংও পড়াশুনার জন্য বাইরে থাকে। গ্রামের বাড়িতে ড. অরিন্দম সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে জড়তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ইভা ও কমল কলকাতায় নিয়ে আসে অরিন্দমকে। পক্ষাঘাত গ্রস্থ রোগীকে হাওয়া খাওয়াতে ময়দানে নিয়ে আসে ইভা ও কমল গাড়িতে পাশাপাশি বসে।

> "পঙ্গু মানুষটা দলা হয়ে আছে পিছন দিকে। সামনে ড্রাইভারের সিটে কমল, পাশে ইভা। ঝুঁকে পড়েছে ইভা কমলের উপর - স্টিয়ারিং চাকা কমলের সঙ্গে ইভার মুঠিতেও। অপর হাত হ্যান্ডব্রেকের উপর। দুটিতে মিলেমিশে যেন এক। বাক্যহীন অরিন্দম পিছনে জুল জুল করে তাকায়।"[৩]

এ দৃশ্য অনেকেরই চোখে পড়েছে। এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

'প্রেমিক' উপন্যাসে মনোজ বসু ত্রিকোণ প্রেমের স্বরূপ তুলে ধরেছেন অরিন্দম, কমলমুকুল ও ইভা চরিত্রের মাধ্যমে। ডাক্তারি পড়তে গিয়ে লণ্ডনে অরিন্দমের সঙ্গে ইভার পরিচয়। পরিচয়ের ফলশ্রুতিতে প্রেম। প্রেমের পরিণতি বিয়ে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অরিন্দম চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভাব লক্ষ্য করি। বরং ইভার প্রতি সন্দেহ বোধ ইভার মধ্যে গুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করেছে। অরিন্দম বলে –

> "তোমায় সে ভালোবাসে। আমায় উপকার করে ভালবাসা সে তোমায় কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ব্লু-হলের বেলা মারফতি হলো না তো তোমাকেই সোজাসুজি।"[৪]

সাধারণ প্রেমের ধর্ম হলে সন্দেহ পরায়ণতা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও প্রতিদ্বন্দ্বি মনোভাব। কমলমুকুল কলকাতায় ফিরে আসার পর অরিন্দমের চরিত্রে প্রেমের এই স্থূল দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে।

কমলমুকুল এক ভবঘুরে জীবন্ত চরিত্র। লেখক কমলমুকুলকে প্রেমিক রুপেও চিত্রিত করেছেন। অরিন্দম প্রেমের দিক থেকে সংকীর্ণ হলেও কমলমুকুলের প্রেম আত্মত্যাগের মহানুভবতায় সুন্দর। প্রেমিকা ইভার জন্য সে শুধু দিতে চায়। কমলমুকুলের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় ইভার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। ইভা অরিন্দমকে গর্ব করে শুনিয়েছে –

> "আমায় সে ভালবাসে – তার মধ্যে একবিন্দু খাদ নেই। মনে মনে সেই প্রেমকে আমি প্রণাম করি।"[৫]

কমলমুকুল চরিত্রটির মধ্যে প্রাণ আছে, উচ্ছলতা আছে। সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। যে কোন প্রতিকূল অবস্থাতেও সে ভয় পায় না।

ইভা তার জীবনের দুই প্রেমিককে এক করে দেখেছে। একদিকে সে ড. অরিন্দমের স্ত্রী অপরদিকে কমলমুকুলের প্রেমিকা। দুই প্রেমিক পুরুষের জন্য তার মনে সমান উদ্বেগ কাজ করে। তবুও সংযম ও শুচিতায় সে নিজেকে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে নিয়ে গেছে। স্বামীকে যেমন ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছে তেমনি প্রেমিক কমলমুকুলের বন্ধু হয়ে সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছে। মানুষের নিন্দা ও গালমন্দকে তুচ্ছ করেছে। ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মাধ্যমে ইভা প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ কল্যাণ রূপে ভাস্মর হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও কমলুমুলের প্রথমা স্ত্রী ডরথি, লণ্ডনে ইভার বন্ধু লিজি, কমলমুকুলের মা রুক্মিণী দেবী, বৌদি রাধা – উপন্যাসে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে। ডরথি কমলমুকুলকে বিয়ের পর পূর্বের সন্তানদের বাড়িতে স্থান দিয়েছে। দোকান চালানোর ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ডরথি চঞ্চল প্রকৃতির হওয়ায় কমল বারবার অরিন্দমকে ইয়ার্কি করে সুযোগ নিতে বলে। ইভার গহনা বিক্রির কথা গোপনে কমলমুকুলকে জানিয়েছে লিজি। যার কারণে লণ্ডন ছাড়ার আগে তিনশ পাউন্ড দান করেছে কমলমুকুল ইভাকে। যা প্রয়োজনে ছিল অরিন্দমের। কিন্তু লিজি ও কমল কোন ভাষায় কথা বলেছে, তা উপন্যাসিক জানাননি। কেননা, কমলমুকুল মাত্র কয়েকটা ইংরেজি শব্দ জানত। আর লিজি ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য

ভাষা জানত না। রুক্মিণী দেবী এবং রাধা চরিত্র দুটি কমলমুকুল বাড়ি ফেরার পরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। রুক্মিণী দেবী চিন্তিত হয়েছেন কমল ও ইভার মধ্যে সম্পর্কের কথা চিন্তা করে। অন্যদিকে রাধা চায় তার বোনের সঙ্গে কমলমুকুলের বিয়ে হোক। এ ব্যাপারে বারবার শাশুড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাধা।

উপন্যাসের লেখক মনোজ বসু ত্রিকোণ প্রেমের জাল বুনেছেন। ইভার সঙ্গে পূর্ব পরিচিত কমলমুকুল। ইভার কথায় সে তার প্রেমিক পুরুষ। প্রতি শনিবার সে পান খাওয়াতে আসে ইভার বাড়িতে। কিন্তু অরিন্দমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাড়ির অমতে বিয়ে করেছে অরিন্দমকে। বাড়ির অবস্থা শোচনীয় হলেও ইভা বাপের বাড়িতে হাত পাতেনি। মানিয়ে চলেছে। অন্যদিকে সময় সুযোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইভার পাশে থাকতে চেয়েছে কমলমুকুল। ইভার একদিকে স্বামী অন্যদিকে প্রেমিক কমল। একজন সেরিব্রেল থম্বোসিসে আক্রান্ত অন্যজন সন্তান হারানোয় কাতর, দুজনেরই পাশে থেকেছে ইভা। দুজনকেই সাহচর্য দিয়ে যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। তাই উপন্যাসের নামকরণ 'প্রেমিক' যথার্থ এবং সার্থক।

মানুষ গড়ার কারিগর

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত মনোজ বসুর রচনা 'মানুষ গড়ার কারিগর' (১৯৭০)। তৎকালীন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষকদের পেশাগত দুরবস্থার সম্পর্কে মত পোষণ করেছেন মনোজ বসু আলোচ্য উপন্যাসে।

লেখক মনোজ বসুর কর্মজীবনের শুরু শিক্ষকতা দিয়ে। তিনি সাউথ সাবার্বন স্কুলে (বর্তমান নাম - আশুতোষ কলেজ) ১৯২৪ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। তাঁর শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতাই আলোচ্য উপন্যাস রচনার প্রেরণা। এ বিষয়ে মনোজ বসু জানিয়েছেন—

> ''আমি একটা বই লিখতে চাই ইস্কুল নিয়ে। খানিকটা আক্রোশ নিয়ে বইকি ? ... কলেজ পড়া সেরেই ঢুকি। বেরিয়ে এলাম তখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁচেছি। যৌবনের প্রতিটি মধুভরা দিনমানের অপমৃত্যু ঘটেছে কোলকাতার একটা স্কুলের চতুঃসীমার মধ্যে। ছিলাম জনৈক সাধারণ মাষ্টার। ... মাইনে চল্লিশে শুরু। বিশ বছর ধরে আশি ধরো ধরো করছি। ... বিদ্যাগার বলব না, মানুষ গড়ার কারখানা। মহামতি

> কত চাণক্য ও চার্চিল দিবানিদ্রাটা দুপুরের ক্লাসে সেরে নিয়ে রাতে ও সকালে গুপ্ত অধ্যাপনা অর্থাৎ প্রাইভেট ট্যুইশানিতে ছুটোছুটি করেন।''[১]

মনোজ বসু নিজের জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসের নায়ক মহিম চরিত্রের মাধ্যমে। লেখকের জীবনকে ঠিকভাবে বুঝে উঠতে না পারলে, উপন্যাসের মহিম চরিত্রটিকেও সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। মহিম চরিত্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে লেখকের জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ। লেখকের কথায়—

> ''বি.এ. পাশ করে মাষ্টারি জুটিয়ে নিলাম একটা। ... ক্লাসে ক্লাসে টোপ ফেলে ট্যুইশানি ... গেঁথে ফেললাম সাত-আটটা। বিদ্যাদানের অষ্ট প্রহরী মচ্ছব চলল, ভাবতে গিয়ে আঁতকে উঠি এখন। শেষ রাতে আকাশে শুকতারা এবং রাস্তায় গ্যাসের আলো– আমার পয়লা ট্যুইশানি তখনই শুরু হয়ে গেছে। চলল একের পর এক ছুটোছুটি এ বাড়ি থেকে সে বাড়ী। ...দিন মাস বছর সড়াক সড়াক করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘশ্বাসটাও ছিল মুহূর্মুহূ। জীবনের অপচয়, এ নাগপাশ কেটে বেরিয়ে পড়ব। বেরোবই– দিনান্তে মনে মনে আউড়ে নিতাম।''[২]

১৯২৪ সালে বি.এ. পাশ করে লেখক আইন পড়তে যান। কিন্তু দারিদ্রতার কারণে আইন পড়া সম্ভব হয়নি। উপন্যাসের নায়ক মহিমও মাষ্টারি করার পাশাপাশি আইন পড়তে শুরু করলেও মাঝ পথেই বন্ধ করে দেয়। লেখক নিজে উচ্চ আদর্শবাদকে অনুসরণ করে চলেছেন। মহিম মাষ্টারও হাজার দুঃখ-কষ্ট ও দৈন্যের মধ্যেও আদর্শবাদকে ধরে রাখতে চেয়েছে।

গ্রামের শিক্ষিত যুবক মহিমারঞ্জন সেন। বি.এ. অনার্স পাশ করার পর সে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছেন। তাদের গ্রামের এক ব্যবসায়ী সাতু ঘোষ দেশে এলেন। তার সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর মহিম চাকরী করতে পাড়ি দেয় কলকাতায়। চাকরিস্থলে গিয়ে দেখতে পান সেখানে মিথ্যা ছাড়া সত্যের কোনো ঠাঁই নেই। মিথ্যা আবহাওয়ার মধ্যে মহিম নিজেকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হন। কেননা তাঁর বার বার মনে পড়েছে পূজনীয় শিক্ষকদের আদর্শবাদ। নিজেকে ধিক্কার জানিয়ে চাকরি ছাড়লেন। শুরু হল নতুন চাকরির খোঁজ। অবশেষে প্রভাতকুমার পালিত (মহিমের বাবার ছাত্র) মহাশয়ের সুপারিশে ভারতী ইনস্টিট্যুশনে শিক্ষকতার চাকরি পান মহিম। এরপরই লেখক মনোজ বসু মহিমকে সামনে রেখে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

পালিত মহাশয়ের চিঠি নিয়ে মহিম ঢুকলেন ভারতী ইনস্টিট্যুশনে। তখনও স্কুল বসেনি। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তখন চলছে সময়ের অপব্যয়। কেউ মার্বেল খেলছে, কেউ খেলছে চোর-পুলিশ, কেউ বা করছে মারামারি। মহিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব দেখছে। প্রধান শিক্ষকের আগমনে হঠাৎ যেন কোনো মন্ত্রবলে সকলে চুপ। হেডমাষ্টার ডি.ডি.ডি। পুরো নাম দিব্যেন্দুধর দাশ। গার্জেনরা হেডমাষ্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই অংশে লেখক বিদ্যালয়ের একটি দিনের পূর্ণাঙ্গ ঘটনাক্রম তুলে ধরেছেন। হেডমাষ্টার রুমে ঢুকে যেতেই আবার সেই ছেলেদের হুল্লোড়। প্রার্থনার পর ক্লাস শুরু হল। সহকারী প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন গুপ্ত একটা বেঁটে সাইজের মোটা খাতায় লিজার পিরিয়ডের হিসেবে বসলেন। মাষ্টার মশায়েরা এই খাতাকে যমের মত ভয় পান।

লিজার খাতা এনে জনে জনে সই করাচ্ছে দুখিরাম। লিজার না পড়ায় কেউ কেউ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন বেঞ্চের উপর। পতাকীচরণের লিজার ক্লাস পড়েছে। তিনি বলেন—

> ''প্রিন্সিপল নিয়ে চলি আমি ভায়া। যেদিন লিজার মারবে, সবকটা পিরিয়ড সেদিন ছুটি করে নেব। কিচ্ছু করব না কোন ক্লাসে গিয়ে। দশ বছর মাষ্টারি হয়ে গেল, তিনটে ইস্কুল ঘুরে এসেছি। অনিচ্ছেয় আমায় দিয়ে কাজ করাবে, এমন তো কোন বাপের বেটা দেখিনে।''[৩]

সত্যিই তো আজও এমন ঘটনা প্রতিটি স্কুলেই প্রায় চোখে পড়ে। বাস্তববাদী লেখক মনোজ বসুর চোখকে তা ফাঁকি দিতে পারেনি। কেউ কেউ কথার প্রতিবাদ করে। ঘন্টা পড়লে মাষ্টারমশাইরা সকলে ফিরলেন। কেউ জল খাচ্ছেন। কেউ বা বিড়ি, হুকো, কলকে। মহিম স্যার ক্লাসে ঢুকতেই ছাত্ররা চেঁচিয়ে গল্প বলার জন্য আবদার করল। নতুন মাষ্টার মশায় নতুন উদ্যমে গল্পচ্ছলে পড়াতে শুরু করল। ঠিক ওই সময় পাশের ক্লাসে ঢুকলেন রামকিঙ্কর স্যার। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা দুটো তুলে দিলেন। ছাত্রদের অঙ্কের ক্লাসে ইতিহাস লিখতে দিয়ে—

> ''অতঃপর রামকিঙ্কর চোখ বুজলেন। ক্ষণে ক্ষণে নাসার ধ্বনি। আবার সামলে নিচ্ছেন। ইতিহাস লেখা বন্ধ করে ছেলেরা কাটাকুটি খেলা শুরু করেছে। প্রয়োজনে পড়ে এরা নানারকম নিঃশব্দ খেলা আবিষ্কার করেছে। তাতে আপত্তি নেই, শব্দ না হলেই হল। তারপর স্যারকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন জেনে সাহস ক্রমশ বেড়ে যায় ওদের।''[৪]

নতুন ভর্তি হওয়া এক ছাত্র অতশত বোঝে না। লেখা শেষ করে স্যারকে দেখাতে যায়। অন্য ছেলেরা নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ছাত্রের ডাকাডাকিতে রামকিঙ্কর মাষ্টারমশায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। চক্ষের পলকে ক্লাসের ছাত্রদের পট পরিবর্তন। সকলেই গভীর মনোযোগে লিখে যাচ্ছে। স্যারের নিদ্রাভঙ্গ ত্রিভুবন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। নিদ্রারক্ত চোখে রামকিঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে জানতে চান শাজাহানে কোন শ, আর তাজমহলে কোন জ হয়। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল হলেও স্যারের চিৎকারে ঘাবড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে—

> ''চিলে যেমন করে ছোঁ মারে, চাদরের নিচে থেকে বাঁ হাতখানা বেরিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে আচমকা দিল হেঁচকা টান। ডান হাতের দুটো আঙুল বেঁকে চিমটের মতো চেপে ধরেছে তার কনুয়ে কাছটা। চামড়ার ওপরে পাক পড়ছে।''[৫]

হেডমাষ্টারের নতুন নিয়মে বেত নিয়ে ক্লাসে যাওয়া বারণ। লাইব্রেরি ঘরের কোণে আলমারির একটু আড়ালে থাকত বেত। মাষ্টারমশায়রা দরকার মত নিতেন। বেয়ারাদের এখন সমস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে উনুনে পোড়ানোর জন্য। রামকিঙ্কর স্যার বেতের পরিবর্তে আঙুল দিয়েই কাজ চালিয়ে দেন। পেছনে আর একটি ছেলে লেখা দেখাতে এসেছিল। সে পালাতে চাইলেও তার নিষ্কৃতি নেই। আর কোনো ছাত্র লেখা দেখানোর সাহস করে না। আবার নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজলেন রামকিঙ্কর স্যার। ঘন্টা পড়ার পর বেরিয়ে এলেন। পাশের ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসা মহিমকে জ্ঞান বিতরণ করেন। নিদ্রা থেকে উঠে এসে বলেন যে, পড়ানোর সময় গণ্ডগোল হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু মহিম জানায় যে, শব্দ না করে তো পড়ানো সম্ভব নয়। উত্তরে দাম্ভিকতার সুরে রামকিঙ্কর স্যার এবার বলেন —

> ''আমি তবে পড়াই কি করে ? তিরিশ বছর হয়ে গেল। কত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছি। সুখময় চক্কত্তির নাম শুনেছ— ছোট আদালতের জজ। আমার ক্লাসের ছাত্র। হাফ-ইয়ার্লিতে ইংরেজীতে পেল তের। পড়াতে লাগলাম। এন্যুয়েলে উঠে গেল তিরানব্বুই। স্বভাবচরিত্র পালটে গেল। একেবারে চুপচাপ থাকে, সাত চড়ে কথা বলে না। হাকিম হয়ে এজলাসে বসে এখনো তাই। সেই অভ্যেস রয়ে গেছে — সারাটা দিন চুপচাপ, রা কাড়ে না মুখে।''[৬]

ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে ছেলেরাও ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মাষ্টার মশায়েরা এক ক্লাস থেকে বেরিয়ে অন্য ক্লাসে যাবেন। তারই ফাঁকে পরস্পর একটু গল্প-সল্প করে ক'টা মিনিট কাটিয়ে নিচ্ছেন। এরই মধ্যে প্রধান শিক্ষক ডি.ডি.ডি. রুম ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। মাষ্টারমশায়েরা গল্প ছেড়ে যে যার ক্লাসে ঢুকে পড়েন। সেই সঙ্গে ছাত্ররাও ক্লাস

ছেড়ে বেরোনোর সাহস পায় না। এরপর ডি.ডি.ডি. স্যার এগিয়ে আসেন মহিমের দিকে। নিজের চাদরটা মহিম স্যারের কাঁধে ঝুলিয়ে দেন। কেননা, ছাত্রের সঙ্গে মাষ্টারের পার্থক্য এই চাদর। কনস্টেবলের যেমন চারপাস, মাষ্টারের তেমনি গলায় চাদর।

টিফিনের সময় বিদ্যালয়ে আর এক পরিবেশ। টিফিনের ঘন্টা পড়ছে ঠুন ঠুন করে। অমনি—

> ''একতলা দোতলা তেতলার সবগুলো ঘর থেকে একসঙ্গে তুমুল আওয়াজ। হু-উ-উ-উ-। দেড় হাজার সোডার বোতলের মুখ ফেটে একসঙ্গে জল উৎসারিত হচ্ছে, এই গোছের একটা কথা মনে আসে। তিনঘন্টা কাল ছিপি-আঁটা অবস্থায় যেন ক্লাসের বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে সাজানো ছিল, লহমার মধ্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বারান্দা, হল দুই উঠোন ভরে হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি মারামারি। ইস্কুলে আসবার সময় একজন-দুজন-পাঁচজন-দশজন করে আসে। ভারতী ইনস্টিট্যুশান যে কত বড় ব্যাপার, পরিমাণটা তখন ধারণায় আসে না।''[৭]

গেটের বাইরে রাস্তার পাশে একজন গরম গরম পকৌড়ি ভাজে। ছেলেরা রেলিঙের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে পকৌড়ি কিনে খাচ্ছে। কেউ খাচ্ছে সন্দেশ। কেউ বা সন্দেশ-পকৌড়ি ভাগাভাগি করে খায়। কেউ বা নিজে না খেয়ে বন্ধুকে খাবার দেয়। টিফিনের সময় ছেলেদের হাজারো কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়ার কথা তুলে ধরেছেন লেখক।

টিফিনের সময় মহিম স্যার করালী স্যারের সঙ্গে পান খেতে গিয়ে জানতে পারলেন গুপ্ত অধ্যাপনার কথা। অর্থাৎ প্রাইভেট ট্যুইশান। সকাল থেকে উঠেই মাষ্টার মশায়রা এই কাজে লিপ্ত হন। স্কুলে এসে একটু বিশ্রাম। ছুটির পর রাত্রি পর্যন্ত চলে ছেলে পড়ানো। স্কুলে ক্লাসের ফাঁকেও কেউ কেউ গেঁথে ফেলেন একটা-দুটো। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের শিক্ষকদের মধ্যে গুপ্ত অধ্যাপনার শাহান-শা হলেন সলিলবাবু। গুপ্ত অধ্যাপনা সম্পর্কে করালীবাবু মহিমবাবুকে বলেছেন—

> ''সে কি মশায়, মাষ্টারি লাইনে এলেন, গুপ্ত অধ্যাপনা জানেন না? ওই তো আসল। ইংরেজীতে যাকে বলে প্রাইভেট ট্যুইশান। কিন্তু আমার অ্যাদ্দিনেও ওটা রপ্ত হল না! দু-বেলায় মোটমাট চারটের বেশি পেরে উঠি নে।''[৮]

তৎকালীন সময় মাষ্টারদের বেতন এতটাই কম ছিল যে গুপ্ত অধ্যাপনা ছাড়া সংসার চালানো সম্ভব ছিল না। গুপ্ত অধ্যাপনা চালাতে গিয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন বলে দিতেন স্যারেরা। তাই হেডমাষ্টারমশায় প্রশ্নের জন্য আলাদা আলাদা করে ডেকে বলে দেন। যাতে বিষয়টি গোপন

থাকে। কিন্তু পারস্পরিক 'চেক' অর্থাৎ নাম রোল লেখা কাগজ পাঠিয়ে মাষ্টারমশায় ছাত্রের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। নইলে পড়িয়ে তো পাশ করানো সম্ভব নয়। আর ছাত্র ফেল করলে ট্যুইশানও থাকবে না। অতএব ট্যুইশান বাঁচাতে ছাত্রদের নম্বর বাড়িয়ে পাশ করিয়ে দেন মাষ্টারমশাইরা।

ভারতী ইনস্টিট্যুশনে চাকরী পাওয়ার দিন থেকেই মহিমবাবু ছাত্রদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। টিফিনের সময় দুখিরাম জানিয়ে গেলেন মহিমবাবুর পাঁচ পিরিয়ডে থার্ড-ই এর অঙ্কের ক্লাস। দুরন্ত সব ছাত্ররা রয়েছে এই ক্লাসে। দুর্গানাম স্মরণ করে ক্লাসে ঢুকলেন মহিমবাবু। পিছু পিছু একজন ঢুকতেই গার্জেন ভেবে মহিম স্যার উঠে দাঁড়ালেন। আসলে সে ছাত্র। নাম মনীন্দ্র মোহন ঘোষ। মহিম স্যারের বুক ঢিবঢিব করছে। মনি ঘোষ ক্লাসের পান্ডা। তারই কথা মত বোর্ডে অঙ্ক করতে লাগলেন মহিম স্যার। ছাত্রদের মধ্যে টু-শব্দটি নেই। বেল পড়ার পর ক্লাস থেকে বেরুলেন মহিম স্যার। অমনি —

> ''মনি এল সঙ্গে সঙ্গে। বলে পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি স্যার। আমাদের ক্লাসে বদনাম শুনে এসেছেন। কিন্তু রোজই নতুন এক একজন উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে হাতির মুণ্ডু গনেশের ধড়ে চাপিয়ে— কোন রকমে সময় কাটিয়ে চলে যান। কিচ্ছু জানেন না তিনি, ধরে পড়ে আচমকা ক্লাসে পাঠিয়েছে— তিনি কি করবেন ? আমরাও তেমনি ঘায়েল করবার জন্যে অঙ্ক ঠিক করে রেখেছি। আপনি আসবেন স্যার, একটুও গোলমাল হবে না দেখতে পাবেন।''[৯]

প্রথম দিন থেকেই ছাত্রদের মনে জায়গা করে নিলেন মহিম স্যার। শিক্ষকদের মধ্যেও তিনি প্রিয়। ক্রমে বিদ্যালয়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল শহরের চারিদিকে। মহিমের ট্যুইশানির বাজার বেশ জেঁকে উঠল। মহিম মাকে নিয়ে কলকাতায় বাস করতে আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যে বিবাহও হয়ে গেছে। তখনকার মেয়ের বাবারা স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। কেননা, রোজগার খুব কম বলে। মহিম স্যারের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই মহিম স্যারকে অন্যান্য সকল শিক্ষকের মত সংসার প্রতিপালন করতে ট্যুইশানির ওপর জোর দিতে হয়। উদয়াস্ত ছোটাছুটি ট্যুইশানির জন্য।

ট্যুইশানির দিকে নজর দিতে গিয়ে সংসারের দিকে নজর দেবার সময় নেই মহিম স্যারের। স্ত্রী অসুস্থ। সংসার দেখাশোনা করতে ইতিমধ্যেই মেয়ে দীপালির পড়াশুনা বন্ধ। চিকিৎসার অবহেলায় মারা গেলেন স্ত্রী। ওই দিন বিকেলের দিকে সাতু ঘোষ বহু খোঁজাখুঁজি করে

মহিমের বাড়িতে উপস্থিত। মহিম স্যার কেন পড়াতে যায়নি ? মহিম স্যার উত্তর দেয়নি। মেয়ে দীপালি প্রকৃত ঘটনা জানাল। তবুও সাতু ঘোষ জানিয়ে গেল যেন কামাই না হয়। ভোর হতেই শুরু হল আবার ট্যুইশানি। সময়ের স্রোতে ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা কমতে থাকল। সেই সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিও। পরীক্ষায় ছাত্ররা খারাপ ফল করল। এক এক বাড়িতে পড়াতে গিয়ে শুনতে হল নানা কথা। যা শূলের মত হৃদয়ে গেঁথে যায়। বিদ্যালয়ের নতুন রুটিনে মহিম স্যারকে ওপরের ক্লাস দেওয়া হল না। নানা কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি। ধিক্কার জানালেন নিজেকে ও শিক্ষক সমাজকে।

এরই মধ্যে একদিন জানতে পারলেন মেয়ে দীপালি সাতু ঘোষের ছেলে অলোকের সঙ্গে চলে গেছে এলাহাবাদ। বাড়ি ফিরে নজর পড়ল বালিশের মধ্যে রাখা গচ্ছিত টাকাও নিয়ে গেছে দীপালি। মহিম স্যার ঘোরতর মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। চোখে দেখতে পান না; চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে শুভব্রত তিনটে লেটার সহ প্রথম ডিভিশনে পাশ করল। প্রাইভেটে আই.এ. পড়ছে। মহিম স্যার সেক্রেটারিকে বলে ক্লার্কের কাজে ঢুকিয়ে দিলেন ভারতী ইনস্টিট্যুশানে। এছাড়া দু-একটা ট্যুইশানি পড়ায়। শুভব্রত খেয়ে স্কুলে চলে যায়। পুণ্যব্রত আর রূপালিকে নিয়ে সারাদিন কাটায় মহিম। কষ্টেসৃষ্টে চলছে মহিম স্যারের ভাঙা সংসার। ওদিকে সাতু ঘোষ ছেলে-বউকে মেনে নিয়ে বাড়িতে তুলেছে। উপন্যাসের কাহিনির পরিসমাপ্তি এখানেই। যে কাহিনিতে স্থান পেয়েছে লেখকের শিক্ষকতা জীবনের ছবি। উপন্যাসটির সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> ‘‘‘মানুষ গড়ার কারিগর’ উপন্যাসে লেখক একটা সম্পূর্ণ নূতন বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষকের জীবন লইয়া প্রবন্ধ লেখা ও সভা-সমিতিতে আলোচনা করা হয়, কিন্তু উপন্যাসের বিষয়রূপে ইহার উপযোগিতা এ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হয় নাই। কেন না, শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে আমরা এরূপ উচ্ছ্বসিত মনোভাব পোষণ করি যে, ইহাদিগকে এক আদর্শ-যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত। লেখক এই আদর্শ-যবনিকা সরাইয়া ইহাদের প্রকৃত বাস্তবরূপ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। আদর্শ ব্রতে দীক্ষিত শিক্ষক আজ পেটের দায়ে তাহার মহিমান্বিত আদর্শ ভুলিয়া যে কতটা হীন কৌশল, ঈর্ষ্যাদিগ্ধ প্রতিযোগিতা ও উঞ্ছবৃত্তিতে নামিয়াছে উপন্যাসে তাহাই দেখানো হইয়াছে।’’’[১০]

মহিমকে সামনে রেখে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মূল্য আবিষ্কার করাই লেখকের উদ্দেশ্য। করালীকান্তবাবু, রামকিঙ্করবাবু, সলিলবাবু, গঙ্গাপদবাবু, দিব্যেন্দুধরবাবু, চিত্তরঞ্জন গুপ্ত প্রমুখদের মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজের গতি প্রকৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন মনোজ বসু। শিক্ষক সমাজ আজ যেন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। মেসিনের প্রতি মানব-সমাজের মায়া-দয়া, সহানুভূতি থাকে না; ঠিক তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষক সমাজ সম্পর্কেও। তাঁদের মানুষ বলে গণ্য করা হয়না। তাঁদের আদর্শ, সম্মান কোন কিছুরই মূল্য সমাজ দেয় না। আবার আর্থিক যন্ত্রণায় কাতর শিক্ষক সমাজ অনেক সময় নিজের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে নামতে হয় ট্যুইশানির প্রতিযোগিতায়। শিক্ষক সমাজের দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে ছাত্রসমাজও শিক্ষকদের অসম্মান করে।

'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসটি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত বলে প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত। সমাজের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ ও সংঘাতের মধ্যদিয়ে মহিম চরিত্রটির জীবনে ট্র্যাজেডি দেখানো হয়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মহিমের জীবন কথাই ব্যক্ত হয়েছে। লেখক নিজে শিক্ষক ছিলেন বলেই হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে অঙ্কন করেছেন মহিম চরিত্রটিকে। সাতু ঘোষের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে মিথ্যাচারের কারণে কাজে সুখ পায়নি। গ্রাম জীবনে শিক্ষকদের দেখানো ন্যায় ও নিষ্ঠার প্রতি পরিচালিত হতে চেয়েছেন। দুরন্ত ছাত্রদের পড়ানোর কৌশলে বশ করেছেন। কিন্তু বার্ধক্যে এসে মহিম আর কারোর প্রিয় থাকতে পারেননি। অভিভাবক থেকে ছাত্র সকলের গঞ্জনার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। এপ্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> ''মহিমের জীবনের মধ্য দিয়া শিক্ষকবৃত্তির স্বল্পকালীন সাফল্যগৌরব ও অনিবার্য করুণ ব্যর্থতার গ্লানি উদাহৃত। শিক্ষকের সাফল্যের মানদণ্ড বাড়ীতে ছেলে পড়ানোর সংখ্যাধিক্যে ও উপার্জনের আপেক্ষিক প্রাচুর্যে। অতীত যুগের শিক্ষকের সঙ্গে আধুনিক বণিকবৃত্তি অনুসারী শিক্ষকের পার্থক্য এখানেই – যাঁহারা জীবনশিল্পী ছিলেন তাঁহারা আজ কলকারখানার কারিগরে রূপান্তরিত হইয়াছেন। হাতের দক্ষতা হারাইলে কারিগরের যেমন চাকরি যায়, পাশ করাইবার কৌশল নষ্ট হইলে শিক্ষকের সেইরূপ মূল্য কমে। মহিমের জীবনে এই শোচনীয় তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।''[১১]

মহিম চরিত্রের পাশাপাশি মা, দিদি চরিত্রটিও স্বল্প পরিসরে গুরুত্ব অর্জন করেছে। সন্তান চাকরি পেয়েছে। এবার বিবাহের পালা। ছেলেকে সংসারী করাতে পারলেই যেন মায়ের

নিষ্কৃতি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দুধর বাবুর মধ্যে স্কুল পরিচালনার দক্ষ গুণাবলী বিদ্যমান। সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ লিজার পিরিয়ডের খাতা সারা এবং বুঝিয়ে বাঝিয়ে অন্যদের নিজের ক্লাসে পাঠানো। কালীচরণ বাবু আবার ট্যুইশানি বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। অন্যদিকে সাতু ঘোষকে দয়ামায়াহীন এক শুষ্ক চরিত্র রূপেই তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। মহিমের স্ত্রী মারা যাওয়া সত্ত্বেও মহিমকে ট্যুইশানিতে যেতে জোর করে সাতু ঘোষের মত হৃদয়হীন লোকেরা। সর্বপরি মহিমের জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষকরা ছাত্রকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলার কারিগর। তাঁরা বিরাট একটা যন্ত্রের চালক। ক্ষেত্রগুপ্তের কথায় —

> "শিক্ষক-জীবন এবং শিক্ষার আদর্শ নিয়ে লেখা মানুষ গড়ার কারিগর। বিদ্যালয়ের বাইরের ও ভিতরের জীবন, শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক, বাইরের ঘোষিত আদর্শ ও ভিতরের নগ্ন সভ্যের সংঘাত — শিক্ষকের সামাজিক মূল্যায়নের বিকার, আদর্শবাদী শিক্ষক মহিমের ব্যর্থ জীবনের ঘনিষ্ঠ ছবিটি মর্মান্তিক।"[১২]

তাঁদের ব্যক্তিসত্তা যেন হারিয়ে গেছে; অর্থনৈতিক প্রভাবের কাছে। ত্যাগ ও দারিদ্র্য এক সময় শিক্ষক জীবনের ভূষণ বলে গণ্য হতো, কিন্তু আজকের দিনে সেই মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব। তারা সর্বদা রুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট। তাঁরা চাকরি করেন মাত্র। ছাত্রদের সঙ্গে তাদের প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। শিক্ষক মহামায়েরা শুধু রুটিন মাফিক কাজ করতে অভ্যস্ত। উপন্যাসে স্থান পায়নি শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা মানুষ গঠনে ছবি। আছে অর্থনৈতিক জীবনের বিপরীতে আদর্শ টিকিয়ে রাখার সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষা কারখানার কারিগরদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে মনোজ বসু ড. দীপক চন্দ্র মহাশয়কে জানান –

> ''প্রচ্ছদপটও তাৎপর্যপূর্ণ। মলাটের সামনে ও পিছনের ছবিতে একটা বিরাট মানুষের ছায়া সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে আছে অগণিত ছোট ছোট মানুষ। মহিম মাস্টার প্রথম জীবনে যে উঁচু আদর্শ নিয়ে চলতে চেয়েছিল দীর্ঘ মানুষটির উচ্চতা তারই ব্যঞ্জনা। তারপর জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষটি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেছে। পিছনের মলাটে তাই নুব্জ বৃদ্ধের কঙ্কালসার দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কাঁধে একটা খোলা ছাতা ট্যুইশানি করে ফিরছে। চারিদিকে জীবনোল্লাসে মত্ত নরনারীরা।''[১৩]

বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশের পর মহিমের স্বাতন্ত্রদৃপ্ত আদর্শবাদের ব্যক্তিত্বের পরাভব দেখানো হয়েছে কাহিনীতে। পরিবেশ তাকে সহকর্মীদের দলে নামিয়ে এনে এক পরিবারভুক্ত করেছে। 'মানুষ গড়ার কারিগর'দের সমস্যা বহুল জীবন কাহিনী উপন্যাসের নামকরণটিকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে।

আমি সম্রাট

বেকারত্বের জ্বালা মানুষের জীবনে কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দেয় - তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'আমি সম্রাট' (১৯৭১) উপন্যাসটি। শিক্ষাবিস্তারের ফলে অসংখ্য যুবক যুবতী পড়াশুনো করে ডিগ্রি লাভ করলেও তাদের কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই। বহু ছেলে-মেয়ে পাশ করে চাকরী না পেয়ে তারা হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত। জীবন সংগ্রামে তারা এক সময় ব্যর্থ হয়ে হতাশায় আত্মহননের পথ বেছে নেয়। বেকার সমস্যায় জর্জরিত জীবন কাহিনীকে এখানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক মনোজ বসু।

দেশভাগের কারণে ওপার বাংলা থেকে আগত একটি উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনী এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান চরিত্র অরুণেন্দু, দাদা পূর্নেন্দু এবং মা যশোদা - এই তিনজনকেই নিয়ে সংসার। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অরুণেন্দু স্কুল ফাইনাল পাশ করে। দাদার ইচ্ছায় ভর্তি হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। অরুণেন্দু কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনো করার পাশাপাশি টিউশানি করে। তা দিয়ে পড়াশুনার খরচ চালিয়ে বি.এ.পাশ করে। গ্রামের বাড়িতে মা যশোদা এবং দাদা পূর্ণেন্দুর আনন্দ ধরে না। মা যশোদার ধারণা বি.এ. পাশ করলে ভাল চাকরি পাওয়া যায়। মায়ের প্রত্যাশার কথা ফুটে উঠেছে লেখকের কথায় –

> "অরুণেন্দু ভদ্র, বি.এ. — বুক ফুলিয়ে লিখুক এবার থেকে। যেখানে তাদের পৈত্রিক বাড়ি (এখন পাকিস্থান), তল্লাট কুড়িয়ে তলায় চারটি গ্র্যাজুয়েট ছিল। কী খাতির-সম্মান সেই চারজনের। সামান্য ঘরোয়া কথাবার্তাও লোকে তটস্থ হয়ে শুনত, না জানি কোন পাণ্ডিত্য তার মধ্যে ঝলক দিয়ে ওঠে। অরুণও আজ সেই দুর্লভ দলের একজন - যশোদা বেওয়ার ছেলে পূর্ণেন্দু ভদ্রের ভাই সে অরুণ। গাছ তৈরী হয়ে গেছে - ফল কুড়ানো এইবার।"[১]

অরুণেন্দু চাকরির জন্য হণ্যে হয়ে এক অফিস থেকে আর এক অফিসে চিঠি পাঠাতে শুরু করে। চাকরির দেখা মেলে না। অরুণেন্দু মায়ের প্রত্যাশার কথা জানতে পেরে মিথ্যা করে বলে – সে একটা চাকরি পেয়েছে। আসলে সে তার এক বাল্যবন্ধুর চায়ের দোকানের মালিক চাঁদমোহনের সঙ্গে থাকে এবং চাকরির খোঁজ করে বেড়ায়। ইতিমধ্যে অবশ্য অরুণেন্দু এম.এ. পাশ করেছে। য়ুনিভার্সিটি কনভোকেশনে বিশ্বপণ্ডিতদের বক্তৃতার মাঝে ধ্বনিত হলো–

> "চাকরি চাই চাকরি চাই - তারপর উপাধিপত্র ছিঁড়ে হুড-গাউন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। সভা লণ্ডভণ্ড — বিশ্বপণ্ডিতের বক্তৃতা জমল না। চাকরি দাও, চাকরি দাও - ধ্বনিতে য়ুনিভার্সিটি হল বারান্দা ভেঙে চৌচির হয়ে যায় বুঝি।"[২]

ইতিমধ্যে একদিন দাদা পূর্ণেন্দু এসে উপস্থিত হয় শহরে। ভাই অরুণেন্দুর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে। দাদা ও ভাই মিলে মাকে মিথ্যে বলতে থাকে। যাতে মায়ের মনে আশা-ভঙ্গের বেদনা জাগরিত না হয়। মায়ের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ সন্তান তাছাড়া আর কীই বা করতে পারে ? সবার অলক্ষ্যে এরই মধ্যে বিয়ে হয়েছে পূর্ণেন্দুর। পালকির ব্যবস্থা পর্যন্তও করা যায়নি। অরুনেন্দু বাড়িতে এলে মা যশোদা এবং বৌদি মলিনার আদর-যত্নে ক্ষতবিক্ষিত হলেও সত্যি কথা বলতে পারে না। বরং চাকরির অনেক কাল্পনিক গল্প শোনায়। অসুস্থ মা যশোদাকে শুনিয়েছে আশ্বাস বাণী –

> "তুমি এমনি থাকবে নাকি মা, অসুখবিসুখ সেরে দুদিনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বড় বড় সার্জন আছে কলকাতায়, হাতখানা পাখানা কচাৎ কচাৎ করে কেটে তক্ষুনি আবার বেমালুম জুড়ে দেয়। হাড় কোনখানে একটু বেঁকে গেছে না ফেড়ে গেছে - এতো নস্যি তাদের কাছে।"[৩]

অর্থাৎ মিথ্যাই যখন বলব তাতে বেশি করে বলতে ক্ষতি কী ? অরুণেন্দু গ্রামের বাড়িতে গেলে পাড়াপ্রতিবেশিরা হাতে উপঢৌকন নিয়ে চাকুরিজীবী অরুণেন্দুর সঙ্গে গল্প করতে ভিড় জমায় তাদের বাড়িতে।

কলকাতায় ফিরে আবার চাকুরির চেষ্টা করতে থাকে অরণেন্দু। হঠাৎ দেখা হয় কলেজের বান্ধবী সুব্রতার সঙ্গে। সুব্রতা তাকে নিজের স্বামীর বলে পরিচয় দিয়ে বাবার বন্ধু হরিমোহণের অফিসে নিয়ে যায় চাকরির খোঁজে। কিন্তু চাকরি জোটেনি। সুব্রতার বাবাই হরিমোহনকে

জানিয়ে দিয়েছে আসল সত্য। আবার পাছে সুব্রতা অরুণকে বিয়ে করে এই ভয়ে সুব্রতার বাবা জগন্নাথ অস্থায়ী একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দেয় অরুণের।

> ''মেয়ের কাঁধ থেকে ভূত নামানোর দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। নয়তো বিয়ে দেওয়া দুর্ঘট হবে। লোকের কাছে নিজেরও মুখ দেখাতে পারবেন না। বিস্তর রণকৌশল খাটিয়ে মাস তিনেকের ভিতর জগন্নাথ জুটিয়ে দিলেন – তাঁর নিজের অফিসে।''[৪]

সুব্রতার বাবার আশঙ্কা যে একেবারেই মিথ্যে নয় তার প্রমাণ সুব্রতা ও অরুণেন্দুর কথোপথনে স্পষ্ট –

> ''অরুণেন্দু বলে, বিয়ে না-ই হল – বিয়ের নেমন্তন্নটা যেন পাই দেখিস।
>
> তা বলতে পারিনে -
>
> সুব্রতার সাফ জবাব: বাদই পড়বি ধরে রাখ। বাবার বাড়িতে বাবার নিজের বন্দোবস্ত - আমি কী করতে পারি বল্। তোকে নেমন্তন্নে ডেকে বিপদও ঘটে যেতে পারে। বিয়ে হবে শুনেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর চোখের উপর দিয়ে অন্য লোকের বউ হয়ে যাচ্ছি – হতাশ প্রেমিক তখন ছোরা বের করে আমার বুকে দিলি বা খ্যাঁচ করে বসিয়ে। অথবা নিজের বুকে।
>
> মিটিমিটি হেসে বলল, রাজি থাকিস তো বল্। সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে তোর সঙ্গে পিছটান দিই। আছে সাহস ?
>
> অরুণেন্দু রাজি নয়: তা তেমন করে হবে, চাকরি চলে যাবে যে। আমার অনেক কষ্টের চাকরি। সুব্রতা হাত নেড়ে বলে, যাক না। আমায় তো পেয়ে যাচ্ছিস। তুই তো তুই - একখানা সসাগরা ধরিত্রী পেলেও চাকরি ছাড়তে রাজি নই। এ ভারতে সব কিছু মেলে, সাদা বাজারে না হয় তো কালোবাজারে, শুধু চাকরি মেলে না।''[৫]

বিয়ের পরে সুব্রতা ব্যাঙ্গালোর চলে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই অরুণেন্দুর অস্থায়ী চাকরিও চলে যায়। রাজত্ব ও রাজকন্যা দুটোই হাতছাড়া হয়।

চাকরির খোঁজে বেরিয়ে এরপর দেখা হয় আর এক বান্ধবী পলির সঙ্গে। পলি চাকরি করে ইনপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের এস্টেটস অফিসে। পলির বাবা কাশীনাথ অফিসের প্রধান করণিক। একসময় অরুণ পলিকে পাত্তা না দিলেও চাকরি পাওয়ার আশায় পলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু করে। এমনকি বাড়ির ফাই-ফরমাশও খাটে। পলির বাবা কাশীনাথ মেয়ের বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে অরুণেন্দুর চাকরির ব্যবস্থা করে। চাকরির ব্যবস্থা যখন প্রায় পাকা তখনই উপরওয়ালার নির্দেশে পলির বাবা অন্য একজনকে চাকরিতে নিতে বাধ্য হন। অরুণেন্দু

একথা জানার পর হতাশায় ভেঙে পড়ে। সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বন্ধু জয়ন্ত ও চাঁদমোহনের সঙ্গে অবশেষে চাকরি পাওয়ার আনন্দ সাগরে রাত বারোটা পর্যন্ত ভেসে আত্মহত্যা করে। চিঠিতে লিখে যায় –

''আমার মৃত্যুর জন্য - কেউ দায়ী নয়।''[৬]

শৈশবে এই ছেলের জন্মের পর আত্মারাম আচার্য তার হাত দেখে বলেছিলেন -

''এ ছেলে রাজরাজেশ্বর হবে –দিকপাল সম্রাট হবে।''[৭]

আত্মারামের ভবিষ্যত বাণী আজ সত্যি হল।

'আমি সম্রাট' উপন্যাসে বেশ কতকগুলি চরিত্র থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি ক্ষণস্থায়ী। অরুণেন্দুর পাশে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হলেও পরবর্তী সময়ে তারা হারিয়ে গেছে উপন্যাস থেকে। শুধুমাত্র উপন্যাসের আগাগোড়ায় স্থান পেয়েছে অরুণ। যদিও চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না। নায়ক চরিত্রের গুণাবলীও সেভাবে ফুটে ওঠেনি। অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। চাকরির জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, চাকরের মতো ফাই-ফরমাশ খেটেছে। উপন্যাসের শেষে চরিত্রটির মৃত্যু আমাদের সহানুভূতি আদায় করেছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক যদি চরিত্রটিকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারতো, তবে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের বাস্তবতা আরো বেশি জীবন্ত হত তাতে সন্দেহ নেই।

অরুণেন্দুকে বাদ দিলে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দাদা পূর্ণেন্দু, বৌদি মলিনা, মা যশোদা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ঘটনার বিবর্তনে চরিত্রগুলি মূল কাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সুব্রতা ও পলি যারা অরুণেন্দুর জীবনকে অন্যপথে চালিত করতে পারত তারাও তা করে উঠতে পারেনি। কাহিনীতে বিয়ের আগে সুব্রতা যতটা প্রাসঙ্গিক, বিয়ের পরে ততটাই অপ্রাসঙ্গিক। বিয়ের পর কাহিনীতে তার কোনো স্থান নেই। কুরুপা পলিও কাহিনীকে পরিচালিত করতে পারেনি। কিংবা অরুণকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে অসমর্থ হয়েছে। বন্ধু চাঁদমোহন, জয়ন্তরা কাহিনীতে স্বল্প পরিসরে স্থান পেয়েছে। যাদের সক্রিয়তায় কাহিনী গতি পেতে পারতো, তারা সকলেই থেকেছে নিঃষ্ক্রিয়।

উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অরুণেন্দুর জীবন সংগ্রাম তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। পৃথক পৃথক কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে অরুণেন্দুর জীবনের হতাশা ও ব্যর্থতাকে তুলে ধরা হয়েছে। অরুণেন্দুর জীবন সমস্যাই যেন বর্তমান যুব-সমাজের সমস্যা। শিক্ষিত অরুণেন্দুকে দোরে দোরে ঘুরতে হয়েছে চাকরির জন্য, খেতে হয়েছে ঠক্কর, শুনতে হয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। এম.এ. পাশ করার পরেও অরুণেন্দু জানত জার্ণালিজম, মেকানিজম, শটহ্যাণ্ড, মোটর ড্রাইভিং। তা সত্ত্বেও চাকরি জোটাতে পারেনি। এমনকি শেষপর্যন্ত অপছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও চাকরি না পেয়ে বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ।

সন্তান জন্মানোর পর থেকে সন্তান - এর ভবিষ্যৎ নিয়ে পিতা-মাতা নানান স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। 'আমি সম্রাট' উপন্যাসে অরুণেন্দুর ক্ষেত্রেও সে বিষয়ের ব্যতিক্রম হয়নি। মা - যশোদার স্বপ্নকে আরো উৎসাহিত করেছিল আত্মারাম আচার্যের ভবিষ্যৎ বাণী। আত্মারাম অরুণেন্দুর হাত দেখে বলেছিল - অরুণেন্দু বড়ো হলে দিকপাল সম্রাট হবে। হয়ত তাই হতে পারত, যদি বিধাতা পুরুষ সহায় হতেন। এম. এ. পাশ করার পর কলকাতায় চাকরির খোঁজে অনেকটা সময় অতিবাহিত করার পর গ্রামে ফিরে মা, দাদা ও বৌদিকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হয়। চাঁদমোহনের চায়ের দোকানে কাজ করে মাঝে মধ্যে বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে দিত। দাদা পূর্ণেন্দু আসল কথা জানলেও অন্যরা সব কথা জানত না। সুব্রতাকে পছন্দ থাকলেও চাকরির লোভে তাকে প্রত্যাখান করে। আবার অপছন্দের পাত্রীকে (পলি) বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিতেও মিলল না চাকরি। বাধ্য হয়ে বেছে নিল আত্মহত্যার পথ। বেঁচে থেকে জীবন যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারল না। আত্মহত্যা করার আগে পাঠানো মানি অর্ডার এর টাকা পেয়ে গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ মা বিছানা ছেড়ে নেমে এলো। আর -

> ''একদিকে অভীষ্ট সিদ্ধি - ঝাঁজ -শঙ্খে পাড়া তোলপাড় করে সত্যনারায়ণ পূজো হচ্ছে, পূজোর সামনে সারাক্ষণ যশোদা করজোড়ে আছেন।''[৮]

ঠিক সেই সময় কলকাতায় –

> ''অরুণেন্দুর সুঠাম দেহখানা চিরে - ফেঁড়ে ছিন্নভিন্ন করেছিল, আবার এখন একত্র করে দিয়েছে। লাস কাটা ঘরে পড়ে আছে সে।''[৯]

চাকরির চেষ্টায় বেকার যুবকের করুণ পরিণতিকে লেখক ব্যঙ্গাত্মকভাবে নামকরণ করেছেন 'আমি সম্রাট'।

প্রেম নয় মিছে কথা

লেখক মনোজ বসু 'প্রেম নয় মিছে কথা' (১৯৭২) উপন্যাসে এক বৃদ্ধ দম্পতির পূর্ব ইতিহাস শুনিয়েছেন। চিত্রশিল্পী মনিলাল দত্ত এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী দত্ত এবং নাতি - নাতনি রাহুল ও নীপা - বাংলাদেশে জন্মস্থান দেখতে এসেছেন। মি. দত্ত এবং শ্রীমতী দত্তের বিয়ের পূর্ব কথা স্থান পেরেছে আলোচ্য উপন্যাসে।

গ্রামের নাম মূলটি। যাকে আজ চেনাই যাচ্ছে না। যে দোতলা স্কুল বাড়িটি ঝকঝক করছে, কিছুকাল আগে সেখানে মাষ্টারি করতেন শিল্পী মনিলাল দত্ত। শ্রীমতী দত্ত যার ছোটবেলায় ডাক নাম ছিল ছটা। ছটার বাবা মধুসূদন ঘোষ বাদা অঞ্চলে ফরেষ্টার ছিলেন। তাঁর বড় ছেলের নাম রত্নেশ্বর, মেয়ের নাম ইন্দুলেখা আর ছোট ছেলের নাম রুদ্রেশ্বর। দুই ছেলের ডাক নাম কালু-ভুলু ও মেয়ে ছটাকি নামেই পরিচিত ছিল। এদের বিধবা পিসিমা কৃষ্ণভাবিনীর দেওয়া নাম ছটাকি। ছটার বয়স যখন বারো - তেরো বছর, সেই সময় বড়দাদা রত্নেশ্বর অর্থাৎ কালু হঠাৎ মারা গেল। মধুসূদন নিজের পরিবার নিয়ে উঠলেন চাকরিস্থল অর্থাৎ বাদা অঞ্চলে।

সাতকড়ি দে বাদাবনে ফরেস্টার গার্ডের চাকরি করে মধুসূদনের অধীনে। তার ভাগ্নে মণিলাল দত্ত পরীক্ষার পর মামার কাছে এসেছে ছুটি কাটাতে। মধুসূদনের স্ত্রী রাধিকার চেষ্টায় মনিলালের খাওয়ার ব্যবস্থা হয় ছটাদের বাড়িতে। এই সূত্র ধরেই ছটার সঙ্গে মনিলালের পরিচয়। মনিলালকে সঙ্গে নিয়ে ছটা বেরিয়েছে বন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনে –

> ''কত ফুল, দেখ দেখ, বাদাবন এক সাজানো বাগান। খলসিফুল, হেঁতালফুল, কেওড়াফুল, গেঁওফুল, গরাণের ফুল - এসব গাছ ছটার চেনা হয়ে গেছে – আরও কত কত নাম না জানা ফুল। সাদা খইয়ের ছোট্ট ছোট্ট ফুল – শালুক ফুল কি ওগুলো ? লতাই বা কত রকমের। পত্রহীন সরু সোনালি লতা — সোনার সাতনরী হার পরে বাহার করে আছে গাছেরা। মৌমাছি উড়ছে, প্রজাপতি উড়ছে।''[১]

কখনো বা সবার অলক্ষ্যে ছটা বেরিয়েছে বন্য মোরগের খোঁজে, গর্তের মধ্যে মুরগির ডিমের খোঁজে। অদম্য তার সাহস। বাদাবনের গাছপালার সঙ্গে ছটার অবাধ মেলামেশা ও প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে আমরা যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অপুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

হঠাৎ মধুসূদনের বদলির অর্ডার আসে। তাকে বদলি করা হয় চুমকুড়ি বলে এক গাঙ অঞ্চলে। বাধ্য হয়ে মধুসূদন তাঁর স্ত্রী রাধিকা ও সন্তানদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আসে। ইতিমধ্যে মধুসূদনের বাড়ির অদূরে পুরানো স্কুলে মাষ্টারি চাকরী পায় মনিলাল। সেই সূত্রেই মনিলাল ছটার বাড়ি আসা-যাওয়া শুরু করে। এমনকি ছটাকে পড়ানোর দায়িত্বও নেয়। দুরন্ত ছটা একদিন রাতে যাত্রা দেখার নাম করে স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ড হেডমাষ্টার মণিলালকে সঙ্গে নিয়ে জল কাদায় চারো ঝেড়ে আনতে যায় । কিন্তু অধিক রাতে ফিরে ছটা ধরা পড়ে পিসিমা কঞ্চভাবিনীর কাছে। এবিষয়ে পরদিন মনিলালকেও শুনতে হয়েছে পিসিমার হুঙ্কার –

> ''সত্যি কথা বল্ যদি বাঁচতে চাস, নয়তো ঝাঁটাপেটা করব, মাষ্টার বলে রক্ষে হবে না।''[২]

অন্যদিকে ঘুষ নিয়ে কাঠ পাচারের দায়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে মধুসূদন। চাকরি হারাতে হয়। ম্যানেজার মুখুজ্জে মশায় বলেন –

> ''বেশ তো হলো। বারো বছর নিরঙ্কুশ রাজ্যভোগ হলো, এবার অন্য লোক আসুক। একলা চিরকাল আঁকড়ে থাকবেন, সেটা স্বার্থপরের মতন কথা। অন্যেরা তবে যায় কোথায় ?''[৩]

চাকরিতে বরখাস্ত হয়ে মধুসূদন গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। রোজকার মতো মনিলাল ছটাকে পড়াতে আসে। মনিলাল ও ছটার মধ্যে চুপিসারে কথাবার্তায় সন্দেহ হয় মধুসূদনের। মেয়ে ছটার বিয়ের জন্য এরপর পাত্র দেখা শুরু হয়। মধুসূদন মেয়ের জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার পাত্র পছন্দ করে রেখেছেন। ইঞ্জিনিয়ার পাত্র দেখতে আসার আগেই ঘটল এক ঘটনা। মনিলাল বি.এ. পাশ করতে পারেনি বলেই ছবি আঁকাতেই মন দিয়েছে। একদিন সন্ধ্যে বেলা চুপি চুপি ছটা হাজির হল নন্দনপুরের দত্ত বাড়িতে। সবার অলক্ষ্যে বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকে মনিলালের আঁকা ছটার নিজের ছবি নষ্ট করে দেয়। সাড়া পেয়ে মনিলালের বোন দিবা ছুটে আসে। পিছু পিছু মনিলাল ও তার মা দত্তগিন্নি। ছটা পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। হাঁটতে পারে না। ডাক্তার দেখানো হয়। খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঔষধপত্র খেয়েও পা ঠিক হল না।

এদিকে ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জেঠা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। এসেছেন ছটাকে দেখতে। কিন্তু পায়ের অবস্থা দেখে বিয়ে স্থগিত করে দেন। পরে ডাক্তার, হাকিম-এর মত পাত্ররা

এলেও ছটার পায়ের দোষ আছে বলে বিয়ে ভেঙে যায়। ছটার বাবা মধুসূদন এ ব্যাপারে সন্দেহ করে মণিলালকে। মনিলাল হয়তো বিয়েতে ভাঙচি দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পিসিমাকে মনিলাল বলেছে –

> ''আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক। ছটার বিয়ের সম্বন্ধ আসে, আমি নাকি উড়ো চিঠি পাঠিয়ে ভন্ডুল করে দিই। মাষ্টার মানুষ আমি – ছটা ছাত্রী। কী লজ্জার কথা বলুন তো পিসীমা।''[৪]

একদিন কৃষ্ণভাবিনী অনেক ভেবেচিন্তে হাজির হন নন্দনপুরের দত্তবাড়িতে। পিসিমাই মণিলালের মা অর্থাৎ দত্ত গিন্নিকে বলেন –

> ''দিক গে ভাঙচি যার যেমন খুশি। মেয়েটা তোমাকেই নিতে হবে মণির মা।''[৫]

অবশেষে, মনিলালের সঙ্গে ছটার বিয়ে হয়। আর বিয়ের পরেই ছটার পা ঠিক হয়ে যায়। আসলে এতদিন সে খোঁড়ার অভিনয় করে গেছে, যাতে অন্য কারোর সঙ্গে তার বিয়ে না হয়।

'প্রেম নয় মিছে কথা' উপন্যাসটিতে ছটার বাল্য ও কৈশোরের প্রাণ চঞ্চল রূপটি ধরা পড়েছে। মূলটি গ্রাম থেকে বাদা অঞ্চলে যাওয়ার সময় থেকেই তার দূরন্তপনা আমাদের চোখে পড়ে। বাদা অঞ্চলে পৌঁছে প্রকৃতির সম্পদ অবলোকন করার বাসনায় বাড়িতে না জানিয়ে মনিলাল-এর সঙ্গে বের হয়। মনিলাল একবার গিয়ে পরে যেতে অসম্মত হলে নিজেই বেরিয়েছে। বন্য প্রাণীর ভয় তাকে গ্রাস করেনি। প্রকৃতির সঙ্গে ছটার মেলবন্ধন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমাপ্তি' গল্পের সমাপ্তিকে মনে করিয়ে দেয়। কাহিনীর সঙ্গে এবং ছটার জীবনের সঙ্গে সমাপ্তির সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ছটা গ্রামে ফেরার পর দূরন্তপণা আরও বাড়ে। ছিপে মাছ ধরার জন্য পিঁপড়ের ডিম ভাঙা কিংবা মাছ চুরি করার মত সমস্ত কাজেই তার জুড়ি মেলা ভার। এমনকি মণিলাল-এর সঙ্গে বিবাহের ক্ষেত্রে সমস্ত পরিকল্পনাই তার কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিয়ের পর স্বামীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। স্বামীর পা ধরার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন –

> ''যুগল পা কষে এঁটে ধরে, কেউটে সাপে যেমন ছোবলের পর ছোবল মারে, ছটা ঢপ ঢপ করে পায়ের উপর মাথা ঠুকছে। ঠুকছে তো ঠুকছেই - ছাড়ে না।''[৬]

মনিলাল চরিত্রটির মধ্যে তৎকালীন শিক্ষিত যুবসমাজের প্রতিফলন ঘটেছে। মনিলাল পড়াশুনোর সঙ্গে ছবি আঁকতে পারে। বি.এ. পরীক্ষা দিয়েই মাষ্টারি করতে শুরু করে। সঙ্গে

সঙ্গে ছটাকে পড়ানো। ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের উপযুক্ত করার দায়িত্ব। কিন্তু মনিলাল পরীক্ষায় ফেল করে। ফেলু মাষ্টারের পিছনে লাগতে গিয়ে ছটা বলে –

''ইঞ্জিনিয়ারের বউ যখন হব, বি.এ. ফেল দিয়ে বাসন মাজাব আমি।''[৭]

চরিত্রটির মধ্যে বোধের অভাব লক্ষ্য করি। ছটা তাঁকে পেতে চাইলেও মনিলাল শেষ পর্যন্ত তা বুঝতে পারেনি।

পিসিমা চরিত্রটির মধ্যে তৎকালীন গ্রামীণ জীবনযাত্রায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানসিকতার পরিচয় পাই। সবাই বাদা অঞ্চলে চলে গেলেও ভাবিনী যেতে অস্বীকার করে বলে –

''এ বাড়িও যে তাহলে আহুঅর এক বাদাবন হয়ে যাবে।''[৮]

এমনকি মনিলাল ও ছটার মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে তাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল পিসিমা। শেষ পর্যন্ত পিসিমার চেষ্টাতেই ছটা ও মনিলালের মধ্যে বিয়ে হয়।

ছটার বাবা মধুসূদন চরিত্রটিও বেশ উজ্জ্বল। বাদায় থাকাকালীন অর্থ রোজগারের উপায় করায়ত্ত করেছিল। কাঠ চুরির অপরাধে চাকরী থেকে বিতাড়িত হয়েও গর্ববোধ করে বলেন-

> ''এক যুগ - বারো বছর বনকরে কাটিয়ে এলাম – কে পারে ? চার বছর পাঁচ বছর - এমনিই তো সব। লাগেও না তার বেশি। তেমন তেমন করিতকর্ম হলে ওরই মধ্যে যা করবে - নিজের বাকি জীবন পায়ের উপর পা দিয়ে বসে কাটাবে, ছেলেপুলের সংস্থান রেখে যাবে - তাদের ছেলের, তাদের নাতিরও। এই না হলে মানুষ বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নোনাজল খেয়ে পড়ে থাকতে যাবে কেন ? আমার কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল — কদ্দিন থাকা যায় দেখি। বারো বছর থেকেছি — এটা রেকর্ড।''[৯]

মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে প্রথমদিকে ছটার বাবা যতটা তৎপর ছিলেন, পরের দিকে সেই তৎপরতায় খামতি দেখা গেছে। বিয়ে ভাঙার ব্যাপারে মণিলালকে দায়ী করলেও তা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেননি।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে মা রাধিকা, কাজের মেয়ে সৈরভী, দত্ত গিন্নি চরিত্রগুলি কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছটাকি, মাষ্টার মণিলালের কাছাকাছি থাকতে থাকতে ছটার মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মনিলালের মধ্যে তার

কোন প্রকাশ নেই। ছটার মা রাধিকাও বি.এ. ফেল মণিলালকে নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু মণিলাল বার বার ছটার বিয়ের ব্যাপারে ছটাকে পাত্রের উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছে। তার মধ্যে প্রেমের লক্ষ্মণ নেই। ছটা যে নিজের বিয়ে নিজেই ভাঙছে তাও কেই জানত না। বিয়ের পরেই কাহিনীর সমাপ্তি হলেও তা প্রেমের বিয়ে ছিল না। কেননা, প্রেম ছিল একমুখীন। বৃদ্ধ দম্পতি মনিলাল দত্ত ও মিসেস দত্তের পূর্ব কাহিনীতে ছটার মধ্যে প্রেমের স্ফূরণ দেখা গেলেও মণিলালের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রেমের জাগরণ লক্ষ্য করা যায় না। সে কারণেই উপন্যাসের নামকরণ 'প্রেম নয় মিছে কথা' সার্থক হয়েছে।

হার মানিনি, দেখ

ভদ্রা নদীর ওপর সিরাজকাটি গঞ্জ। এই গঞ্জে বসবাসকারী সলিল, মন্দিরা ও পরীবালার ত্রিকোণ প্রেম কাহিনীকে নিয়ে রূপায়িত হয়েছে মনোজ বসুর 'হার মানিনি, দেখ' (১৯৭৩) উপন্যাস।

কৈখালির মিত্তিররা বনেদি গৃহস্থ। বৃদ্ধা শশীমুখীর দুই ছেলে। বড় ছেলে অনিল মিত্তির শহরের উকিল। পসার দুরন্ত। ছেলে ও বৌকে নিয়ে শহরেই থাকে। ছোট ভাই সলিল। মাইনর স্কুলে কিছুটা পড়েছে। দাদা অনিল তাকে শহরে এনে মানুষ করার চেষ্টা করলেও বিফল হয়। দাদার চেষ্টায় সলিল সিরাজকাটি গঞ্জে কয়লার গোলা খুলেছে। চলছেও বেশ। কিন্তু অনিল হিসাব নিতে গিয়ে জানল - সলিল পেশাকার পাড়ায় যাতায়াত করে। এমনকি মায়ের বালা পরে ঘুরছে পরীবালা পেশকার। ঘটনা জানার পর অনিল তাঁর মাকে বলে —

> ''গাঙের ধারে পেশকার পাড়া। অদৃষ্টের অভিশাপ – টিপিটিপি পাড়ার মধ্যে গিয়ে বালা-পরা পেত্নীটাকে দেখে এলাম। ইস্কুলের আমল থেকে সেটা ঘাড়ে চেপেছে, যার জন্যে ইস্কুল ছাড়িয়ে সিরাজকাটি গঞ্জে এনে বসালাম। পেত্নী ছাড়েনি, ঐ গঞ্জ পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে।''[১]

মাকে অনিল আরও বলে —

> ''ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও মা তাড়াতাড়ি''[২]

শশীমুখীর কথা মতো সলিলের বিয়ের ব্যবস্থার জন্য অনিল মেয়ে দেখার দায়িত্ব নেয়। সেই মতো এক ছুটির দিনে সবাই যখন রায়বাহাদুরের ছেলের বিয়ের যৌতুকের গল্প করছিল, তখনই অনিল ভাইয়ের বিয়ের কথাটা বললেন। অনিলের মহুরী গুরুপদর কাছ থেকে এক পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। গুরুপদ মেয়ের ছবিও এনে দেখিয়েছে। পাত্রীর দাদা দেবব্রত নন্দী - ফার্স্ট ক্লাস-ফার্স্ট ইরিগেশন - ইঞ্জিনিয়ার। পালিত-পালিত কোম্পানির হয়ে কাজ করে। সে নিজে অনিলের বাড়িতে এসেছে সম্বন্ধের ব্যাপারে কথা বলতে। অনিল তাদের যাবতীয় খবরা খবর নিয়েছে। সলিলের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সবকিছু জানত বলে — বিয়ের ব্যাপারে অনিলের স্ত্রী লক্ষ্মীরাণী প্রতিবাদ জানায়। সে স্বামীকে বলেছে —

> "এ বিয়ে না দিয়ে মেয়ের হাত - পা বেঁধে যেন জলে ছুঁড়ে দেয়।"[৩]

পাত্রীর বাড়ি দশঘরা গ্রাম। বিধবা গিরিবালার ছোট মেয়ে মন্দিরা। মন্দিরার বাবা তারকনাথ জীবিত অবস্থায় তিন মেয়ের বিয়ে দিলেও তা সুখকর হয়নি। বড় মেয়ে মালতী। বিয়ে হয়েছিল সরমঙ্গল মজুমদারের ছেলে অনুপমের সঙ্গে। অনুপম বিনয়ী সৎস্বভাবের। এম.এ. পাশ। অনেক চেষ্টা করেও চাকরী জোটাতে পারে না। খাওয়া নিয়ে স্ত্রী সঙ্গে কথাকাটি হলে মালতী বলে —

> "না খেলে তো বয়ে গেল। নির্গুণ পুরুষের অত নোলা কেন ? জিভ গোড়া পোড়ে কেটে ফেলতে পারো না।"[৪]

স্ত্রীর ওপর রাগ করে জলে ডুবে অনুপম আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পর মালতীকেই সকলে দোষী সাব্যস্ত করে। মালতী এসে উঠল বাপের বাড়িতে। সংসার দেখাশোনার ভার এখন খানিকটা মালতীর উপরে। মেজো মেয়ে মাধবী। জামাই মানস কুমারের সরকারি চাকরি। এক উদ্বাস্তু যুবতী মা হয়েছে —

> "পিতৃত্বের দায় মানসের উপর চাপিয়ে মেয়েটা মামলা জুড়ে দিল। কী লজ্জা, কী লজ্জা! মানস বলে ষড়যন্ত্র।"[৫]

মামলায় চাকরি গেল, সম্পত্তি নষ্ট হল। শেষে পাঁচ বছরের জেল হল। ভাই দেবব্রত বোনকে দেখতে গিয়ে দেখল ভানু সরকার নামের একজন পেয়িংগেস্ট হয়ে ঐ ফ্ল্যাটেই থাকে। মাধবীর সংসার সেই দেখে। এ প্রসঙ্গে মাধবী তার ভাইকে জানিয়েছে —

> "জেল থেকে না বেরুনো অবধি না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে আমার অবোধ খোকার দিকে না-তাকিয়ে দিবানিশি আমি ওর ধ্যান করব, তেমন পতিপ্রাণা সাধ্বী হতে পারলাম না ভাই। কিন্তু তোরা কেন নিন্দের ভাগী হতে যাবি — রটিয়ে দিস, আমি নেই।"[৬]

সেজো মেয়ে মঞ্জরী। চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে রূপসী। সে নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে অলকেশকে। তারকনাথ মেনে নেয় — কারণ রাজপুত্রের মতো ছেলে, বাড়ির অবস্থাও ভালো। হঠাৎ অলকেশ পাগল হয়ে যায়। পাগল স্বামীকে ছেড়ে মঞ্জরী এক পা কোথাও নড়ে না। অবোধ শিশুর মত স্বামীর দায়ভার সে নিজের কাঁধে নিয়েছে।

ছোট বোন মন্দিরাকে দেখতে দশঘরা গ্রামে উপস্থিত হয় অনিল মিত্তির। দেবব্রত এবং কাকা শ্রীনাথের চেষ্টায় সমস্ত ব্যবস্থা হয়। কাকা শ্রীনাথের বাড়িতে মেয়ে দেখান হয়। মেয়ে সকলের পছন্দ। দেনা-পাওনার নাম গন্ধ নেই। সময় মতো দেবব্রতও পাত্র দেখে এলো। ছোট বোনের বিয়ে। তারকনাথ নেই চলে দেবব্রত বেশি সতর্ক —

> "আগের তিন বোনের বিয়েয় যা হয়েছে, আয়োজন আড়ম্বর তার চেয়ে কম না হয়।"[৭]

দেবব্রত নিজে গেল বোনেদের আনতে। পিওন এসেছে তিনটি মানি অর্ডার আর চিঠি নিয়ে। মন্দিরা সেগুলি নিয়েছে। তার মধ্যে একটা দেবব্রতর চাকরির চিঠি আর বাকিগুলি আত্মীয় স্বজনের। এর মধ্যে একটি চিঠিতে নজর বুলিয়ে মন্দিরা গোপনে চোখের জল ফেলে। পরে বিয়ে বাড়িতে মঞ্জরী এলে বেনামী চিঠি মন্দিরা তাকে পড়তে দেয়। চিঠিতে লেখা —

> ''শুনেছি পাত্রী দেখতে শুনতে খুব ভাল। ডাক্তার কবিরাজে হার মানলে লোকে দৈবের শরণ নেয়। ঝাড়ফুঁক করে, তাবিজ - মাদুলি ধারণ করায়। আপনার মেয়ে মাদুলি — এই বিয়ে মাদুলি - ধারণ বই কিছু নয়। আপনার হাবা ছেলেকে ভাল করে একটু খোঁজ নিতে বলবেন। পাত্র মাতাল, লম্পট। সিরাজকাটি বাজারের পরীখেমটাওয়ালির সঙ্গে তার আসনাই। দেশসুদ্ধ সবাই জানে ....।"[৮]

চিঠিটা গিরিবালার হাতে পড়তে দেয় না মন্দিরা। জানলে বিয়েটা ভেঙে যেত।

অনেক চেষ্টা করে সলিলকে বুঝিয়ে বিয়ের মন্ডপে হাজির করা হয়েছে। বর যাতে কোন রকম বেফাঁস কথা না বলে সে ব্যাপারে দায়িত্ব পড়েছে ছোট বেলাকার সঙ্গী ভোম্বলের ওপর। কোন রকম অঘটন ছাড়াই বিয়ে সাঙ্গ হয়। মন্দিরা শ্বশুর বাড়িতে এসেছে। সলিল স্ত্রীকে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। দায়দায়িত্ব সবই মায়ের। মাসখানেক পরে দেবব্রত

বোনকে নিয়ে যেতে এসেছে। সলিল কাজের অজুহাতে যেতে নারাজ। হঠাৎ শাশুড়ি শশীমুখী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মন্দিরারও যাওয়া হল না। সলিল স্ত্রীকে নিজের ব্যাপারে সমস্ত কিছু বলে দিয়েছে। শাশুড়ির কাছ থেকেও শুনতে বাকি নেই মন্দিরার। সব শুনেও মন্দিরার কোন প্রতিবাদ নেই। এমনকি মন্দিরা মায়ের কাছে চিঠি দিয়েছে স্বামীর গুণগান করে।

জমজমাট গঞ্জের হাট। মন্দিরা আর ভোম্বল ডিঙিতে করে অনন্ত ফার্মেসিতে যায়, ব্যস্ত ডাক্তারবাবু দু-একটা কথা বলেন মাত্র। ফেরার পথে সুরেলা কণ্ঠ শুনে ঢুকে পড়েছে পরীবালা ঘরে। পরীবালা গাইছে আর তার স্বামী তবলায় সঙ্গত দিচ্ছে। যাওয়া মাত্র মন্দিরা পরীবালাকে দিদি পাতিয়ে পরিয়ে দিয়েছে নিজের আঙ্গুলের আংটি। মন্দিরার সঙ্গে সলিলের কথাকাটি হয়েছে। মন্দিরা জোর গলায় বলেছে, তার স্বামী যেখানে যাবে সেও সেখানে যাবে। মন্দিরা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে স্বামীকে নিয়ে হাজির হয় দশঘরা গ্রামে। মাত্র তিন দিনের জন্য। নতুন জামাই ও মেয়েকে পেয়ে বাড়ির সবাই আনন্দিত। জামাই জাতি গোষ্ঠী ধরে বাড়ি বাড়ি প্রণাম করে এসেছে। গিরিবালার কাছে সলিল ভাল ছেলে। অভিনয়টা ভালোভাবে উতরেছে সলিল। সেইজন্যই তো থিয়েটারে সলিলের এত নামডাক।

সলিল বাড়ি ফিরে অভিনয়ের সাজ পরিহার করে ছুটে গেছে পরীবালার কাছে। গঞ্জের বাড়ি মেরামত করতে টাকা দিয়েছে অনিল। তাই মেরামত শুরু হয়। একদিন সলিল মন্দিরার আংটি ফেরৎ দিল। আংটি নিয়ে মন্দিরা সকলের অলক্ষে উপস্থিত হল পরীবালার কাছে। আংটি আবার তাকে পরিয়েই ছাড়ল। পরীবালার সঙ্গে সলিলের মন কষাকষি শুরু হল। গানবাজনা বন্ধ। পরীবালা সলিলের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলে না। সলিল জানতে পারে পরীবালা ও মন্দিরা ঘন ঘন যোগাযোগের কথা। একদিন অসুস্থ শশীমুখী মন্দিরাকে বলে —

> "আমি তোর সর্বনাশ করেছি। বানরের গলায় মুক্তোর হার ঝুলোলাম — নিজের স্বার্থটাই ভেবেছি শুধু।"[৯]

পরীবালাও সলিলের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকে। পরীবালার কাছে আঘাত পেয়ে একদিন সলিল মন্দিরাকে বেদম প্রহার করে। সারা দেহ ফুলে ওঠে। শাশুড়ি শশীমুখী সব জানতে পারে। রাগে গর্জে ওঠেন —

> "ওর বাপ - ঠাকুরদা চোদ্দ পুরুষের মধ্যে এত আস্পর্ধ কারো হয় নি। কুলাঙ্গারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ, দূর করে দেবো আমার বাড়ি থেকে–"[১০]

মন্দিরা শুধু শাশুড়ির কাছে আশীর্বাদ চেয়েছে, যাতে স্বামীকে সে ভাল করতে পারে।

শশীমুখী আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। সারা শরীরে পক্ষাঘাত। বাক্‌শক্তি নেই কিন্তু সম্বিত আছে। মন্দিরা সবসময় সেবা করে চলেছে। অনিল কলকাতা থেকে ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করাল। লাভ কিছুই হল না। এরই মধ্যে মন্দিরা মা হল। মেয়ের নাম রুমকি। রোগী আর বাচ্চার দেখাশোনা করতে একা পারে না মন্দিরা। বাচ্চাকে দেখার জন্য পরীবালাকে নিয়ে এল বাড়িতে। সলিল পরীবালাকে দেখে চমকে উঠলে, মন্দিরা বলে —

> "দুটো হাতে কুলোচ্ছিল না। নতুন দিদির দিয়ে আমাদের চারখানা হাত হল।"[১১]

বছর খানেক পরে শশীমুখী মারা গেলেন। দেবব্রতর বিয়ে উপলক্ষে গিরিবালারা সবাই কলকাতায় উপস্থিত। অলকেশ মঞ্জরীও কাশী থেকে বিয়েতে এসেছে। মন্দিরা মঞ্জরীকে বলেছে —

> "হার মানি নি সেজদি, দেখ। এবারে অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি। সিরাজকাটি তোমাদের নিয়ে যাব, কদিন থেকে আসবে। আরও ভাল করে দেখবে তখন।"[১২]

মঞ্জরী সিরাজকাটি এসেছে পরীবালাকে দেখতে। মন্দিরা বড়ি দিচ্ছে, মঞ্জরী ফাই ফরমাস খাটছে। মন্দিরার মেয়ে রুমকি সকলের আদরের। সুখের সংসার গড়ে তুলে মন্দিরা শিউরে উঠে বলল —

> "চিঠি ভাগ্যিস আমার হাতে দিলেন মা।"[১৩]

আলোচ্য উপন্যাসে প্রধান দুটি চরিত্র মন্দিরা ও সলিল। পার্শ্ব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরীবালা। এছাড়া শশীমুখী, দেবব্রত, অনিল প্রত্যেকেই কাহিনীকে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সলিলের বিয়ে হয়েছে মন্দিরার সঙ্গে কিন্তু সলিলের যাতায়াত পরীবালার গৃহে। পরীবালার প্রেমে সে আবদ্ধ। মন্দিরাকে যাতে বিয়ে করতে না হয় সেজন্য বেনামী চিঠিও লেখে। এমনকি বিয়ের পর সলিল মাকে বলেছে —

> "মা ছোট বউয়ের শখ তোমার। বউ এনে দিয়েছি, আমার ছুটি। আর আমায় কিছু বলতে পারবে না।"[১৪]

বিগড়ে যাওয়া স্বামীকে নিজের চেষ্টায় ভাল করে তোলার জন্য পৌঁছে গিয়েছে পরীবালার বাড়িতে। পরীবালাকে নিজের আংটি পরিয়ে দিদি পাতিয়ে নিয়েছে। প্রয়োজনে নিজের সন্তানকে দেখাশোনার ভার দিয়ে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছে পরীবালাকে। যা হয়তো বাস্তবে কখনো হয় না। তা উপন্যাসে ঘটেছে। মন্দিরাও যেন বাস্তবের নারী চরিত্র নয়। মঞ্জিরা বোনকে একসময় এভাবেই বলেছে —

"একালের মেয়ে হয়ে তুই সেকালের মতন ভবিতব্য মেনে বসে রইলি।"[১৫]

মন্দিরা নিজের ধৈর্য্য আর চেষ্টায় সলিলকে সুস্থ জীবনে ফিরে এনেছে। ঘটেছে মিলনান্ত পরিণতি। পরীবালার মধ্যেও সাধারণ নারীসুলভ মানসিকতা নেই। সে যেন উদার চরিত্র। মন্দিরাকে সে সহজেই আপন করে সলিলকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরে সলিলের বাড়িতেই পরীবালার স্থান হয়েছে। সলিলের দাদা অনিল ভাইকে অনেকভাবে ভাল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। শেষপর্যন্ত মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিনা পণে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। পরীবালার থেকে মুক্ত করতে এই বিয়ের ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে তিনিও ব্যর্থ। মা শশীমুখী ছেলে সলিলকে বিয়ে দিয়ে সংসারের বেড়া জালে বাঁধতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তবতার অভাব লক্ষ্য করি। চরিত্রগুলি যেন অসম্ভব ঘটনার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের পরিণতিতে আমাদের মধ্যে চরিত্রগুলি সম্পর্কে অনেক প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। তাসত্ত্বেও ত্রিকোণ প্রেমের রোমান্সধর্মী উপন্যাস হিসেবে 'হার মানিনি, দেখ' উপন্যাসটি সার্থকতা পেয়েছে।

তারকনাথের মেয়েদের বিবাহিত জীবন সুখী নয়। তাই দেবব্রত ছোট বোনের বিবাহের সম্বন্ধও বার বার ভেঙে যাচ্ছিল। সেইসময় উকিল অনিলের চেষ্টায় সলিলের সঙ্গে মন্দিরার বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের ঠিক পূর্বে এক বেনামি চিঠি আসে মন্দিরার মায়ের নামে। পাত্রের অসৎ চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাতে লিপিবদ্ধ। সেই চিঠি মন্দিরার হাতে পড়ে। মন্দিরা সেই চিঠির কথা একমাত্র বলে দিদি মঞ্জিরাকে। মঞ্জিরা বিয়েতে বাধা দেয়। কিন্তু বিয়ের পর সলিলের চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টায় করতে থাকে। সলিলের অত্যাচার সম্পর্কে শাশুড়ি শশীমুখীকে মন্দিরা বলে —

> "ছেলের নিন্দেয় আপনি মা রেগে যাবেন। আমি কিন্তু ভাবি, সেজদি'র আর আমার এক কপাল সেজদি সারিয়ে তুলেছে — আমিও দেখি! আপনি আশীর্বাদ করুন আমায়।"[১৬]

মন্দিরার অধ্যবসায়ে সলিল সব বদ অভ্যাস ছাড়তে বাধ্য হয়। সুস্থ জীবনে অভ্যস্থ হয়। সেই কথাই মন্দিরা মঞ্জিরাকে জানায় দেবব্রতর বিয়েতে —

> "হার মানিনি সেজদি, দেখ। এবারে অভিনয় নয় সত্যি সত্যি।"[১৭]

সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমে অর্থাৎ মিলনান্ত পরিণতিতে উপন্যাসের সমাপ্তি। নামকরণও সার্থক।

মৃত্যুর চোখে আগুন

'মৃত্যুর চোখে আগুন' (১৯৭৩) উপন্যাসটিতে লেখক মনোজ বসু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের অধীন পূর্ব পাকিস্তান। স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশের লোকেরা শুরু করেছে আন্দোলন। ফলস্বরূপ খানসেনাদের অকথ্য অত্যাচারের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে উপন্যাসে।

সুবক্তা সুকুমার একজন শিক্ষিত মানুষ। প্রথম সারির নেতা হবার উপযুক্ত। তার প্রাণের বন্ধু সাজ্জাদও তাই ভাবত। সুকুমার মেসে থাকেন, মা-বউ থাকে গ্রামের বাড়িতে। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারকে নিয়ে শহরে থাকা খরচে কুলোয় না সুকুমারের পক্ষে। অথচ সাজ্জাদরা সবাই একসঙ্গে থাকে। সাজ্জাদ বিয়ে করেনি। সুপাত্রে বোন রোকেয়ার বিয়ে দিয়ে তবে নিজে বিয়ে করবে। প্রতি রবিবারই সুকুমার সাজ্জাদের গ্রাম ঝাউতলার বাড়িতে আসে। রোকেয়া সুকুমারকে রাঙাদা বলে। সুকুমার ও সাজ্জাদের মধ্যে দ্বিজাতি তত্ত্ব নিয়ে নানা আলোচনা হয়। সাজ্জাদ টু-নেশনত্বের পক্ষে আর সুকুমার বিপক্ষে। সুকুমার বলেছে –

> ''টু-নেশনস তোমার জিন্না নিজেই কি বিশ্বাস করেন ? চিরকালের ন্যাশনালিস্টকে দায়ে পড়ে আজ কম্যুনাল ভেক নিতে হয়েছে।''[১]

এসময়ে গান্ধীজি জিন্নাহকে 'কায়েদে আজম' উপাধি দিয়েছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী ঢুকে পড়ায় জিন্নার দাম কমেছে।

সুকুমারের চেষ্টায় রোকেয়ার বিয়ে হয়ে গেল জেলা সদরের সেরা উকিল বাবু মিয়ার ছেলে মাহবুব আলমের সঙ্গে। সেও উকিল। সুকুমার কলেজে পড়ানোর পাশাপাশি জনবার্তা কাগজের সহযোগী সম্পাদক। সাজ্জাদ নবনূর কাগজের অস্থায়ী সম্পাদক। দুই বন্ধুর সুখের লড়াই এখন স্থান পেয়েছে কাগজের লড়াইয়ে।

দেশভাগ হয়েছে। দু-দেশের নেতারা তাড়াতাড়ি মসনদ দখল দিলেন। সাজ্জাদরা ঝাউতলার বাড়ি বিনিময় করে ঢাকায় চলে গেল। আর সুকুমারের মা শ্বশুরের ভিটে মাটি ছেড়ে নড়লেন না। সঙ্গে বউও। বছর খানেক পরে জানা যায়, সাজ্জাদের মৃত্যু হয়েছে।

বন্যার জলের মত মানুষ পশ্চিমবাংলায় চলে যাচ্ছে। সুকুমারদের গ্রামের সকলে দেশ ত্যাগ করেছে। সুকুমারদের সংসার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুকুমার দশ দিনের ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছে। স্টেশনে নেমে সুকুমার রোকেয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

> ''রোকেয়ার কোলে ছ-মাসের ছেলে। ছেলের আগে মেয়ে হাসু – ভাল নাম হাসিনা। মেয়ে দেখে যে চোখ ফেরে না। ফুটন্ত গোলাপ একটি — গোলাপ ফুলেরই রঙ।''[২]

উপায় না পেয়ে সুকুমার তার মা এবং পরিবারকে ওপারে গ্রামের বাড়িতে রেখে ফিরে এসেছে।

এই ঘটনার বহুদিন পর উপন্যাসের আসল কথাবস্তুর সূচনা। ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম দিকের বিকেল। কলকাতায় সুকুমার উপরের ঘরে বসে ছিলেন। সুকুমারের ছেলে রতন খবর দিয়েছে চট্টগ্রাম থেকে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। জানা গেল রোকেয়ার মেয়ে হাসিনা যাকে হাসু বলে ডাকা হত। হাসুর সঙ্গে অনেক কথা হল সুকুমারের। ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স কংগ্রেসের ডাকে জামাই সাইফুল ইসলামের সঙ্গে সে এখানে এসেছে। রাতে খাবার পর সুকুমার তাদের বাসায় পৌঁছে দেয়। যেতে যেতে সুকুমার জানায়, মরণের আগে দেশভুঁই তার আর একবার দেখার ইচ্ছা। তখনই বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে হাসু জানায় -

> ''লাখ লাখ মানুষ – তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু আর এম.এন.এরা সকলে মিলে শপথ নিল। বাংলার মুক্তি আনবেই।''[৩]

মুজিব ও ইয়াহিয়ার বৈঠক বানচাল হয়েছে। মুজিব সাতাশে মার্চ হরতাল ডেকেছে। কিন্তু তার আগেই পঁচিশের রাত্রে পাকিস্থানীর ফৌজ বর্বর গণহত্যায় অংশীদার হয়েছে। বাঙালির দোকানপাট লুটপাট করেছে খান সেনারা। বাদ যায়নি তাদের মেয়ে-বউরা। রোকেয়া শুনেছে মুজিবের ঘোষণা–

> ''বাঙলার মানুষ যে যেখানে আছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রতিটি ঘর দূর্গ বানিয়ে ফেলুন। আল্লাহ্ মদত দিন আপনাদের। জয় বাংলা।''[৪]

পাকিস্থান রেডিও ঘোষণা করেছে মুজিবর রাষ্ট্রদ্রোহী। অন্যদিকে বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রাম চলছে। মুজিবরকে একই সঙ্গে নানাজায়গায় দেখা গেছে। আসল মুজিব ছাড়াও কিছু ডামি চারিদিকে ছাড়া রয়েছে। মুজিবরকে ধরে এমন সাধ্য কার ?

সুকুমারের ছাত্র সুজয় ও ফারুক জানিয়েছে তাদের জয় হয়েছে। সুজয় ও ফারুক এর পিতৃভূমি একই শহরে। সুজয় এপার বাংলার খবরের কাগজের রিপোটার আর ফারুক ওপার বাংলায় এক কলেজের অধ্যাপক। সুকুমার বাড়ি যাচ্ছেন। এ বিষয়ে নিজের ডায়রিতে সুকুমার লিখেছেন –

> ''বাড়ি যাচ্ছি আমার মায়ের কোলে। কতকাল আজ মা ছাড়া - স্বাধীনতা সৌভাগ্যের সেই গোড়ার আমল থেকে। আমার চিরকালের গাঁ-গ্রাম ভিন্ন রাষ্ট্রে পুরে দিল।''[৫]

যত এগোচ্ছেন যেখানে সেখানে জয় বাংলার পতাকা। চারিদিকে আনন্দের ঢেউ। পুলের উপর গাড়ি থামাল একজন। ফারুক চিনতে পেরেছে। মাহবুব আলমের ছেলে আনিস গাড়ি থামিয়েছিল। সে মুক্তি বাহিনীর প্রথম সারির একজন। সুকুমার ভিন্ন দেশের মানুষ; তারও অধিক শত্রু। ভারতের মানুষ, আসা যাওয়া একেবারে বন্ধ। আনিস বলেছে —

> ''বাঘের গুহা লোকে ভাবত, এখন যানে ইঁদুরের গর্ত বই কিছু নয়।''[৬]

বেরুলেই লাঠি পিটিয়ে সাবাড় করবে। সবাই ভারি খুশি। সকলে মিলে মিশে বাহিনী গড়েছে। বাহিনীর মানুষ ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে, নৌকায় দাঁড় টানছে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। ফারুক একে একে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে সুকুমারকে।

সুকুমার হালদারকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। এপার বাংলার বড় রাস্তার পাশেই মুক্তি বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্প। সাধ্যমত সবাই সাহায্য করছে। ফারুক কলকাতা গেছে সুকুমারের কাছে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। মুক্তি বাহিনীতে কমান্ডার হয়েছে আনিস। সুকুমারও এপার থেকে নেতৃত্ব ও উপদেশ দিচ্ছে। আনিসের খোঁজে সৈন্য এসেছে আলমের বাড়ি। তাকে না পেয়ে নিয়ে যায় আলমকে। আলম ভালোভাবে বাড়ি ফিরে আসে। মন্মথর সঙ্গে আলমের কথা হচ্ছে; হিটলারি জার্মানিতে ইহুদি হয়ে জন্মানোই দোষ ছিল, ইয়হিয়ার পাকিস্থানে হিন্দুরাও অবিকল তাই। মুজিবর-এর দেশ গঠনের ডাক এর বিপরীতে ইয়াহিয়া ডাক দিয়েছে খতম করার। প্রতিটি ফৌজি কমপক্ষে একশ জনকে মারবে। এই হুকুম ছিল খানসেনাদের উপর। বেশি হলে খাতির ও ইনাম দুই বাড়বে। ভারতে শরণার্থী আসার জোয়ার চলছে। ক্যাম্পে রিলিফের কাজ চলছে। জাত-বেজাত আর ছোঁয়া খাবারের বাদ বিচার বাংলাদেশে আর নেই। সকলের একই পরিচয় বাঙালি। তবে –

> ''আলোর পাট নেই। সাংঘাতিক রকমের দায় না পড়লে আলো কেউ জ্বালে না। বাংলাদেশ জুড়ে আগুনের আর রক্তের প্রচণ্ড সমারোহ।''[৭]

পূর্ববাংলার মানুষের মোটের ওপর দুটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় — কবর আর ভারত। নারীর কান্না। কত গাঁ-গ্রাম নদীনালা দেশভুঁই পার হয়ে এসে এপার বাংলার ক্যাম্পের ভেতরে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে।

সুকুমার হালদারের ছেলে রতন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। শিখে নিয়েছে নামাজ। খানসেনাদের মতে হিন্দুরাই পাকিস্থান ধ্বংস করতে চায়, তাদের শেষ করতে হবে। এক বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ছবি দেখতে পেয়েছে। নজরুলের ছবি ভেঙে তছনছ করেছে। গুলি চালিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখে তারা মনে করেছে পীর পয়গম্বর সুফী বলে। সেই কারণে রক্ষা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হায়দার বিশ্বাসের কাছ থেকে হিন্দুদের খবর জানতে না পেরে তাঁকে খানসেনারা পুড়িয়ে মেরেছে। গ্রাম থেকে হাসুকে নিয়ে বাবুমিঞা শহরে ছেলের কাছে এসেছে। সকলের প্রিয় মাষ্টার কানুদা চর কাসেম আলির কবলে পড়ে খুন হয়েছেন। বাংলাদেশে তুমুল লড়াই চলছে। ঘৃণ্যতম আঘাত রাতারাতি বাংলাদেশবাসীর জাত পাল্টে দিয়েছে। বাঙালিরা রীতিমত লড়ুয়ে জাত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গেরিলা পদ্ধতিতে ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। রতন, আনিস-এরা স্বাধীনতার পথ সুগম করে তুলেছে। ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্থান বাহিনীর পতন হয়। স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। এর বাইশ বছর পর সুকুমার হালদার বাড়ি চলেছেন তাঁর মাকে দেখতে। কিন্তু বাড়ির চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না, গ্রামও নিশ্চিহ্ন। শহরে এলেন বাবুমিঞার বাড়ি। রোকেয়া তখন বৃদ্ধা। সেখানেই শুনলেন ফৌজের অত্যাচারের কথা। হাসুকেও তারা হত্যা করেছে বীভৎসভাবে। অত্যাচারিত হাসুর ছবি দেখে বিচলিত হলেন সুকুমার। লেখকের বর্ণনায় –

> ''তবু মুখ এখনো কী অপরূপ - কার সাধ্য নজর ফেরার মুখ থেকে, ডাগর ডাগর চোখ থেকে! চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে, যেন দুর্লভ একজোড়া হীরে।''[৮]

অত্যাচারের মর্মন্তুদ বর্ণনা শুনে সেখান থেকে দ্রুত সার্কিট হাউসে চলে গেলেন সুকুমার। এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পাকসৈন্যবাহিনীর বাঙালিপীড়নের একখানি নিখুঁত তথ্যচিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক মনোজ বসু। উপন্যাসে সুকুমার, রতন, আনিস – এরা সকলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক। এদের ব্যক্তিজীবনের কথা ঔপন্যাসিক কোথাও তুলে ধরেননি। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলেই এরা উপন্যাসে এসেছেন। অন্যদিকে উপন্যাসে অত্যাচারিত মানুষের প্রতিনিধি হল – আলম, রোকেয়া, হাসিনা প্রমুখ। উপন্যাসে সুকুমার, রোকেয়া, হাসিনার ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীকে প্রাধান্য দিলে উপন্যাসটি আরও শিল্পসম্মত হয়ে হয়ে উঠত। সুকুমার চরিত্রটির বাড়ির খবর উপন্যাসে থাকলেও বাড়ির লোকজনদের কথা কাহিনীতে স্থান পায়নি। সুকুমারের মা, স্ত্রীদের সম্পর্কেও কিছু কথা বলা হয়নি। ছেলে রতন মুক্তিযোদ্ধা কাহিনীতে অংশ নিয়েছিল বলেই তার অস্তিত্ব উপন্যাসে রয়েছে। রোকেয়ার অবিবাহিত জীবন থেকে কাহিনীর সূত্রপাত। শেষ রোকেয়ার বার্ধক্য জীবনে এসে। যে সময়ের প্রাক্কালে ঘটেছে রোকেয়ার স্বামীর উপর পাকসেনার অত্যাচার। ছেলে আনিস অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। বাড়িতে আনিসকে না পেয়ে পাকসেনা চালিয়েছে হাসিনার উপর বীভৎস অত্যাচার। ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর করাল গ্রাস। অথচ সুকুমারের জীবনের ঘটনাক্রম উপন্যাসে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বর্ণনাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের জাতির

জনক সেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবর্ষ পরে এই উপন্যাস ও চরিত্রগুলি আজ খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাই চরিত্রগুলি আন্দোলনের ভিড়ে হারিয়ে গেলেও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

স্বাধীনতা লাভের সময় বঙ্গবিভাগ হয়েছে। লেখক এই বঙ্গভঙ্গ চাননি। তবুও পূর্ববঙ্গ হয়েছে পূর্ব পাকিস্থান। এই ঘটনা লেখককে দিয়েছে মর্মপীড়া। কেননা লেখক তথা সুকুমার দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। দেশভাগের পর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনীর সদস্যরা পাক সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীনতা আনার চেষ্টা করেছে। নেতৃত্ব দিয়েছেন মুজিবর হোসেন। স্বাধীনতা এসেছে পূর্ব- পাকিস্থান হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু তা এসেছে অনেক রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে। অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমে। যা সুকুমারকে পীড়া দিলেও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাংলাদেশ দেখে হয়েছেন আনন্দিত। বিষয়বস্তুর নিরীখে উপন্যাসের নামকরণ 'মৃত্যুর চোখে আগুন' সার্থক হয়ে উঠেছে।

সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ

গ্রামজীবনকে নিয়ে লেখা মনোজ বসুর অন্যতম উপন্যাস 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' (১৯৭৫)। গ্রামের কথা, গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রার কথা অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা হলেও গ্রামজীবনকে চিত্রিত করাই ছিল লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের অধিকার থেকে যে সব মানুষ বঞ্চিত তাদের দেখে লেখকের মন হাহাকার করে উঠেছে। সেই কথাও ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে।

উপন্যাসের মানুষেরা বিংশ শতকের প্রথম পাদের অর্থাৎ লেখক মনোজ বসু পরিণত বয়সে লিখলেও ছবিটা শৈশবের। লেখক কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করেছেন। কলকাতায় আছেন। মাষ্টারি করেছেন। কিন্তু মনের ভেতরে ছিল জন্মভিটা ডোঙাঘাটা গ্রামের আশপাশ। অবসর পেলেই ছুটে যেতেন জন্মভিটাতে। উপন্যাসের মাটি মানুষজন এখানকার অর্থাৎ যশোহর জেলার প্রত্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ও উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত। পাঁজিয়া স্কুলে পড়েছেন। যাতায়াত সূত্রে পাঁজিয়ার সঙ্গে কলকাতার নাড়ীর সংযোগ। উপন্যাসের গ্রামের নাম

সোনাখড়ি। সোনাখড়ি তাহলে কোথায় ? পাঁজিয়ার রূপক বোধ হয় সোনাখড়ি। কেননা যশোর থেকে কেশবপুর দশ ক্রোশ। মানে বিশ মাইল। উপন্যাসে সদর কসবা থেকে নাগরখোপ এর দূরত্ব প্রায় দশ ক্রোশ। উপন্যাসটি যেন লেখকের দেখা গ্রামজীবনের ছবি। এই সব গ্রাম তো আমাদেরই কাছে পিঠেই। এই সব গ্রামের গাছে গাছে আজও পাখপাখালি ডেকে যায়। পূর্ববাড়ির বড় গিন্নি তখন কাসুন্দি বানাত। ডাঁটা শাক দিয়ে খেতে বেশ জমতো ভালো। বড় গিন্নি নেই কিন্তু অন্য বউরা আজও কাসুন্দি বানায়। শীতের দিনে রাত জেগে পিঠে পুলি তৈরী হয়। কলকাতায় থেকেও গ্রামীণ মানুষের জীবন চিত্রের অসাধারণ কথামালা সাজিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের পাতায় পাতায়। গ্রাম জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাকে একত্রিত করেছেন সামান্য একটি কাহিনী সূত্রকে অবলম্বন করে।

সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ সম্পন্ন গৃহস্থ। তার ভাই দেবনাথ কলকাতায় চাকরি করে। তাদের ঘর-সংসারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের গ্রামজীবন চিত্রিত হয়েছে। দেবনাথ বাবু কলকাতা থেকে আসছেন। ভবনাথ পালকি পাঠিয়েছে নাগরখোপে। পালকি বেহারাদের চুপচাপ যাওয়া আসা চলবে না। গলা ছেড়ে চেঁচাতে হবে। হকুম দিয়েছেন ভবনাথ বাবু। এই বড় দাদা আমাদের চির চেনা। বাবা অন্তে একান্নবর্তী পরিবারের বড় কর্তা। পাড়াপড়শি, জ্ঞাতি, আত্মীয়-কুটুম্ব করো সাথে দলাদলি নেই। একমাত্র ভবনাথ বাবুর জ্যাঠা মিথ্যাবাদী, ফেরেব্বাজ। তার সঙ্গেই বিবাদ। তার নেতৃত্বে শরিকেরা পৈতৃক কিছু খামার জমি নিয়ে ফ্যাঁকড়া তুলে একের পর এক মামলা দিয়ে নাস্তানাবুদ করে চলেছে। এই অতি পরিচিত জ্যাঠা আমাদের সব গ্রামে আছে। এরা পরের ভাল দেখতে পেলে গা জ্বলে যায়। প্রতিদিন সূর্য ওঠার মতনই আমরা তাদের দেখে চলেছি। সেই সব গ্রাম, সেই সব মানুষ আজও রয়েছে। বদলায়নি একটুও। অবিকল একই রকম।

ভবনাথ বাবুর ছোট ভাই দেবনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। বড়দাদার ইচ্ছে ভাইকে উকিল বানাবে। তাহলে সাধ মিটিয়ে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করতে পারবে। কিন্তু তা হল না। হীরালাল সম্পর্কে দেবনাথের জ্ঞাতিভাই। সে কলকাতা থেকে সোনাখড়ি এসে জোর করে নিয়ে গিয়ে তার শাশুড়ির জমিদারী এস্টেটের সেরেস্তাদারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। ভবনাথ ভাইকে উকিল করতে না পেরেও কোনো দুঃখ নেই। পনেরো বছরের ভাইকে ন'বছরের মেয়ের

সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। নাম তরঙ্গিনী। স্ত্রী বাড়িতে থাকে। ইতিমধ্যে এক মেয়ে হয়েছে। প্রবাস জীবন থেকে ফিরে এলে দেবনাথকে স্ত্রী বলেছে–

> ''একলা পড়ে থাকো – বাসা করো না কেন কলকাতায়। আমি রেঁধে বেড়ে দিতে পারব, বিমিরও যত্ন হবে।''[১]

তরঙ্গিনীর স্বামী দেবনাথ এই কথা বড়দাকে জানিয়ে দিল। ভবনাথ এই সব নিয়ে ধমক দিল স্ত্রী উমাসুন্দরীকে। শুরু হল দ্বন্দ্ব-মধুর সংঘাত। দেবনাথ বারো মাস বিদেশে পড়ে থাকেন। কয়েকটা দিনের জন্য বাড়ি এসেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে খোশামুদির কথা বলবে তা নয় স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। বিপাকে পড়ে বৌদি উমাসুন্দরীর দারস্থ হতে হল। উমাসুন্দরী রাগ ঝেড়ে দিলেন একেবারে –

> ''আমি কিছু জানিনে ভাই। কর্তার কাছে লাগানি ভাঙানি করতে গিয়েছিলে যেমন। এক বিছানায় শুয়ে মেয়ে মানুষে অমন কত কি বলে থাকে। আমরাও বলেছি। ভাইয়ের কাছে পুটপুট করে সমস্ত বলতে হবে, এমন কখনো শুনিনি। বলার ছিল ত আমায় বলতে পারতে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েছিলে যেমন - হাত ধরে না হয় তো পা জড়িয়ে ধরোগে যাও। আমি জানিনে।''[২]

এমনি করে কাহনীর গতি নদীর মত বয়ে চলেছে। কোথাও বাঁক, তীর ভাঙা ঢেউ, উথাল পাতাল উচ্ছ্বাস, শাঁ শাঁ গর্জন। সেই গ্রামেরই টুকরো টুকরো ছবি স্থান পেয়েছে উপন্যাসে।

'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' উপন্যাসের ভিত্তি সোনাখড়ি গ্রাম এবং তার চারপাশ এলাকা। সোনাখড়ি গ্রামটির পাশে বিল। গ্রামে কায়স্থ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রাধান্য। গ্রামে আছে পূববাড়ী, আছে নতুন বাড়ী, কানাপুকুর, গুরুর পাঠশালা। গ্রাম বাংলার এহেন বিষয় নেই যা এই উপন্যাসে ধরা পড়েনি। বাঙালী সংস্কৃতির টুকরো টুকরো উপকরণ দিযে এ গ্রন্থখানি রচিত। বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। সেই ছবিও দেখতে পাই উপন্যাসে। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি, গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক জীবন, চিরায়ত সংস্কৃতি, দলাদলি সবই রূপায়িত হয়েছে ভবনাথ ও দেবনাথদের পরিবারকে কেন্দ্র করে। লেখক মাস ধরে ধরে বর্ণনা দিয়েছেন। বৈশাখ মাসের বর্ণনাই পাই –

> ''উঠোনে তুলসী গাছ - মাথার উপর ঝারি টাঙানো। ছেঁদা কলসি থেকে কুটো বেয়ে অবিরত জল ঝরছে। সারা বৈশাখ জুড়ে তুলসীঠাকুর দিবারাত্রি ঝারির জলে স্নান করেন।''[৩]

গ্রামীণ সংস্কৃতির এই ছবি আজও অম্লান। এই বৈশাখের শেষদিকে দত্ত বাড়িতে এক কান্ড –

> ''একদিন হুলস্থূল কাণ্ড। শয়তানি সেধে গেছে কারা। সকালবেলা বাবলাডালের একটা দাঁতন ভাঙবেন বলে দেবনাথ দক্ষিণের দোর খুলে বেরিয়েছেন। সামনে দাওয়ার ওপর ঠাকুর-প্রতিমা। সদ্য-গড়া প্রতিমা রাতের অন্ধকারে চুপিসারে রেখে গেছে।''[৪]

এই নিয়ে শুরু হল দত্তবাড়িতে হৈ-চৈ। প্রতিমা রেখে গেছে, ফেলে দেওয়া তো চলে না। পূববাড়িতে ঠাকুর দেওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়ল। দশভূজা দুর্গার আরাধনার ব্যবস্থা শুরু হয়। পূজা হবে আর থিয়েটার হবে না, গ্রাম বাংলায় তাই কখনো হয় ? তার প্রারম্ভিক কথা-বার্তা চলতে থাকে।

গ্রাম-বাংলায় আমের মরসুম এলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধূম পড়ে। কাঁচা আম লাঠি দিয়ে কিংবা ঢিল ছুঁড়ে পেড়ে নুন লঙ্কা দিয়ে খাওয়া, ঝড়ের সময় পাকা আমের প্রত্যাশায় গাছের তলায় ঘুরে বেড়ানো বা ভোর রাত থেকে উঠে আম কুড়তে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। সারাদিন আম পড়ছে। গাছের তলা ছাড়তে চায়না ছোটরা। দেবনাথের ছেলে কমল ছোট্ট মানুষ। বেশি ছোটাছুটি করতে পারে না। সে গাছকে খোশামুদি করে বলে –

> ''ও গাছ, লক্ষ্মীসোনা, দাও না ফেলে আমটা। পেকে গেছে, পড়ে তো যাবেই। চারি-দিদি ঘোরাঘুরি করছে, তক্কে তক্কে আছে ওরা – কোন সময় পড়বে, টুক্ করে নিয়ে নেবে। আমি পাবো না।''[৫]

গাছ কানে নেয় না ছোট্ট বালকের কথা। ঝড়ের রাতে লন্ঠন হাতে আম কুড়ানো হত। দল বেঁধে মেয়েরা বসত কাসুন্দি আর আমসত্ত্ব বানাতে। এ-ও যেন এক পরব।

দেবনাথের মেয়ে জামাই অর্থাৎ চঞ্চলা ও সুরেশ অনেক দিন পর এসেছে দত্ত বাড়িতে। জামাই ঠকাতে লেগেছে শালিরা। এ বাড়ির মেয়ে নিমি, বিনো, পুঁটি সকলেই যেন ওস্তাদ এ কাজে। জলখাবারের জন্য পুঁটি সুরেশকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল। নিপাট ভালোমানুষ। সুরেশ সেই পিঁড়িতে বসতে যাবে –

> ''পিঁড়ি অমনি গড় গড় করে চলল। আছাড় খেতে খেতে কোন গতিকে সামলে নিল। 'কোথা যাও' 'পালিয়ে যাচ্ছ কোথা' বলছে ওরা, আর হি-হি-হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ছে সব। বেকুব জামাই পা দিয়ে পিঁড়ে ঢাকা আসনটা সরিয়ে দিয়ে দেখে

> পিঁড়ের নিচে সুপুরি দিয়ে রেখেছে। একবারে বসবার পিঁড়ে থেকেই কারসাজি – আর কত দিকে কি সব কাণ্ড করে রেখেছে, ঠিক কি! অলকা-বউ সদ্য-ভাজা ক'খানা লুচি থালায় এনে দিল, তারই আধখানা ছিঁড়ে সুরেশ আনমনে দাঁতে কাটছে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, কিন্তু এগুতে ভরসায় কুলোচ্ছে না তার।"[৬]

কিংবা রাতে চঞ্চলা শুতে গিয়ে বুঝতে পারে জানলার পাশে কেউ আড়ি পাতছে। জল ঢেলে দেয়। জানতে পারে পিসিমা মুক্তঠাকুরণ। চঞ্চলা বলে –

> "আরে সর্বনাশ, পিসিমা নাকি ? জানলার গোড়ায় পিসিমা দাঁড়িয়ে – কেমন করে বুঝব ? গরমে ঘুম হচ্ছে না বলে মাথায় জল থাবড়াতে এসেছিলাম। মানুষ দেখে ভাবলাম, চোর এসেছে। এঃ পিসিমা, রাতদুপুরে নাইয়ে দিলাম – কেমন করে জানব বলো।"[৭]

পরদিন ভোর হতেই জামাই বেরিয়েছে প্রণাম সারতে। এছাড়া পাড়ার গুরুজনদের প্রণাম করার রীতি। আত্মীয়রা বাড়ি যেতে চাইলে পোষাক-আশাক লুকিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গও উপন্যাসে ধরা পড়েছে।

জ্যৈষ্ঠের শেষে আষাঢ় মাস। গাছ পালা বৃষ্টির জলে স্নান করে স্নিগ্ধ পবিত্র হয়েছে। কৃষ্ণচূড়া ভরে গেছে ফুলে। মাঠ ভরে গেছে কচি ধানের চারায়। কখনো রোদ, কখনও বৃষ্টি। হাততালি দিতে দিতে ছোটরা ছড়া কাটে –

> "রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে,
> শেষাল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে।"[৮]

বর্ষার জলে শুরু হয়েছে মাছ ধরার ধূম। কখনো বা ছিপের সাহায্যে ধরা হয়েছে পুঁটি, ট্যাংরা, কৈ ইত্যাদি। বৃষ্টির কারণ পুঁটি ও কমলকে ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরতে হয়। বৃষ্টি কমাতে তারা ছড়া কাটে–

> "লেবুর পাতার করমচা,
> যা বৃষ্টি ধরে যা।"[৯]

তাই শুনে কেউ আবার বলে –

> "আয় বৃষ্টি হেনে
> ছাগল দেব মেনে –"[১০]

বৃষ্টির ফলে উঠোন জলে ভরে যায়। এমনই বর্ষার দিনগুলির বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

আসাননগর থেকে কোনাকুনি সোনাখড়ি বিল পারে মনোহরপুর। এখানেই রাখাল এর বাড়ি। এখানকার রথের মেলার খুব নামডাক। এ সম্পর্কে লেখকের কথা –

> "পরিত্যক্ত ভাঙা দালানকোঠা আছেও দু-চারটে। গ্রাম জুড়ে এখন কেবল বেতবন বাঁশঝাড় কসাড় জঙ্গল আর মজা-পুকুর। বসতি যৎসামান্য। ব্রাহ্মণ ও বারুজীবী আছে কয়েকঘর, বাকি সব জেলে। আর আছে তিনটে নাম -সরখেল বাড়ি, সরকার-বাড়ি, মুস্তাফি-বাড়ি – জঙ্গলে ঢাকা ইটের স্তূপ, সাপ আর বুনোশুয়োরের আস্তানা। লোকে তবু সম্ভ্রম করে তিন বাড়ির কথা বলে থাকে।"[১১]

রথ ভেঙে গেলেও গ্রামের গরীব মানুষেরা চাঁদা তুলে রথ-টানা চালু করেছে। রথ ভাল না হলেও মেলার জাঁক জমক বেড়েইছে বই কমেনি। সেই রথের মেলায় দোকানপাট, নগরকীর্তন, রকমারি খেলার জিনিস প্রভৃতির প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে।

দেখতে দেখতে পূজা এসে যায়। দেবনাথ কলকাতা থেকে পূজার বাজার করে ফিরে এসেছে। মেয়েরা ঢেঁকিশালে চিঁড়ে কুটছে। ছেলেরা ভিড় জমিয়েছে নতুন মন্ডপে। পূববাড়ির পূজা হলেও থিয়েটার পুরো গ্রামের। কলকাতা থেকে প্লেয়ার এসেছে দুটো। মহালয়ার পরের দিন তারা এসেছে। সকলের সঙ্গে রিহার্সাল করে বাজিয়ে দেখছে। রিহার্সাল দেখতেই বৈঠকখানা প্রায় ভরে গেছে। অন্যদিকে সন্ধ্যে হতে না হতেই আলোর রোশনাই চারিদিকে –

> ''প্রতিমার দু-পাশে বাতিদানে চারটে করে বাতি, মাথার ওপর কাঁচের হাঁড়িতে বাতি জ্বলছে। হ্যাঙ্গি লন্ঠন ও হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে এখানে ওখানে। কারবাইডের আলো। আর আছে সরার আলো-কলার তেউড়ের মাথায় সরা বসিয়ে তুষে কেরোসিনে ধরিয়ে দিয়েছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে। দিনমান কোথায় লাগে। আরতির সময় চার চারটে ঢাকে তোলপাড়। মানুষজন ভেঙে এসেছে। ঢাক থামলে ঢোল আর মিষ্টি মধুর সানাই। কাঁসর বাজছে ঢং ঢঙা-ঢং। ধূপের ধোঁয়ায় মন্ডপ আচ্ছন্ন। একহাতে পুরুত পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাচ্ছেন। অন্যহাতে ঘন্টা নাড়ছেন –''[১২]

সপ্তমীতে সন্ধ্যা থেকেই লোক জমতে শুরু করে। পুরুত মশাইয়ের আরতির পর যাত্রা শুরু হয়। লোকজনের ঠাসাঠাসি। কেউ বসতে পায় না বলে সাপ সাপ করে চেঁচিয়ে ওঠে। লোকজন আতঙ্কে উঠে পড়ল। সেই সুযোগে জায়গা পেয়ে বসে পড়ল কেউ কেউ। সপ্তমী,

অষ্টমী আর নবমী তিনদিন হৈ হৈ করে কেটে গেল। দশমীর ভোরে আহ্লাদ বৈরাগী গান ধরেছে –

''মা তোরে আর পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারুর কথা শুনবো না।
আমরা মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না।''[১৩]

মা চলে গেলে বাড়িঘর আস্তে আস্তে খালি হতে লাগল। আত্মীয় পরিজন সকলে চলে গেল।

চঞ্চলা পূজোতে আসেনি। শ্বশুর বাড়ি আসতে দেয়নি দেবনাথের দিদি মুক্তঠাকুরণকেও। দশমীর প্রণাম করতে গিয়ে দেবনাথ দাদার কাছে জানতে পারল চঞ্চলা আর নেই। হাউ মাউ করে কাঁদছে ভবনাথ। লেখকের কথায় –

> ''জ্বর হয়েছে বউয়ের – অন্নপথ্য করেই সুরেশের সঙ্গে চলে পাবে-ঠিক ষষ্ঠীর দিনে হয় কি না হয়, তবে যাবে নিশ্চয় পূজোর ভেতরে - এই রকম খবর ছিল। সেই জ্বর সান্নিপাতিক বিকারে দাঁড়াল; বাপের বড় আহ্লাদী মেয়ে শ্বশুরবাড়ির সোহাগিনী বউ বারো দিনের দিন সকলকে কাঁদিয়ে চোখ বুজেছে।''[১৪]

চঞ্চলার মৃত্যুর পর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। বাড়িতে পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনো মাঝে মাঝে কাঁদে চঞ্চলার মা তরঙ্গিনী। মেয়েকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। সেই থেকে দেবনাথও পূজোর সময় আর বাড়ি আসেন না। যদিও নমো নমো করে তিনবছর পূজা সারতে হয়েছিল।

তিরিশের আশ্বিন মাস রাখিবন্ধন ও অরন্ধন। নতুন এই পরবে সকলে মেতে ওঠে। দেশ দু-টুকরো হওয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ মায়ের দুঃখ মোচনের অনুষ্ঠান রাখিবন্ধন। আসলে সকলেই স্বদেশী আন্দোলনে কমবেশি অংশ নিয়েছে। চারিদিক বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত। সঙ্গে স্বদেশী গান –

''মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।''[১৫]

অথবা

''ভেঙে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী ।''[১৬]

চারিদিকে সভা-সমিতি। বঙ্গমাতাকে শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য এদের আপ্রাণ চেষ্টার কথা উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে।

বাদা অঞ্চল, নোনা জল, ডুমুর, গোলপাতা, কেউড়া গাছ, গোকুলগঞ্জ, তালডাঙ্গা, গাঁড়াপোতা সর্বত্রই গ্রামের সেইসব মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জীবন-জীবিকার তাগিদে তারা পাড়ি জমায়। অম্বিকা দত্তও পাঠশালায় সময় কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। শীতে ছাতা পুঁটলি বগলে নিয়ে রওনা দেয় অম্বিকা দত্ত –

> ''বয়স হয়েছে, বাদা অঞ্চলে পড়ে পড়ে নোনাজল খাবার মোটেই আর ইচ্ছা ছিল না। গাঁয়ে থেকে বউ ছেলে পুলে নিয়ে সংসার ধর্ম করবেন ভেবেছিলেন। সোনাখড়ি পাঠশালার কাজটাও জুটে গিয়েছিল। দিব্যি চলছিল - নচ্ছার ইন্সপেক্টর এসে সমস্ত গড়বড় করে দিল। ... ছাতা ও চটি-জোড়া এর মধ্যে তালিতুলি দিয়ে ঠিক করে নিয়েছেন। পাঁজিতে ভাল যাত্রা দেখে নিয়ে, দুগ্গা-দুগ্গা বলে পরে রাতে অম্বিকা ঘরে থেকে যাত্রা করে বেরুলেন।''[১৭]

সবার আগে পৌঁছে গেলেন বাদাবনের শহর কুমিরমারি। উদ্দেশ্য পিঁপড়েখালিতে গিয়ে আবার গুরুমশাইয়ের কাজ করবেন। কিন্তু হল না। পিঁপড়েখালিতে নতুন গুরুমশায় এসেছেন ম্যাট্রিক পাশ করে। নাম কিরণ। বাধ্য হয়ে অম্বিকা দত্তকে পা বাড়াতে হল নিরাপদ জায়গা গোকুলগঞ্জের দিকে।

দেবনাথের ছেলে কমল। বাড়ির মধ্যে সবথেকে ছোট। উপন্যাসের শেষের দিকে তার কথাই বেশি বলা হয়েছে। মায়ের কোলে ঘুমিয়ে থাকা। প্রথম পাঠশালা যাওয়া। দিদিদের সঙ্গে আম কুড়ানো, খেলতে যাওয়া এসবকিছুর বর্ণনা করেছেন লেখক মনোজ বসু। প্রকৃতি যেন কমলের প্রাণের দোসর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' গল্পের বলাই এর মত কমলের বন্ধুও একটি গাছ। লেখকের বর্ণনায় –

> ''কমলের খুব ভাব জমে গেছে মানুষ নয়, পশুপাখি নয় - একটা গাছের সঙ্গে। বেঁটে খাটো যব ডুমুর গাছ খসখসে পাতা এবড়ো-খেবড়ো গায়ে বুঝি কুষ্ঠরোগ ধরেছে। হাটখোলার আমবাগানে সেবার কোথাকার এক কুষ্ঠরোগী ফেলে গিয়েছিল, নড়তে চড়তে পারে না। ... জল্লাদ চোরাগোপ্তা তাকে দত্তদের ভাঙা চন্ডীমন্ডপে এনে তুলেছিল, তারপরে অবশ্য জানাজানি হয়ে গেল। কমল সেই কুষ্ঠরোগী দেখেছিল। বক্সির ভুঁয়ের ডুমুর গাছের সর্বাঙ্গেও ডুমো-ডুমো ঠিক সেই রকম।''[১৮]

যবডুমুর গাছের সঙ্গে কমলের বন্ধুত্ব। এরা যেতে পারে না তো কমলই এদের কাছে আসে। কখনও ছুটতে ছুটতে এমনই দূরে চলে যায়, যেখানে একাকিত্বের কথা ভেবে ঘর মুখো হয়।

গ্রামের মেয়েদের বড়ি দেওয়া, পিঠে-পুলি তৈরী এসবও যেন একটা পরব। বড়ি দেওয়ার ব্যাপারে অনেক তুকতাক রয়েছে। নয়তো বড়ি দেওয়ার পরই শুরু হবে বৃষ্টি। ভবনাথের ছেলে কৃষ্ণময়ের স্ত্রী অলকা বউ এব্যাপারে অপয়া। সে ব্যাপারে পরখ হয়ে গেছে –

> ''রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে সারাটা দিন, দেখেশুনে বউকে দিয়ে ডাল ভেজানো হল। পরের দিন আকাশ মুখ পুড়িয়ে থাকল, বড়ি শুকোল না। সন্ধ্যেবেলা ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল, তার পরের দিন বৃষ্টি দস্তুরমতো। ফাল্গুনে এই কাণ্ড।''[১৯]

তাই বড়ি দেওয়ার আগে অনেক ভেবেচিন্তে ডালে জল দেওয়া, ডাল বাটা হয় নয়তো বড়ি নষ্ট হবে। বাঙালির পিঠে তৈরীর ব্যাপারেও তাই।

> ''প্রথম পিঠে ব্রহ্মার নামে উনুনের আগুনে দিলেন। পরের পিঠেখানা আলাদা করে রাখা হল, বাঁশবাগানে রেখে আসবেন, শেয়ালের ভোগে যাবে। তারপর ছেলেপুলে ও অনান্য সকলের। শুধু কমল-পুঁটি নয়, অনেকে পাড়া থেকে এসেছে উনুনের ধারে ভিড় করেছে। আগুন পোয়ানো আর সেই সঙ্গে পিঠে খাওয়া —''[২০]

এরকম গ্রাম-বাংলা হাজারো টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন মনোজ বসু তাঁর 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' উপন্যাসে।

জীবনের ঘাটে ঘাটে বাঁকে বাঁকে যা তিনি দেখেছেন সেই সব স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে মনোজ বসু নির্মাণ করেছেন তাঁর নিজস্ব সাহিত্য জগত। অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি একপাও ফেলেননি। গ্রাম বাংলার এহেন বিষয় নেই যা আলোচ্য 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' উপন্যাসে ধরা পড়েনি। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন —

> "বিশ্বসমর পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গের গ্রামের সম্পন্ন সুখী অতীতের এই আলেখ্য নসট্যালজিয়াকে প্রশ্রয় দেয় মাত্র, তা পাঠককে কোন মহৎ জীবনবোধে উন্নীত করে না।"[২১]

কাহিনী এখানে গৌণ হওয়ায়, চরিত্রগুলির বিকাশ ঘটেনি। একটা কথা বলতে গিয়ে আরও যত কথা মনে পড়েছে, মূল কাহিনী থামিয়ে সেই দিকেই পল্লব বিস্তার করেছেন লেখক। শুরুতে ভবনাথ ও দেবনাথ এর কাহিনী আমাদের আকর্ষণ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঘটনা

বর্ণনায় তারা সেভাবে অংশ নিতে পারেনি। ঘটনায় তারা থেকেছে গৌণ। বরং বিনি, চঞ্চলা, পুঁটি, কমল এদের কথাই বলতে বলতে কাহিনী এগিয়ে গেছে। কমল চরিত্রটির প্রকৃতি প্রীতিতে যেন লেখক নিজেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। উমাসুন্দরী ও তরঙ্গিনী চরিত্রদুটি বাঙালি গৃহবধূর পরিচয়বাহী। একটি বড় সংসারের সমস্ত দায়ভার তারা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। সুখ-দুঃখে ভরা তাদের জীবন। সংসারের বাইরে তাদের জীবন যেন বড়ই বেমানান।

'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' উপন্যাস বড় কিন্তু কাহিনী ছোট। মনোজ বসু গ্রামে জন্মানোর সূত্রে গ্রাম-বাংলার হাজারো ঘটনা দেখেছেন, শুনেছেন। পরে কলকাতায় চলে এলেও তাঁর মন ও মানস পড়ে ছিল শৈশবে বিচরণ করা জন্মভূমিতে এবং তার আশেপাশে। পরিণত বয়সে সেইসব ঘটনাক্রমই স্থান পেয়েছে উপন্যাসে। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লেখা কালজয়ী সৃষ্টি মুছে যাবে না মন থেকে। অমর সৃষ্টির পেছনে অর্থাৎ খ্যাতি-যশের আড়ালে 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' চাপা পড়ে গেলেও এতটুকুও ম্লান হয়নি তাদের জীবনযাত্রার ছবি। মন থেকে তারা হারিয়ে যায়নি। এই মানুষজন আমাদের অতি পরিচিত, চেনাজানা। সেই মানুষজন হারিয়ে যাওয়ার অর্থই আমাদের আত্মীয় পরিজন হারিয়ে যাওয়ার সামিল। 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' হারায় না, মনের মনিকোঠায় তাঁদের অবস্থান। উপন্যাসের নামই যেন সেই কথার পরিচয়বাহী।

থিয়েটার

রোমান্স-ধর্মী উপন্যাস 'থিয়েটার' (১৯৭৮ খ্রী:) এর মূল উপজীব্য আজকালকার রঙ্গমঞ্চের জগৎ। পূর্বের সঙ্গে বর্তমান রঙ্গমঞ্চের আদর্শগত এবং কালচারগত পার্থক্যই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে।

রুবি থিয়েটারের মালিক মনিসুন্দর চৌধুরী পূর্বে স্বদেশী করতেন। বোমা রিভালভার নিয়ে ছিল তার কাজ-কারবার। বক্তৃতায় আগুন ছুটত। এই কারণে জেলেও আটক থাকতে হয়েছিল। শেষকালে এমন এক মানুষের পরিণাম হল নটী নিয়ে কাজ করা। লোকে যা তা বলতে লাগল। মণিসুন্দর হাসতেন আর বলতেন –

"বুঝলে না কবিরাজ অনুপানে অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে - মধু অভাবে গুড়। আমাদেরও সেই জিনিস।"[১]

তাঁর সহকর্মী তারক বাড়ুজ্যে স্বদেশী করত। এখন সে মাংসের দোকান করেছে। ইংরেজের বদলে পাঁঠা খাসির ঘাড়ে কোপ বসায়।

রুবি থিয়েটারে অভিনীত বেশিরভাগ নাটকই পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক। দর্শকেরা নাটকীয় চরিত্রগুলির সঙ্গে স্বদেশী-ওয়ালাদের মিল খোঁজে।

"একজন বলে, নাটকের অর্জুন আসলে কানাই দত্ত, অন্যে বলে, না বাঘা যতীন।"[২]

আসলে প্রতিটি নাটকের মধ্যে স্বদেশীকতার মিল খোঁজাই ছিল দর্শকদের প্রধান উদ্দেশ্য।

রুবি থিয়েটারে অভিনীত পৌরাণিক নাটক 'বন্দীশালা'তে পতিতা রমনী তারামণি পুলোমা সাজত। পুলোমা চরিত্রটি সম্পূর্ণ কল্পনায় গড়া দেবকীর চাকরাণী। স্বদেশী যাত্রার অনেক গানই মণিসুন্দরের বন্ধুলোক গণেন গুপ্তর। রিহার্শালে কোনো দিন গুপ্ত মহাশয়কে দেখা যায়নি- থিয়েটার বাড়িতেও তিনি কখনো পা ছোঁয়াতেন না। ফলে অধিকারীর জেল হলেও গণেন গুপ্ত ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অধিকারী বলেন –

''আমি গেলে নতুন অধিকারী মিলবে, গুপ্তমশায় জেলে গিয়ে বসে থাকলে আগুনে আর জোর থাকে না।''[৩]

তারামণির বস্তিবাড়িতে গানের রিহার্শাল হত। তার অদ্ভুত গানের ক্ষমতা। লোকে বিমোহিত হয়ে পড়েন। স্বদেশী নাটক বন্দীশালা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী'তে তারামণি জিজাবাঈ সেজে বলেছে –

"দেশের মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে আমি যে গর্ভধারিনী মা, আমার মুণ্ডুপাতে দ্বিধা কোরনা বৎস শিবাজী।"[৪]

'রাজপুত-বীর' নাটকেও তিনি যশোবন্ত মহিষী সেজে বলত -

"আমার স্বামী নও - তুমি প্রবঞ্চক। আমার স্বামী শত্রুর দিকে পিঠ ফেরায় না - বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, সম্মুখ রণে প্রাণ দেয়।"[৫]

অভিযোগ আসত রাজদ্রোহী বলে। পুলিশের কাছে মণিসুন্দরকে বলতে হয়েছে তারামণি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক করে মাত্র। রুবি থিয়েটারের মালিক মণিসুন্দরকে বহুবার জরিমানা দিতে হয়েছে। তাতেও লোকসান হয়নি। রুবি থিয়েটারে নতুন বই হচ্ছে শোনামাত্র বাজারে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। তাতে আবার মুকুন্দ দাসের স্বদেশীযাত্রা। রাজা প্রতাপাদিত্যের মিথ্যে কাহিনী নিয়ে লেখা 'বঙ্গকেশরী'। চারিদিকে 'বঙ্গকেশরী'র জয়জয়কার। একদিন তারামণি থিয়েটারে উপস্থিত না হয়ে পূর্বের ব্যবসায় মেতেছিল। না আসার জন্য মণিসুন্দর তারামণির কাছ থেকে একশো টাকা জরিমানা নিলেও আড়ালে গিয়ে তাকে দুশো টাকা ফেরত দিয়েছে। তারামণি টাকা ডবল এর কারণ জানতে চাইলে মণিসুন্দর বলেন –

> "ফাইনের টাকা ফেরত একশো টাকা। আর একশো টাকা তোর অভিনয়ের শিরোপা। স্টেজের উপর অভিনয় করিস, বাড়ির অভিনয় তার অনেক বেশি উতরেছে।"[৬]

আসলে তারামণি সেদিন থিয়েটারে না এসে এক স্বদেশী ছেলেকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল। ইংরেজ বিদায় হয়েছে। তারামণি বুড়ি হয়েছে। মণিসুন্দর আর নেই। তার ছেলে সত্যসুন্দর থিয়েটারের নাম বদলে করেছে 'মণিমঞ্চ'। সত্যসুন্দরেরও বয়স হয়েছে বেশ।

বিনোদ সমাদ্দার সেকালে 'শঙ্খধ্বনি' নামে পত্রিকা চালাতেন। পত্রিকাটি ছিল স্বদেশী। ফলে তাকে প্রায়ই জেলে যেতে হত। কিন্তু স্বাধীনতার পরে 'শঙ্খধ্বনি' উঠে গেল। বিনোদ সমাদ্দার এখন উদ্বাস্তু। কিন্তু লেখার নেশা ছাড়তে পারলেন না। সময়োপযোগী করে নটনটীদের কেচ্ছাকাহিনী নিয়ে লিখলেন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'উকিঝুঁকি'। হেমন্ত কর 'চার্বাক' ছদ্মনামে ঐ পত্রিকায় লিখতেন। বিনোদ সমাদ্দার 'প্রতারক' নামে একটি নাটক লিখতে অনুরোধ করেন চার্বাককে। 'মণিমঞ্চের' সঙ্গে হেমন্তর যোগাযোগ ঘটল নতুন নাটক নিয়ে। এদের সঙ্গে যুক্ত হল কমেডিয়ান অভিনেতা সাধন মজুমদার।

নাট্যকার জগন্ময় দাস-এর 'জয় পরাজয়' নাটকে রজত দত্ত অভিনয় করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। হঠাৎ বুকের ব্যথায় তিনি মারা যান। এতবড় আর্টিষ্ট কিন্তু মৃত্যুকালে পাঁচটা টাকাও ছিল না তাঁর কাছে। এত নামযশ, ভক্তরা বলত নাট্যজগতের শাহানশা। টাকার জন্য

নয়, অভিনয় করত মন দিয়ে। অন্যদিকে শঙ্কর ঘোষাল একেবারে বিপরীত। আগে টাকা তারপর পার্ট। টাকা না পেলে কিছুতেই স্টেজে নামবেন না। আর প্রেমাঞ্জন বড় অভিনেতা। বড় পার্ট ছাড়া সে অভিনয় করবে না। এরকম পরিস্থিতিতে সত্যসুন্দরের ভাগ্নে অমিয়শঙ্কর বলেছে ঘোষাল মশায়কে আর প্রেমাঞ্জনকে বাদ দিয়ে নাটক করবে। যথারীতি বিজ্ঞাপন অনুযায়ী অভিনেতা অভিনেত্রীর সন্ধান এলেও জুতসই কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

হেমন্ত বাবু থিয়েটার দেখছেন। অমিয়শঙ্কর এসে তাঁর পাশের সিটে বসলেন। উভয়ের মধ্যে কথা হয়েছে প্রেমাঞ্জনকে নিয়ে। জয়ন্তি মিত্তির বিশ-পঁচিশ বার এই নাটকটি দেখেছেন। আসলে জয়ন্তী নাটক দেখেন না। দেখেন প্রেমাঞ্জনকে। হেমন্তবাবু জানতে পারেন তাঁর ছাত্র প্রেমাঞ্জনের স্ত্রী রেখা পাগল। এই সময় অমিয় বাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন -

> "অথচ প্রেমের বিয়ে - তাই নিয়ে কত রকম কাণ্ড-বাণ্ড। পরের নাটক লিখুন না প্রেমাঞ্জনকে নিয়ে - আমি মালমসলা দিতে পারি। আমি কেন - বিনুদার সঙ্গে আপনার ভাব, তিনি নাড়িনক্ষত্র জানেন জয়ন্তী প্রেমাঞ্জন দুটোরই। দেখুন, আপনার ঐ ছাত্র আস্ত কাউড্রেল একটি। নাটক লিখুন, আমি অভিনয় করাব, খুব জমবে।"[৭]

রজত দত্তের মৃত্যুর পর ছেলে প্রণব থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। সে হেমন্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করেছে যাতে তার নাটকের পাঠের অংশ বাড়তে পারে। মোট তেরোখানা নাটকে তেরো গণ্ডা কথাও সে বলেনি। থিয়েটার দেখতে দেখতে হঠাৎ কিসের আওয়াজে সবাই চমকে ওঠে। তারামণি নাটক দেখতে দেখতে পড়ে যায়। ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তোলার পর প্রণব আর চন্দ্রিমা গাড়ি করে তারামণিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। সত্তর বছরের বুড়ি একদিন অভিনয়ের মাধ্যমে মাতিয়েছিল মানুষকে। প্রণব ও চন্দ্রিমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে - নূরজাহান, রিজিয়া, লক্ষ্মীবাঈ, আয়েসা, ইন্দিরা, মীরাবাঈ, পদ্মিনী, শৈবালিনী-র ছবি দেখিয়ে। যে চরিত্রগুলিতে সে একসময় অভিনয় করেছিল।

প্রেমাঞ্জনকে সত্যসুন্দরের কাছে নিয়ে এসেছিল বিনোদ। থিয়েটারে নেমেই সকলের মন জয় করেছিল। সরোজিনী নামে এক উদ্বাস্তু মেয়ে থিয়েটারে যোগ দিয়েছে, প্রেমাঞ্জনের সঙ্গে অভিনয় করার লোভে। থিয়েটারী নাম সরোজা। দেখতে দেখতে শহরময় সরোজা - প্রেমাঞ্জনের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বিবাহিত প্রেমাঞ্জনের কথামত সরোজ মণিমঞ্চ ছেড়েছে। তাকে লুভে নিয়েছে জুবিলি থিয়েটার। প্রেমাঞ্জন স্ত্রী রেখার সামনে সরোজার সঙ্গে প্রেমের

অভিনয় করতে পারবে না, তাই এই ব্যবস্থা। এদিকে একা হয়ে দুজনের কেউ থিয়েটারে সেভাবে দাঁড়াতে পারছে না।

সোমবার যথাসময়ে হেমন্তবাবু পাণ্ডুলিপি নিয়ে মণিমঞ্চে হাজির হয়েছেন। সত্যসুন্দর হেমন্তবাবুকে নাচের সিচুয়েশান বানাতে বলেছে। নাচ ছাড়া বর্তমান সময়ে থিয়েটার মার খাচ্ছে। হেমন্তবাবুর নাটকের নাম ছিল 'প্রতারক'। তা পরিবর্তিত হয়েছে 'মানুষের কান্না' নামে। ভাগ্নে অমিয়শঙ্কর থিয়েটার চালানোর ব্যাপারে মহাগুণী। কর্তৃপক্ষের কথামত নাটকের নানা পরিবর্তন ঘটেছে। কান্নাকে বদলাতে হয়েছে হাসিতে। বিয়োগান্ত নাটককে পরিণত করা হয়েছে মিলনান্ত নাটকে। নামকরণ হয়েছে 'উর্বশীর হাসি'। নাটকে প্রেমাঞ্জনের পার্ট কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রণবের ভূমিকা। এসেছে হাস্যরস; এসেছে প্রতি অঙ্কে নাচ। এসমস্তই প্রেমাঞ্জনকে সরানোর এক চক্রান্ত। কিন্তু বিনোদ নিরীহ কণ্ঠে বলেন —

> "পেটের ক্ষিধে চেপে প্রজাবর্গ এইসবে মশগুল হয়ে থাকবে, 'মিছিল নগরী' একেবারে মৃতবৎ শীতল - রূপকথার সেই রাক্ষসে খাওয়া পুরীর মতন।"[৮]

হ্যাণ্ডবিলে লেখা হয়েছে —

> "নবীন নাট্যকার হেমন্ত করের যুগান্তকারী নাট্য নিবেদন – 'উর্বশীর হাসি' (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)"[৯]

নাটকের অনেক পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন এক নাটক হয়েছে। নাট্যকার হেমন্ত কর এই নাটকের নাট্যকার বলে পরিচিত হতে রাজি হননি। সত্যসুন্দরও অমিয়কে জানিয়েছে —

> ''বাবার নাম জড়িয়ে মনিমঞ্চ হয়েছে। মঞ্চ নিয়ে তিনি জীবনপাত করে গেছেন। মঞ্চকে তিনি মন্দির ভাবতেন। ঐ নাম রয়ে গেলে স্বর্গ থেকে বাবা অভিশাপ দেবেন।''[১০]

'থিয়েটার' উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে কোন চরিত্রের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী মণিসুন্দর বা সত্যসুন্দর কিংবা পরিচালক অমিয় শঙ্কর -এর ব্যক্তি জীবনের কথা এখানে নেই। অভিনেতাদের কথাও যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাও অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। তারামণি চরিত্রটি উপন্যাসের প্রথম অংশে যতটা জীবন্ত পরবর্তীকালে ততটাই অচল। প্রেমাঞ্জন এবং রেখায় প্রেমকাহিনী অতীত চারণারূপে নিতান্তই বেমানান। চরিত্রগুলি

খণ্ড খণ্ড আলেখ্য। কোন চরিত্রেরই পূর্ণাঙ্গরূপ উপন্যাসে দেখতে পাইনা। নাট্যকার বিনোদ এবং হেমন্তকেও পারিপার্শ্বিকতার চাপে পিষ্ট আদর্শবাদী চরিত্র বলেই মনে হয়েছে।

উপন্যাসে লেখক বাংলাদেশের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সমালোচনা করেছেন। এই সমস্ত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ কীভাবে তাদের পূর্বতন ঐতিহ্য হারিয়ে ধীরে ধীরে অর্থ উপার্জনের দিকে ঝুঁকেছে এবং আদর্শ বিসর্জন দিচ্ছে তা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। সমাজের রুচির উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা না করে এই সমস্ত নাট্যশালা সমাজের অধঃপতনের কারণ হচ্ছে। প্রভাবশালী নাট্যকারেরা পরিণত হয়েছে হাতের পুতুলে। পরিচালকদের কথামত নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্য-সাহিত্য দীন হয়ে পড়েছে। বিপন্ন হয়েছে নাট্য-প্রতিভা। সবই ঘটেছে থিয়েটারকে কেন্দ্র করে। কোন চরিত্রের প্রভাব এতে নেই। তাই উপন্যাসের নামকরণ 'থিয়েটার' যথাযথ এবং সার্থক।

খেলাঘর

মনোজ বসুর সামাজিক উপন্যাস 'খেলাঘর' (১৯৮৬)। এক বালিকা বধূর আগমনে একটি পরিবার-এর লোকজন কীভাবে তার খেলার সঙ্গী হয়ে উঠেছে তারই পরিচয় পাওয়া যায় 'খেলাঘর' উপন্যাসে।

মাদার ঘোষ সদরের এক দুর্দান্ত উকিল। সহপাঠী কালিদাস দত্তের ছেলের অন্নপ্রাশনে গ্রামে এসেছেন। সঙ্গে মাদার ঘোষের মা রাঙাঠাকুরণ। মহামচ্ছব দত্তবাড়িতে। সেখানে সাত বছরের বালিকা টুনিকে (ভাল নাম নির্মলাবালা দাসী) দেখে ভাল লাগে রাঙাঠাকুরণের। নিজের নাতবউ করার জন্য কালিদাসের বউ তরুবালার কাছে তার পরিচয় জানতে চাইল। টুনি তরুবালার বড়দির মেয়ে। বাড়ি বেতিখোলায়। রাঙাঠাকুরণ সরাসরি গিয়ে টুনির মা সুরবালাকে বলে -

"তোমার টুনিকে বেশ ভাল লাগল। ওকে নাত বউ করে নেব ভাবছি।"[১]

কিন্তু মেয়ের বয়স মাত্র সাত। বিয়ের বয়স হয়নি। তাতে রাঙাঠাকুরণ সুরবালাকে বলে -

> "একটা বছর এখনো নেচে খেলে বেড়াক। আট বছরে গৌরী দান হতে পারবে। হরগৌরীর বিয়ে হল, গৌরীর বয়স তখন আট। মেয়ের বিয়ে ঐ বয়সে দিলে গৌরীদানে মহাপুণ্য।"[২]

রাঙাঠাকুরণ বাড়ি গিয়ে ছেলে মাদার ঘোষকে নাতি নন্দুর জন্য টুনিকে দেখে আসতে বলে। মাদার ঘোষ কোনো মামলা না হারলেও মায়ের কথার বিরুদ্ধে না গিয়ে ক্লাস এইটে পড়া তেরো বছরের ছেলে নন্দুর জন্য পাত্রী দেখতে ভোর ভোর হাজির হয় দত্তবাড়িতে। কালিদাস মাদার ঘোষকে জানায় যে, টুনি বোধহয় এখনো ঘুম থেকে উঠেনি। কিন্তু মাদার ঘোষ হেসে জানায় –

> "খুব উঠেছে। তোমার মতন আলসে নয়, ঠিক আমারই মতন। পাখ-পাখালি ডেকে উঠলে আমরা আর বিছানায় থাকতে পারেনি।"[৩]

টুনি সকালে উঠেই শিশুসুলভ চপলতায় কালবেড়ালির মতন লিচুগাছের মগডালে আশ্রয় নিয়েছে। তাসত্ত্বেও মাদার ঘোষ বলে যান –

> "মাতৃ আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি। শুধু চোখের দেখা দেখে গেলাম, তাড়াতাড়িতে আর বেশি হয় না। বেনিখোলা সদর থেকে দূর বেশি নয় - দুম করে একদিন গিয়ে পড়ব।"[৪]

মাদার ঘোষ কথামত টুনির বাবা পরাশর-এর গ্রাম বেনিখোলায় উপস্থিত হন। পরাশর মাদার ঘোষের পুরনো মক্কেল। পরাশর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। পাঠশালা থেকে টুনিকে নিয়ে আসতে বলে মেজো ছেলেকে। কিন্তু মাদার জানায় যে, টুনি তাদেরই গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরেছে। যাইহোক বিয়ের কথা পাকা করেই মাদার ঘোষ বাড়ি ফেরে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গোধুলিলগ্নে নন্দলাল - নির্মলা বালার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। আইনের রক্ষক মাদার ঘোষ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টুনিকে বাড়ির বউ করে নিয়ে যায়। পথে চাঁদা দিলেন দরাজ হস্তে। গৃহস্থের লৌকিক আচার আচরণের মাধ্যমে কনেকে বরণ করে নেওয়া হয়। কাল রাত্রির কারণে টুনি বউ শাশুড়ির বিছানায়। পহর রাত থাকতে থাকতে জেলেরা এসে গেল মাছ ধরতে। বড় বড় রুই কাতলা ধরে ঢেঁকিশালের পাশে কাঁঠাল গাছ তলায় শব্দ করেই ফেলা হচ্ছে। যাতে বাড়ির সকলেই জেলেদের বাহাদুরি জানতে পারে। ঠিক সেই সময় চুপিসারে এসে শ্বশুরের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে টুনি বউ বলল -

> "রুইমাছ একটা ছাই গাদার মধ্যে। ওদের কিছু বলবেন না বাবা, এমন মাছ দেখে কার না লোভ হয় ? ওদের নেমন্তন্ন হয়নি, কি করবে ?"[৫]

নতুন বউ-এর এহেন কার্যে সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মাদার ঘোষ জেলেদের শাস্তি না দিয়ে নেমন্তন্ন করেছে। রাঙাঠাকুরণ গদগদ হয়ে বলেন -

> ''উঠন্তি মূলো পওনে চেনা যায়। দিদি আমার অন্নপূর্ণা। ওর সংসারে গরীব-দু:খী সকলের জন্য অন্ন থাকবে।''[৬]

বৌ-ভাতের শুরুতে নতুন বউকে দু-এক পাতায় ভাত দিতে হয়। টুনি বউ ভাত দিতে নামল বটে কিন্তু থামল না, চলতেই থাকল। ফুলশয্যার ঘরে ঢুকেও নেমন্তন্নেরা যে পান পাচ্ছিল না, সেদিকে কান খোলা ছিল নতুন বউ-এর। নন্দু ফুলশয্যার ঘরে ঢুকে খিল দিচ্ছিল; এমন সময় বউ এসে কাদার মতন গায়ে লেপটে গেল। টুনি স্বামীকে শুয়ে পড়তে বলে খিল তুলে দিল। এবার শিকারের আগে ওৎপেতে থাকা বেড়ালের মত থাকতে থাকতে জানালার কবাট খুলে ঘটির জল বাইরে ঢেলে দিল। স্বামীকে বলল বাইরে ছুটে গিয়ে চোর ধরোগে। চোর নয়। রাঙাঠাকুরণ গ্রামের সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিজে জানালায় কান পাততে এসেছিল। রাতের অন্ধকারে ভেজা গায়ে রাঙাঠাকুরণকে এনে বসায় নন্দু। আস্তে আস্তে বাড়ির সকলের মন জয় করে নেয় নতুন বউ টুনি।

সদরের বাড়িতে এসে গেছে সকলে। বেতিখোলা থেকে পরাশর চিঠি পাঠিয়েছে মেয়ে-জামাইকে জোড়ে নিয়ে যাবে বলে। মাদার ঘোষ প্রস্তাব নাকচ করে দেন রাঙাঠাকুরণের অসুস্থতার কারণে। পরে একদিন পরাশর টুনির শ্বশুর বাড়িতে নিজেই এসে উপস্থিত। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করলেন না। বললেন-

> "কয়েকটা বছর সবুর করুণ, নাতি আসতে দিন। তখন আর ডাকতে হবে না - সকাল বিকাল আপনি এসে পড়ে নাতির অন্ন খাবো, আমোদ-আহ্লাদ করবো, তাড়ালেও যাবো না।"[৭]

কোর্ট থেকে ফিরে মাদার ঘোষ এখন আর উকিল থাকেন না। নতুন বউকে ইংরেজি শেখান। কখনো আবার নতুন বউ এর সঙ্গে তাস খেলেন। আবারও পরাশর চিঠি লিখেছে মেয়ে জামাইকে পাঠানোর জন্য। এবারও মাদার না বলে দেয়। চিঠি পাঠানোর এক সপ্তাহও কাটেনি। একদিন ভোরবেলা টুনি একাকি বেতিখোলায় হাজির। সঙ্গে কেউ নেই সবে মাত্র

সুরবালা দরজা খুলেছে এমন সময়। সুরবালা স্তম্ভিত। মেয়ের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। বাবা-মা তো চিন্তিত। বিকালবেলা মাদার ঘোষ সাইকেলে করে এসে পরাশর -এর কাছে জানতে চান টুনি এসেছে কিনা ? পরাশর কি হয়েছে জানতে চাইলে মাদার বলেন –

''সামান্য - ঝগড়াঝাটি হয়েছিল - রাতে কাউকে না বলে পালিয়েছে।''[৮]

আসলে ভোরবেলা মাদার ঘোষ নিজেই পৌঁছে দিয়েছিল টুনিকে। এখন নিতে এসেছে। সকল সত্য প্রকাশ হলে পরস্পরের মধ্যে নাটকের অবসান হয়। পরে মাদার ঘোষ জানায় যে, তাদের বাড়ি এখন খেলাঘর পরিণত হয়েছে। টুনি-বউ আসার পর থেকে বাড়ির সকলের কাজেরও মানসিকতা পরিবর্তন হয়েছে। বালিকা বউ-এর খেলার সঙ্গী এখন বাড়ির লোকজন। আর তিনি ওকালতি ছেড়ে দিনরাত খেলায় মেতে উঠেছেন।

পুতুল খেলার বয়সের একটি মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কীভাবে সকলকে বন্ধনের ডোরে বেঁধে ফেলতে পারে তারই পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক মনোজ বসু তাঁর 'খেলাঘর' উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র টুনি অর্থাৎ নির্মলাবালা। রাঙাঠাকুরণ তাকে পাখির সঙ্গে তুলনা করেছে। সাত বছরের দুরন্ত টুনির পাত্র দেখাশোনা হবার পর বারো বছরে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় থেকে বিভিন্ন আচার পালন এমনকি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সমস্ত দিকে কড়া নজরদারি সকলের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। মায়ের অসুস্থতাতেও সে বাপের বাড়ি যেতে রাজি নয়। শ্বশুর শাশুড়ি, রাঙাঠাকুরণ সকলকে নিয়ে তাস খেলে। যে মাদার ঘোষকে সকলে রাগী বলে মনে করত তাকেও টুনির কথায় চলতে হয়। বালিকা বধূ যেন গৃহিনী থেকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণায় পরিণত হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে রাজাঠাকুরণ মাদার ঘোষ, টুনির বাবা পরাশর, টুনির মা সুরবালা প্রধান।

রাঙাঠাকুরণ তার পাখিকে কখনো চোখের আড়াল করতে চায় না, টুনিকে প্রথম দর্শনেই পছন্দ করে নাতবউ করতে চেয়েছে। এই বালিকা বধূকে কখনো চোখের আড়াল হতে দেয়নি। মাদার ঘোষ চরিত্রটিকে খুবই চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। নামকরা উকিল মাদার ঘোষ। টুনি বাড়ির বউ হয়ে আসার পর তার কাজের পরিবর্তন ঘটেছে। টুনিকে ইংরেজী শেখায়, আর তার সঙ্গে তাস খেলে সময় কাটায়। মাদার ঘোষও একমুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে চাননি টুনি বউকে।

টুনির স্বামী নন্দু বিয়ের পর কিছুটা সক্রিয় চরিত্র রূপে ধরা পড়েছে। ফুলশয্যার রাতে ও ছিপ ফেলতে গিয়ে টুনির সঙ্গে তার কথোপকথন বেশ মজাদার। নন্দু ভয় পেত মাদার ঘোষকে বিয়ের আগে। এখন ভয় কেটে গেছে। তাস খেলার সময় সে তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে খেলায় উৎসাহ দেয়। টুনির বাবা পরাশর ও টুনির মা সুরবালা চরিত্র দুটি টুনির দেখাশোনার সময় এবং উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

সদরের নামকরা উকিল মাদার ঘোষ। সে কোনো কেস কখনো হারেনি। বাড়িতে মা রাঙাঠাকুরণ ছাড়া সকলেই মাদার ঘোষকে ভয় পেত। কিন্তু সে কখনো মায়ের কথা ফেতলে পারেনি। তাইতো মায়ের কথা রক্ষার্থে আইনের রক্ষক হয়েও বালিকা টুনিকে বাড়ির বউমা করে এনেছে। বাড়িতে সারাসময় কেস-কাচারি, মক্কেল-দের আনাগোনা চলত। টুনি বউ আসার পর বাড়ির অবস্থার পরিবর্তন হয়। সন্ধ্যার পর টুনিকে ইংরেজি শেখানো, তাস খেলা এই করেই সন্ধ্যা কাটে মাদার ঘোষের। খেলার সঙ্গী টুনিকে বাপের বাড়িতেও পাঠায় না মিথ্যা অজুহাত দিয়ে। মাদার ঘোষ টুনির বাবা-মাকে বলেন –

> ''বলছি কি তবে! আমাদের খেলাঘর। ওকালতি সিকেয় ওঠার গতিক - দিনরাত্তির নানান খেলা খেলছি আমরা।''[৯]

মাদার ঘোষের বাড়ি আইনের নিয়ম কানুন ভুলে আজ খেলাঘরে পরিণত টুনির আগমনে। তাই উপন্যাসের নামকরণ 'খেলাঘর' যথার্থ ও সার্থক।

তথ্যসূত্র

ভুলি নাই

১. ভুলি নাই - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., শ্রাবণ ১৪১৫, পৃ. ৪

২. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৩. তদেব

৪. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৫. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৬. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৭. তদেব

৮. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৯. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১০. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১১. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

১২. ভুলি নাই - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

সৈনিক

১. সৈনিক - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুলাই ১৯৪৫ পৃ. ৭২

২. সৈনিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

৩. সৈনিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৪. সৈনিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৫. সৈনিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

ওগো বধূ সুন্দরী

১. ওগো বধূ সুন্দরী - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ১৫

২. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৩. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৪. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

৫. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৬. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

৭. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৮. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

৯. তদেব

১০. ওগো বধূ সুন্দরী - পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

শত্রুপক্ষের মেয়ে

১. শত্রুপক্ষের মেয়ে – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., আগষ্ট ২০০০, পৃ. ২৬

২. শত্রুপক্ষের মেয়ে – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩. শত্রুপক্ষের মেয়ে – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৪. শত্রুপক্ষের মেয়ে – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৫. শত্রুপক্ষের মেয়ে – পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৬. তদেব

৭. শত্রুপক্ষের মেয়ে – পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৮. শত্রুপক্ষের মেয়ে – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৯. শত্রুপক্ষের মেয়ে – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

আগষ্ট ১৯৪২

১. আগষ্ট ১৯৪২ - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আগষ্ট ১৯৪৭, পৃ. ১৬

২. আগষ্ট ১৯৪২ - পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৩. আগষ্ট ১৯৪২ - পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

বাঁশের কেল্লা

১. বাঁশের কেল্লা - মনোজ বসু - বেঙ্গল পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ. ৪৩

২. বাঁশের কেল্লা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৩. বাঁশের কেল্লা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৪. বাঁশের কেল্লা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

নবীন যাত্রা

১. নবীন যাত্রা - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স , ১৩৫৯, পৃ. ৯৭

২. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

৩. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

৪. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

৫. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৬. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৬৭

৭. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

৮. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৯. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১০. নবীন যাত্রা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

জলজঙ্গল

১. ঝিলমিল - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ১৬৪

২. জলজঙ্গল - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., শ্রাবণ ১৪১৫, পৃ. ৮

৩. জলজঙ্গল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৪. জলজঙ্গল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৫. জলজঙ্গল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

৬. জলজঙ্গল - পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

৭. তদেব

৮. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৬

৯. মনোজ বসুর রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) – মনোজ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, জুন ১৯৮৩, ভূমিকা ক-খ।

১০. তদেব।

বকুল

১. তিনটি তারার আলো (বকুল) – মনোজ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১১৬

২. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৩. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৪. তদেব

৫. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৬. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

৭. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, ১৫৮

৮. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৯. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

১০. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

১১. তিনটি তারার আলো (বকুল) – পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

এক বিহঙ্গী

১. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৫৪

২. এক বিহঙ্গী - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৬১, পৃ. ৫৭

৩. এক বিহঙ্গী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৪. এক বিহঙ্গী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

৫. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

সবুজ চিঠি

১. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) - মনোজ বসু, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১৯৫

২. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

৩. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি)– পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

৪. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

৫. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

৬. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯

৭. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

৮. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

৯. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

১০. তিনটি তারার আলো(সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

১১. তিনটি তারার আলো (সবুজ চিঠি) – পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

১২. তদেব

বৃষ্টি বৃষ্টি

১. বৃষ্টি বৃষ্টি – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ১১

২. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য – ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৫৬

৩. বৃষ্টি বৃষ্টি - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৪. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য – পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৫. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (ষষ্ঠ) – ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ২০০১, পৃ. ২২৭

৬. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৭

আমার ফাঁসি হল

১. আমার ফাঁসি হল – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৪

২. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৩. আমার ফাঁসি হল – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৪. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৮

৫. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৬. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৭. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৮. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৯. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১০. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

১১. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১২. আমার ফাঁসি হল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

মানুষ নামক জন্তু

১. মানুষ নামক জন্তু - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ. ৫৪

২. মানুষ নামক জন্তু - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৩. মানুষ নামক জন্তু - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৪. সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল - অন্নদাশঙ্কর রায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৮, পৃ. ভূমিকা।

রক্তের বদলে রক্ত

১. ঝিলমিল – ভাষা সাহিত্য ও সংহতি – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ১৩৪

২. রক্তের বদলে রক্ত – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ. ১৩

৩. রক্তের বদলে রক্ত – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৪. রক্তের বদলে রক্ত – পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৫. রক্তের বদলে রক্ত – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৬. রক্তের বদলে রক্ত – পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৭. রক্তের বদলে রক্ত – পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৮. রক্তের বদলে রক্ত – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৯. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা.লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৮

রূপবতী

১. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৬২

২. রূপবতী - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., নভেম্বর ২০০০, পৃ. ০৩

৩. রূপবতী - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৪. রূপবতী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৫. উদ্ধৃতি সংগ্রহ মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৬. রূপবতী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৭. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা -শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা.লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৮

৮. রূপবতী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

বন কেটে বসত

১. বন কেটে বসত – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., ফ্রেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ. ১০

২. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৪. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৫. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৬. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৭. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৮. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৯. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

১০. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা.লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৫৫৩

১১. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

১২. বন কেটে বসত – পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

১৩. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৬

রাজকন্যার স্বয়ম্বর

১. রাজকন্যার স্বয়ম্বর – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৩

২. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৩. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৪. তদেব

৫. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৬. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৭. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৮. তদেব

৯. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১০. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

১১. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

১২. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১৩. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৪. রাজকন্যার স্বয়ম্বর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

১৫. তদেব

নিশিকুটুম্ব

১. ঝিলমিল - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশাসার্স, শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ১৬৫

২. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা.লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৪০

৩. নিশিকুটুম্ব - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., জানুয়ারী ২০০৮, পৃ. ৫১

৪. নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৫ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ৮৮

৬ . বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৬৪০

৭ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ৪৮০

৮ . মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড . দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা .লি ., আশ্বিন ১৪০৮, পৃ . ৭১

৯ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩০২

১০ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩৩৫

১১ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩২১

১২ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ২৪৯

১৩ . তদেব

১৪ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ২৪১

১৫ . নিশিকুটুম্ব - পূর্বোক্ত, পৃ . ৭৩

১৬ . বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৬৪১

স্বর্ণসজ্জা

১ . স্বর্ণসজ্জা - মনোজ বসু - বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা .লি ., নভেম্বর ২০০০, পৃ . ১৩

২ . স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ . ১১

৩ . স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩৩

৪ . স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩৫

৫ . স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৪২

৬ . স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৪৭

৭ . তদেব

৮ . স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৫১

৯ . স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ . ৬২

১০. স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১১. স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১২. স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৩. স্বর্ণসজ্জা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

ছবি আর ছবি

১. ছবি আর ছবি - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৩৬৫, পৃ. ৪

২. ছবি আর ছবি - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৩. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৭৭

৪. ছবি আর ছবি - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৫. ছবি আর ছবি - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

৬. ছবি আর ছবি - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৭. উদ্ধৃতি সংগ্রহ মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৭৭

সাজবদল

১. তিনটি তারার আলো (সাজবদল) - মনোজ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ২

২. তিনটি তারার আলো (সাজবদল) - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৩. তিনটি তারার আলো (সাজবদল) - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৪. তিনটি তারার আলো (সাজবদল) - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৫. তিনটি তারার আলো (সাজবদল) - পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

৬. তিনটি তারার আলো (সাজবদল) - পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৭. তিনটি তারার আলো (সাজবদল) - পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

চাঁদের ওপিঠ

১. চাঁদের ওপিঠ – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৬৬, পৃ. ৪৫

২. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৩. তদেব

৪. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৫. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

৬. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৭. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

৮. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ০৩

৯. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. চাঁদের ওপিঠ – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

সেতুবন্ধ

১. সেতুবন্ধ – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., জুন ১৯৯৯, পৃ. ৫৩

২. সেতুবন্ধ – পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৩. সেতুবন্ধ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

৪. সেতুবন্ধ – পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৫. সেতুবন্ধ – পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

৬. সেতুবন্ধ – পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৭. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৬০

৮. সেতুবন্ধ – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯

রাণী

১. রাণী - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, চৈত্র ১৩৭৪, পৃ. ৪

২. রাণী - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৩. রাণী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৪. রাণী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৫. রাণী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৬. রাণী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৭. রাণী - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

৮. রাণী - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

পথ কে রুখবে ?

১. পথ কে রুখবে ? - মনোজ বসু, গ্রন্থ প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ. ২৪৮

২. পথ কে রুখবে ? - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

৩. পথ কে রুখবে ? - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮

৪. পথ কে রুখবে ?– পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০

৫. পথ কে রুখবে ? - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫

৬. কালের প্রতিমা - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ২৪৩

৭. পথ কে রুখবে ? - পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

৮. মনোজ বসু, জীবন ও সাহিত্য - বেঙ্গল পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৩৮

৯. মনোজ বসু, জীবন ও সাহিত্য - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

প্রেমিক

১. প্রেমিক - মনোজ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., মার্চ ১৯৬৯, পৃ. ২৫

২. প্রেমিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৩. প্রেমিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

৪. প্রেমিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৫. প্রেমিক - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

মানুষ গড়ার কারিগর

১. মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার - সম্পাদনা মনীষী বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ. ৫

২. মনোজ মেলা স্মরণিকা ২০০৫ - সম্পাদক হাসেম আলি ফকির, মার্চ ২০০৫, পৃ. ৭

৩. মানুষ গড়ার কারিগর – পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৪. মানুষ গড়ার কারিগর – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৫. মানুষ গড়ার কারিগর – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৬. মানুষ গড়ার কারিগর – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৭. মানুষ গড়ার কারিগর – পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৮. মানুষ গড়ার কারিগর – পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৯. মানুষ গড়ার কারিগর – পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১০. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৯

১১. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – পূর্বোক্ত পৃ. ৬৪০

১২. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (ষষ্ঠ) – ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, ২০০১, পৃ. ২২৭

১৩. উদ্ধৃতি সংগ্রহ মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য – ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৬৪-৬৫

আমি সম্রাট

১. আমি সম্রাট - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, মে ১৯৭১, পৃ. ১১

২. আমি সম্রাট - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৩. আমি সম্রাট - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৪. আমি সম্রাট - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৫. আমি সম্রাট - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৬. আমি সম্রাট - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৭. আমি সম্রাট - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৮. তদেব

৯. তদেব

প্রেম নয় মিছে কথা

১. প্রেম নয় মিছে কথা - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., নভেম্বর ২০০০, পৃ. ১৮

২. প্রেম নয় মিছে কথা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৩. প্রেম নয় মিছে কথা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৪. প্রেম নয় মিছে কথা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৫. তদেব

৬. প্রেম নয় মিছে কথা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৭. প্রেম নয় মিছে কথা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৮. প্রেম নয় মিছে কথা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৯. প্রেম নয় মিছে কথা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

হার মানিনি, দেখ

১. হার মানিনি, দেখ - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৩৩

২. তদেব

৩. হার মানিনি, দেখ -পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮

৪. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৫. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৬. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৭. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৮. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৯. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১০. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১১. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

১২. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত , পৃ. ৬৩

১৩. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ০১

১৪. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১৫. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১৬. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

১৭. হার মানিনি, দেখ - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

মৃত্যুর চোখে আগুন

১. মৃত্যুর চোখে আগুন - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৮০, পৃ. ০৩

২. মৃত্যুর চোখে আগুন - পূর্বোক্ত, পৃ. ০৭

৩ . মৃত্যুর চোখে আগুন - পূর্বোক্ত, পৃ . ১৬

৪ . মৃত্যুর চোখে আগুন - পূর্বোক্ত, পৃ . ২৭

৫ . মৃত্যুর চোখে আগুন - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩৪

৬ . মৃত্যুর চোখে আগুন - পূর্বোক্ত, পৃ . ৪১

৭ . মৃত্যুর চোখে আগুন - পূর্বোক্ত, পৃ . ১০০

৮ . মৃত্যুর চোখে আগুন - পূর্বোক্ত, পৃ . ১৭৮

সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ

১ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা . লি ., জানুয়ারী ২০০৯, পৃ . ০৭

২ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ০৮

৩ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ২১

৪ .সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ২৬

৫ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ৩৮

৬ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ৬১

৭ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ৬২

৮ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ৭৩

৯ . তদেব

১০ . তদেব

১১ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ৭৬

১২ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ১০৭

১৩ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ১১২

১৪ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ১১৬

১৫ . সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ . ১২০

১৬. তদেব

১৭. সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

১৮. সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত,পৃ. ২২১

১৯. সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

২০. সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ – পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

২১. কালের প্রতিমা - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ২৬৩

থিয়েটার

১. থিয়েটার - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৩

২. তদেব

৩. তদেব

৪. থিয়েটার - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৫. তদেব

৬. থিয়েটার - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৭. থিয়েটার - পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৮. থিয়েটার - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৯. থিয়েটার - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১০. থিয়েটার - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

খেলাঘর

১. খেলাঘর - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৩

২. খেলাঘর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৩. খেলাঘর - পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৪ . তদেব

৫ . খেলাঘর - পূর্বোক্ত, পৃ . ২৫

৬ . তদেব

৭ . খেলাঘর - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩৩

৮ . খেলাঘর - পূর্বোক্ত, পৃ . ৩৯

৯ . তদেব